রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : মুজিবনগর

হোসেন তওফিক ইমাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন্মলগ্ন ১০ এপ্রিল, ১৯৭১। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence) হলো আমাদের ম্যাগনাকার্টা স্বাধীনতার সনদ। এই ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে- বর্ণিত হয়েছে কেন, কোন ক্ষমতার বলে এবং পরিস্থিতিতে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো, যে রাষ্ট্রের নামকরণ হলো গণপ্রজাতন্ত্রী (People's Republic) বাংলাদেশ। যেহেতু এই সরকার মুজিবনগরে তার প্রধান দপ্তর স্থাপন করেছিল, তাই এর ব্যাপক পরিচিতি হলো মুজিবনগর সরকার রূপে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে এই সরকারের প্রধান কার্যালয় কলকাতাতে স্থাপন করা হয় প্রধানত নিরাপত্তা এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে। আমাদের সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে কত ব্যাপক এবং সুসংগঠিত ছিল সরকারের কর্মসূচি এবং গঠন কাঠামো।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে কেবলই "মুজিবনগর সরকার" নামে আখ্যায়িত করে, যেহেতু তার প্রধান কার্যালয় ভারতে অবস্থিত ছিল তাই তাকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অনেক অপচেষ্টা হয়েছে গত ২৫ বছর যাবৎ। স্বাধীনতাবিরোধীরা নানাভাবে চেষ্টা করেছে একে পুতুল সরকার পরিচয় দেওয়ার। বিশেষ করে গত ২১ বছর এই স্বাধীনতাবিরোধীচক্র ইতিহাস বিকৃত করে লেখায়, আলোচনায়, টিভি, রেডিও সমস্ত প্রচারযন্ত্রকে ব্যবহার করে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে ছোট করার চেষ্টা করেছে।

প্রসঙ্গত প্রবাসী সরকার সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীতে এ রকম সরকারের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। স্থান ও কাল ভেদে এদের প্রকার এবং চরিত্র বিভিন্ন রূপ হয়েছে। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু প্রবাসী সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো কম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোদম সিহানুকের সরকার, যার সাথে পলপটের খেমুররুজ (যা বিশ্বব্যাপী ধিক্কৃত এবং নিন্দিত) যুক্ত ছিল। এঁদের সদর দপ্তর

দীর্ঘকাল চীনের বেইজিংয়ে অবস্থিত ছিল। কোনো কোনো সময়ে এঁরা থাইল্যান্ডেও অবস্থান করতেন। সিহানুকের স্বাধীন কম্বোডিয়া সরকার একদিকে প্রবাসী ছিলেন, অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের দখলে ছিল, যেখানে তাঁরা সরকার পরিচালনা করতেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বহুলাংশে এই সরকারের সাথে তুলনীয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ক. বিদেশে মিশন স্থাপন-কলকাতা, দিল্লী, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোম।

খ. বিদেশে কূটনৈতিক তৎপরতা:

১. জাতিসংঘে প্রতিনিধি (ডেলিগেশন) প্রেরণ,

২. আফগানিস্তান, সিরিয়া ও লেবাননে ডেলিগেশন প্রেরণ,

৩. নেপালে ডেলিগেশন প্রেরণ, এবং

৪. সিংহল (শ্রীলঙ্কা), বার্মা এবং অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব দেশে ডেলিগেশন প্রেরণ।

উপরোল্লিখিত দেশসমূহের কয়েকটিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়েছিল।

গ. বাংলাদেশী নাগরিক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য কতিপয় দেশের সমর্থন লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো। এইসব দেশে অতি অনুকূল সংবাদ-শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছিল। বিদেশে তহবিল সংগ্রহে ছিল উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

ঘ. পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাংলাদেশী কূটনীতিকদের দলত্যাগ— ইরাক, ফিলিপাইন ও আর্জেন্টিনাস্থ রাষ্ট্রদূতগণের আনুগত্য প্রকাশ। কলকাতা এবং দিল্লী ছাড়াও লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, কাঠমাণ্ডু এবং হংকং-এ কর্মরত উচ্চপদস্থ কূটনীতিকগণ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন।

ঙ. বিদেশে প্রশিক্ষণরত সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তারাও (যুক্তরাষ্ট্রে সাতজন এবং যুক্তরাজ্যে দুইজন) সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছেন।

চ. বিভিন্ন দেশে আমাদের পক্ষে প্রচারণার জন্য External Publicity জোরদার করা হয়। আমাদের বড়ো সাফল্য ছিল বিশেষ দূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ব্রিটেনে কূটনৈতিক তৎপরতা এবং প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আন্দোলন ও জনমত গঠন।

অর্থ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অর্থ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়, যেমন–

১. বাজেট প্রণয়ন: আয় ও ব্যয়ের হিসাব;

২. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদের হিসাব প্রস্তুত;
৩. বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে অর্থ প্রদানের দায়িত্ব পালন ও বিধিমালা প্রণয়ন;
৪. আর্থিক শৃঙ্খলা প্রবর্তন;
৫. রাজস্ব ও শুল্ক আদায়;
৬. আর্থিক অনিয়ম তদন্তের জন্য কমিটি গঠন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট ছিল। আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত এই বাজেটে শুধু সরকারের নয়, বিভিন্ন দপ্তর, অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, জোনাল অফিস, যুব ক্যাম্প, শরণার্থী, বেতার প্রচারণা ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা ছিল।

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি বাণিজ্য বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ড শুধু আয়ের উৎস হিসাবেই নয়, বাণিজ্য বোর্ড যুক্তভাবে ভারত সরকার এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ট্রেডিং কর্পোরেশনের সাথে আলোচনা করে। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি পণ্য পরিবহন সুবিধাদির ব্যবস্থা সম্পর্কিত বহুবিধ বিষয়াদি সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়

মন্ত্রীপরিষদ সচিব এবং তাঁর অধীনে অতি অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয় গঠন করা হয়েছিল। মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয়ের দায়িত্ব ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি মন্ত্রীপরিষদের নিকট/ সভায় পেশ করা, সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ ও বিতরণ করা, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ/অনুসরণ এবং মন্ত্রীপরিষদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, কিন্তু অন্য কোনো মন্ত্রণালয়ের/ বিভাগের আওতাধীনও নয় এইরূপ অন্যান্য বিষয়াদি। মন্ত্রীপরিষদ সচিব রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের দায়িত্বও পালন করেন। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব ছিল।

সাধারণ প্রশাসন/সংস্থাপন

সাধারণ প্রশাসন বিভাগে একজন পূর্ণ সচিব নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করতেন।

এই বিভাগ সরকারের সকল সংস্থাপন বিষয়ক কাজের দায়িত্ব পালন করে, যেমন- প্রবেশন, নিয়োগ, পোস্টিং, বদলি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি। এই বিভাগ সরকারি নিয়োগের নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্বও পালন করে। মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংস্থাপন মন্ত্রী (অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী) নিজে সরকারের অধীনে ১ম ও ২য় শ্রেণীর সকল পদে নিয়োগ দান করেন। আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলের অধীনে সকল ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে লোক নিয়োগ করাও এই বিভাগের আওতাধীন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য, সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর

তালিকা সংরক্ষণ, এই তালিকা বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গের নির্বাচন, নিয়োগের জন্য প্যানেল তৈরি করা ইত্যাদি কাজ সাধারণ প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব ছিল।

আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলসমূহ (জোনাল এডমিনিসট্রেটিভ কাউন্সিল)

মূল পরিকল্পনায় পাঁচটি অঞ্চল (জোন) সৃষ্টি করা হয়েছিল। পরে পরিকল্পনাটি পরিমার্জন করে আরও ছয়টি অঞ্চল সৃষ্টি করা হয়।

দেশব্যাপী সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জুলাই মাসে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে আঞ্চলিক চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে আঞ্চলিক প্রশাসকও নিয়োগ করা হয়। এই প্রশাসকগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত ছিলেন। শরণার্থী সমস্যা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সামরিক-বেসামরিক বিষয়াবলীর সুষ্ঠু সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণভার এই প্রশাসনিক অঞ্চলগুলোর ওপর ন্যস্ত হয়। আঞ্চলিক চেয়ারম্যান তাঁদের অধীনস্থ অঞ্চলের (দেশের ভিতরে ও বাইরে) রাজনৈতিক সমন্বয়কারী হিসেবে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। প্রতিটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করেন :

ক. আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
খ. আঞ্চলিক শিক্ষা কর্মকর্তা
গ. আঞ্চলিক ত্রাণ কর্মকর্তা
ঘ. আঞ্চলিক প্রকৌশল কর্মকর্তা
ঙ. আঞ্চলিক পুলিশ কর্মকর্তা
চ. আঞ্চলিক তথ্য কর্মকর্তা
ছ. আঞ্চলিক হিসাব কর্মকর্তা

উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতেন। আঞ্চলিক প্রশাসকগণ প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রত্যেক আঞ্চলিক চেয়ারম্যান তাঁর অধীনস্থ রাজনৈতিক এলাকা সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করে উপদেষ্টা বা উপ-আঞ্চলিক চেয়ারম্যান নিয়োগ করার অধিকারী ছিলেন। এটি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত ছিল।

জোনাল কাউন্সিলের বিশেষ দায়িত্ব

১. মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে কাজের সমন্বয় সাধন ও পূর্ণ সহযোগিতা করা।

২. মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলো পরিচালনা এবং সতর্কতার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট ও ট্রেনিং-এ পাঠানোর ব্যবস্থ করা।

৩. শরণার্থীদের দেখাশোনা ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজের সমন্বয় সাধন করা।

৪. তথ্য দপ্তর থেকে প্রকাশিত হাজার হাজার পুস্তিকা, প্রচারপত্র ও পোস্টার শরণার্থী ক্যাম্পগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিতরণের ব্যবস্থা করা।

৫. হানাদার দখলীকৃত অঞ্চল থেকে কোনো সরকারি কর্মচারী এসে হাজির হলে তার নাম পরিচয় লিপিবদ্ধ করে যোগ্যতা অনুসারে কাজে লাগানো ও বেতনের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর শাসনভার গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রশাসনিক কাঠামো কার্যকর ছিল।

স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রাথমিকভাবে, একজন মহাপরিচালকের (ডাইরেক্টর জেনারেলের) অধীনে এই বিভাগ গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মহাপরিচালককে সরকারের সচিবের পদমর্যাদা প্রদান করা হয়।

এই বিভাগের কার্যাবলী দুটি পৃথক শ্রেণীতে সংগঠিত করা হয়, যথা : (১) সেনাবাহিনীর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, এবং (২) বেসরকারি চিকিৎসা সেবা। প্রতিরক্ষা বিভাগের চিকিৎসা সেবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়—

ক. সার্জন ও চিকিৎসকদের ব্যবস্থা করা;

খ. আহত/মৃত ব্যক্তিদের বহনের জন্য পরিবহন;

গ. ঔষধপত্র;

ঘ. শল্যচিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি;

ঙ. মাঠ পর্যায়ের চিকিৎসাদল (ফিল্ড মেডিক্যাল ইউনিটসমূহ), যেমন— এডভান্স ড্রেসিং স্টেশনসমূহ (এডিএস) এবং মেইন ড্রেসিং স্টেশনসমূহ (এমডিএস) আরোগ্যের পর বিশ্রামাগার (কনভ্যালেসেন্স হোমস) : যুদ্ধরত সৈনিকদের শুশ্রূষার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়—

১. শহীদদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য বাড়ি;

২. সম্পূর্ণরূপে অক্ষমদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা।

৩. আংশিক অক্ষমদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা।

উপর্যুক্ত কাজের জন্য অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

বেসরকারি খাতে, বাংলাদেশের নাগরিকদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য সচিব বাংলাদেশী চিকিৎসকদের বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থা করেন। উদ্বাস্তু শিবিরে তত্ত্বাবধানের জন্য ভারত সরকার এই চিকিৎসকগণকে নিয়োগ করেছিলেন। বিভিন্ন বন্ধুসুলভ সংস্থা থেকে অনুদান হিসাবে ঔষধ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং রিকুইজিশনের ভিত্তিতে বিভিন্ন সেক্টরে সেগুলি পাঠানোর

দায়িত্বও ছিল স্বাস্থ্য বিভাগের। বিভিন্ন সেক্টরের জন্য সরঞ্জামাদি, এম্বুলেন্স ইত্যাদি বন্ধুদেশগুলি থেকে পাওয়া না গেলে সেগুলি সংগ্রহের দায়িত্বও স্বাস্থ্য বিভাগের উপর অর্পণ করা হয়।

তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়

স্বাধীন বাংলা বেতার- সরকারের অধীন সর্বপ্রথম সংস্থাসমূহের অন্যতম। প্রাথমিক অবস্থায়, জনাব আবদুল মান্নান, এমএনএ সাহেবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে রেডিও স্থাপন করা হয়। প্রাক্তন রেডিও পাকিস্তানের যেসব ব্যক্তি আমাদের সাথে যোগদান করেছিলেন, তাদের মধ্য থেকে কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রোগ্রামিং এবং সম্প্রচার (ব্রডকাস্টিং)-এর জন্য লোকজন নিয়োগ করা হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে শিল্পী ও প্রকৌশলী আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার ফলে বেতারের কার্যক্রমের (আউটপুট) উন্নতি সাধিত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতারের ১০০-এর অধিক লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। বেতার আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম বিধায়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কেবল যুদ্ধ পরিচালনার পরেই এর স্থান। সরকার সব সময়ে এর জন্য বিশেষ আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন।

তথ্য ও বেতার (সম্প্রচার) মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অন্যান্য সংস্থাগুলি হল—

ক. চলচ্চিত্র পরিচালক,

খ. প্রকাশনা পরিচালক, এবং

গ. চারুকলা ও ডিজাইন পরিচালক

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

২৫ মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল কুরআন তেলাওয়াত, মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ আনুষ্ঠান 'অগ্নিশিখা', সাহিত্যের অনুষ্ঠান 'রক্তস্বাক্ষর', বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ভিত্তিক অনুষ্ঠান 'বজ্রকণ্ঠ', বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ এবং চরমপত্র। কামাল লোহানী সংবাদ সংগঠনের দায়িত্ব নেন। কুরআন তেলাওয়াত করেন, 'জয় বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী। হাসান ইমাম 'সালেহ আহমেদ' ছদ্মনাম নিয়ে বাংলা খবর পড়েন। ইংরেজি খবর পড়েন পারভিন হোসেন। মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তা টি হোসেনের স্ত্রী মিসেস টি হোসেন 'পারভিন' ছদ্মনামে পড়েন ইংরেজি খবর। বাংলা সংবাদের ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এ টি এম কামাল উদ্দিন আহমেদ। মিডিয়াম ওয়েভ ৩৬১.৪৪ মিটার ব্রান্ডে প্রতি সেকেন্ডে ৮৩০ কিলো সাইকেলে ভেসে আসতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের আহ্বান। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে যে বাড়িতে কলকাতায় আসার পর তাজউদ্দিন সাহেব প্রথম উঠেছিলেন তারই একটি কক্ষে চাদর-কাপড় ঝুলিয়ে সাউন্ডপ্রুফ রেকর্ডিং-এর জন্য সম্বল ছিলো দু'টো ভাঙ্গা

টেপ রেকর্ডার। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে অনুষ্ঠান ধারণ করা হলেও তা প্রক্ষেপণ করা হয় ৩৯ সুন্দরী মোহন স্ট্রিটের আটতলা বাড়ির ছাদের ওপর থেকে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ শুরু হয় বালু হাককাক লেনে জয়বাংলা পত্রিকার অফিসে এপ্রিল মাসে। তৎকালীন টাংগাইলের এমপি বর্তমান আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সদস্য আবদুল মান্নান বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে। এর আগে ভারত সরকারের কাছ থেকে পঞ্চাশ কিলোওয়াটের একটি ট্রান্সমিটার যন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্নায়ুযুদ্ধ কোষ (Warfare Cell) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে। সরকারের বহির্বিশ্বে সম্প্রচারের দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। এই শাখা পুস্তিকা, প্যাম্ফলেট, ব্রশিউর ইত্যাদি বহু সংখ্যক প্রকাশনা বের করেছে। এগুলি আমাদের বৈদেশিক সম্প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের কতিপয় প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীও বাংলাদেশে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে বহুবিধ বিষয়ে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা/প্রকাশ করেছেন।

সকল দিকে আমাদের প্রচার জোরদার করার উদ্দেশ্যে মিত্র সরকারসমূহের অধীনস্থ তথ্য সংস্থা প্রধানদের সাথে পর্যায়ক্রমিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই বিভাগের কার্যাবলী দেখার জন্য মিঃ আনোয়ারুল হক খানকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। মিঃ আবদুল মান্নান, এমএনএ-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় তিনি কাজ করতেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এটি একজন পূর্ণ সচিবের অধীনে সংগঠিত ছিল। প্রথম দিকে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এই বিভাগের কার্যাবলী সম্পাদন করেছিলেন। তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার নিকট প্রেরণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি প্রধান কাজ ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৪টি রেঞ্জের জন্য চারজন ডি.আই.জি এবং প্রতি জেলার জন্য একজন এস.পি. নিয়োগ করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলসমূহের দায়িত্বও পালন করেন। তাঁর মন্ত্রণালয় অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে–

ক. অবমুক্ত এলাকার প্রশাসনিক কাঠামো,
খ. ভ্রমণ ডকুমেন্ট ইস্যু করা, এবং
গ. তদন্ত অনুষ্ঠান।

ত্রাণ ও পূনর্বাসন বিভাগ

এটি রিলিফ কমিশনারের অধীনে সংগঠিত, যিনি সরাসরি স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণমন্ত্রীর অধীনে কাজ করেন। ত্রাণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকার আবেদনপত্র নিখুঁতভাবে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলাদেশী নাগরিকদের সাহায্য করে এই বিভাগ। জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের কাঠামোর মধ্যে জোনাল রিলিফ অফিসসমূহেরও ব্যবস্থা করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ।

এই মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ শিক্ষকমণ্ডলীর রিলিফের ব্যবস্থাও করেছে। উদ্ধাস্তু শিবিরের শিশুদের উপকারার্থে বাংলাদেশের শিক্ষকদের সেবা কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সহযোগিতায়, যার নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ছিলেন মি. কামরুজ্জামান, এমএনএ, ক্যাম্প-স্কুলসমূহের জন্য একটি স্কিম প্রণয়ন ও আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়।

সংসদীয় বিষয়ক বিভাগ (পার্লামেন্টারি এফেয়ার্স ডিভিশন)

পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিজে এটি দেখাশুনা করতেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমস্যাদি সমাধানের দায়িত্ব পালন করেছে এই বিভাগ।

কৃষি বিভাগ

এই বিভাগ পুরোপুরি সংগঠিত ছিল না। কেবল একজন সচিব নিয়োগ করা হয়েছিল যিনি স্বাধীন বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের নীল-নকশা তৈরি করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

প্রকৌশল বিভাগ

একজন প্রধান প্রকৌশলী (চিফ ইঞ্জিনিয়ার) নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর অধীনস্থ জোনাল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে সেক্টর কমান্ডারদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করার জন্য পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা মুক্ত এলাকার প্রকৌশল বিষয়ক সমস্যাদি সমাধানের দায়িত্বও পালন করতেন।

পরিকল্পনা (প্লানিং) কমিশন

সরকার পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কোষকে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা কমিশনে সংগঠিত করেছে। ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরীকে নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল–

ক. ডক্টর খান সরওয়ার মোর্শেদ,
খ. ডক্টর মোশাররফ হোসেন,
গ. ডক্টর এস, আর, বোস, এবং
ঘ. ডক্টর আনিসুজ্জামান।

কমিশন বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের মধ্য থেকে এর নিজস্ব কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করেছেন।

কমিশনের উপর নিম্নোক্ত কার্যাবলীর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

ক. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র (ম্যানিফেস্টো) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ (হাই কমান্ড) কর্তৃক প্রণীত উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।

খ. দেশ ও অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য মধ্য-মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন। এই পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, এবং

গ. যেহেতু পূনর্গঠন একটি অতি বৃহৎ কাজ হবে এবং এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরকারের পক্ষে কোনোরূপ কালক্ষেপণ করা যাবে না; যেহেতু আমাদের সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নিয়ে আমাদেরকে এখনই প্রস্তুত থাকতে হবে; সেহেতু পরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তব অর্থেই অতি জরুরি হিসাবে গণ্য হয়েছে।

দেশের তাৎক্ষণিক পুনর্গঠনের জন্য নিচের সমস্যাদির দিকে মনোযোগ দিতে হয়েছে :

ক. বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের সমস্যা,

খ. উচ্ছেদকৃত লোকদের বাসস্থান সমস্যা,

গ. খাদ্য সরবরাহ,

ঘ. যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন,

ঙ. সাধারণ সুবিধাদি, যেমন— স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পানি, হাসপাতাল ইত্যাদি পুনর্বাসন,

চ. ক্ষতিগ্রস্ত সকল বন্দর, কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পুনরায় চালু করা,

ছ. আইন-শঙ্খলা ফিরিয়ে আনা,

জ. শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাদি পুনঃস্থাপন,

ঝ. যতটুকু সম্ভব মুক্তিবাহিনীতে যোগদানকারী যুবকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা,

ঞ. সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আরম্ভ করা।

ট. ব্যবসা ও বাণিজ্যের পুনর্বাসন, এবং

ঠ. দেশের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য ইত্যাদি।

পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করত।

যুব অভ্যর্থনা শিবিরসমূহের নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

এই বোর্ডের প্রধান হলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী.এম.এন.এ। পুনর্গঠিত কাঠামো অনুযায়ী যুব শিবির পরিদপ্তরের (ইয়ুথ ক্যাম্প ডাইরেক্টরেট) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ হয়। প্রধানমন্ত্রী যুব শিবিরগুলি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর অর্পণ করেন, যিনি বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ইয়ুথ অ্যান্ড রিসেপশন ক্যাম্প-এর সাহায্য ও সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করেন।

ঐ সময়ে ২০।৩ যুব।শাবর ও ১১২টি অভ্যর্থনা শিবির ছিল। বোর্ড অনুমোদিত বাজেটের ভিত্তিতে ইয়ুথ ও রিসেপশন ক্যাম্পসমূহের চাহিদা মিটাতেন। ব্যাপক আকারে ইয়ুথ ক্যাম্প ইউনিটগুলির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। নিয়মিতভাবে যুব ক্যাম্প থেকে ছেলেদেরকে এনে গেরিলা বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। যুবকদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যেমন– বিছানাপত্র, গরম পোশাক, কম্বল ইত্যাদির ব্যবস্থা বন্ধু সংস্থাসমূহ এবং আমাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি থেকে করা হয়েছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি

এই কমিটির প্রধান হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তিনি বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন।

উদ্বাস্তু কল্যাণ বোর্ড

একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছিল।

সরকারের কার্যক্রমের বাইরে বাংলাদেশের নাগরিকগণ নিচের তিনটি সমিতি গঠন করেছিলেন :

১. বাংলাদেশের রেড ক্রস সমিতি (ড. আহসাবুল হক, এম.পি.এ.)

২. বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (মি. কামরুজ্জামান, এম.এন.এ.)

৩. বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা (মি. আমিনুল ইসলাম, এম.এন.এ.) (বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস কোর)।

প্রবাসী সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার : কিছু তথ্য

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সামরিক, আধা-সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত নেতাকর্মীদের বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত ছিল সরকারের কাছে। শুধু জীবনধারণের জন্য যে ন্যূনতম অর্থ প্রয়োজন হয়, তাই ভাতা হিসাবে গ্রহণ করতেন মন্ত্রী, নেতা, কর্মকর্তারা। সর্বোচ্চ বেতন নির্ধারিত ছিল পাঁচশত টাকা। আমরা প্রায় সকলেই বিনা ভাড়ায় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ভারতীয় (বিশেষ করে বাঙালি), যাঁরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাদের বাড়িতে থাকতাম। লোয়ার রেঞ্জে আমি যে ফ্ল্যাটে থাকতাম, তার মালিক ছিলেন চট্টগ্রামের এম.আর. সিদ্দিকী সাহেবের এক আত্মীয়। ঐ বাড়িতে আরও থাকতেন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব ড. ফারুক আজিজ খান, প্রতিরক্ষা সচিব জনাব এম. এ. সামাদ, আমাদের সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধা ড. তৌফিক এলাহি চৌধুরী, মাহবুব আহমেদ (এস.পি. মাহবুব নামে সমধিক পরিচিত), ড. সাদাত হুসেইন এবং আরও অনেকে। আমার ছোট্ট বাসায় থাকতেন কবি আল-মাহমুদ, আমার

সাথের পুলিশের লোকজন ও অন্যান্য কর্মচারী। আগরতলাতেও এমনই আমাদের এক অকৃত্রিম বন্ধু এবং বাংলাদেশ দরদি (মিঃ চক্রবর্তী) তাঁর বাগানবাড়ি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিলেন আমাদের থাকার জন্য। সেখানেও আমরা সদলবলে থাকতাম–সপরিবারে আমি, খসরুজ্জামান চৌধুরী, ড. হাসান, কাজী রকিবুদ্দীন আহমেদ, ড. আকবর আলী খান, মামুনুর রশীদ এবং সেই সাথে আমাদের লোকজন। অনেকেই নিতান্ত কষ্টে দিনাতিপাত করেছেন। কিন্তু ভেঙ্গে পড়েন নি অথবা দেশ স্বাধীন হবার আগে ফিরে যাবার কথাও কেউ মনে করেন নি। এতো দুঃখ-কষ্ট ত্যাগের পরেও কিন্তু দেশে অনেকের বক্রোক্তি, কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। সেই পাকিস্তানি প্রচারণা মুজিবনগর মানে ভারত। অগাধ ধন-সম্পদ নিয়ে গেছে সবাই। কলকাতায় বড়ো বড়ো হোটেলে থেকেছে, আর আয়েশ করেছে, যুদ্ধ করেছে ভারতীয়রা ইত্যাদি। এতই যদি হবে, তাহলে মুক্তিবাহিনীর ভয়ে কেন ছিল কম্পিত হৃদয়? কেন সুদূর ঢাকায় এসে আমাদের দামাল ছেলেরা পাকিস্তানি এবং তাদের অনুচরদের ভীত, সন্ত্রস্ত করেছিল? কীভাবে তা সম্ভব ছিল? এরা তো সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল না। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা থেকে শুরু করে গেরিলা পদ্ধতিতে পাকিস্তানি এবং তাদের সহযোগী রাজাকারদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন লক্ষ লক্ষ যুবক, ছাত্র, চাষি, শ্রমিক, তাদের কারা সংগঠিত করেছিলেন? কীভাবে করেছিলেন? ১১টি সেক্টর এবং আরো বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিয়মিত বাহিনী সংগঠন, মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ, চেইন অব কমান্ডে বিন্যস্ত করে সুশৃঙ্খলভাবে সামরিক লক্ষ্যে বিশেষ কৌশলে যুদ্ধ পরিচালনা কারা করেছিলেন? সব কিছুর কৃতিত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাপ্য। শুধু পাকিস্তানি প্রচারে এবং তীব্র সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন হয়ে বিপথগামী কিছু পাকিস্তানি দোসর ক্রমাগত বিষবাষ্প উদ্‌গীরণ করেছে এযাবৎকাল স্বাধীন বাংলাদেশ অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধে। ইতিহাসের বইতে, পাঠ্যপুস্তক, প্রচারযন্ত্রে সর্বত্র প্রচার করা হয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার কথা। আর সেই সাথে কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীর কথা। পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করা হয় নি, বলা হয়েছে 'হানাদার' বাহিনীর কথা। ওসমানী সাহেবকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক"। যেসব ব্যক্তি ওসমানী সাহেবের কট্টর সমালোচক ছিলেন, তাঁকে নিয়ে নানারকম বিদ্রূপাত্মক গল্প ফাঁদতে ভালোবাসতেন, তাঁরাই নিজ প্রয়োজনে একজন সাদামাটা ভালো মানুষকে সুপারহিরো বানাতে দ্বিধা করেন নি। মন্ত্রীপরিষদ সভায় ওসমানী তীব্র বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন খুনি মোশতাকের সাথে। সেই মোশতাকই পরে আবার তাকেই মাথায় তুলে নিয়ে অতিমানব সাজিয়েছেন। কেননা, তাঁরই মাধ্যমে এবং

সুপারিশে গ্রুপ ক্যাপটেন তোয়াব ও আমিনুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, শফিউল আজম, সালাহউদ্দিন এবং আরও অনেক পাকিস্তানিকে বাংলাদেশে এনে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে বসিয়ে আবার পাকিস্তানে ফিরে যাবার পাকাপোক্ত ষড়যন্ত্র করতে পেরেছিলেন। এরাই সেই গণবিরোধী গণধিক্কৃত চক্র, যারা পাকিস্তান আমলে যখনই কোনো বেসামাল অবস্থায় পড়েছে, তখনই তারস্বরে চিৎকার করেছে গেল গেল পাকিস্তান গেল, ইসলাম বিপদাপন্ন, কাশ্মীর আমাদের নিতেই হবে, ভারতের সাথে যুদ্ধ করতেই হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমেরিকানরা এককালে এবং তাদের তাঁবেদার পাকিস্তানি সরকারসমূহ বিপদ দেখলেই বলত কমুনিস্টরা আমাদের ডুবালো। ঠিক একইভাবে ভারতীয় জুজু দেখানো হতো পাকিস্তানি আমলে। নিদারুণ দুঃখ আর পরিতাপের বিষয়, সেই ভারতীয় জুজু এখনও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে কতিপয় নেতৃবৃন্দের একমাত্র রাজনৈতিক হাতিয়ার। শয়নে স্বপনে চিন্তাধারায় তাদের ভারতবিদ্বেষ ঠিক পাকিস্তানি কায়দায়। নিজেদের সরকারের, যে সরকার স্বাধীন সার্বভৌম থেকে নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে হাজার প্রতিকূলতার মুখে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, যে সরকারের নেতৃবৃন্দ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁদের কথা বলতে বা তাঁদের বিষয়ে গৌরব বোধ করতেই যত দ্বিধা, যত সংশয়। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীন সরকারের গঠন, নেতৃত্ব স্বীকার এরা করে না। কিন্তু স্বাধীনতার ফসল ভোগ করছে এরাই। ব্যবসা, বাণিজ্য, বাড়ি, অগাধ ধন-ঐশ্বর্য ঐ পাকিস্তানি দোসরদের হাতেই। আরও লক্ষণীয়, এরাই ভারতের সাথে মুক্ত অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিপুল বিত্তের মালিক হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৯৭৫ পরবর্তী সরকারসমূহ এমনভাবে কথাবার্তা বলে এসেছেন এ যাবৎকাল, যেন তার আগে কোনো সরকার ছিল না। তাদের সংক্ষেপে মনে করিয়ে দিতে চাই যে Proclamation of Independence (স্বাধীনতার এই ভিত্তিকে অস্বীকার করলে ৭৫-উত্তর কোনো সরকারের পায়ের তলে মাটি থাকে না)।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর সরকার শুধু তার সদর দপ্তর স্থানান্তর করেন– মুজিবনগর থেকে ঢাকা। শুধু তাই নয়, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ও প্রশাসনে ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথেই সরকার আরেকটি আদেশ জারি করেন : Laws Continuance Enforcement Order (আইনের ধারাবাহিকতা ও প্রয়োগ আদেশ)। এই আদেশের বলেই দেশে কর্মরত সকল প্রকার সরকারি কর্মচারী, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে। এত বড়ো একটি বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামের 'পর দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানই কাজ করে গিয়েছে। বিপ্লবী প্রবাসী সরকারের দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞার বড়ো প্রমাণ এই ঘোষণা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বৈশিষ্ট্য নিজস্ব ভূখণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শুধুমাত্র প্রবাসী ছিল না। মুজিবনগরে সদর দপ্তর হলেও দেশের অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ এলাকা যুদ্ধ চলাকালে মুক্ত করা হয়েছিল। রংপুরের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, উত্তরে, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে যেসব এলাকা মুক্তিবাহিনী দখল করেছিল, তা মুক্তই রাখা হয়েছে সর্বশক্তি দিয়ে। শুধু তাই নয়, ক্রমান্বয়ে সেই মুক্ত অঞ্চল সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আমাদের লাল-সবুজ পতাকা যেখানে একবার উড্ডীন হয়েছে সেখানে আর নামে নি। রৌমারি মুক্ত এলাকার কথা প্রায় সবাই জানেন। সেখানে আমাদের আঞ্চলিক প্রশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চিলমারী এবং দিনাজপুরের বড়ো অংশ মুক্ত ছিল। ফেনী বেলোনিয়াতেও মুক্ত অঞ্চল আমাদের বেসামরিক প্রশাসনের আওতায় ছিল। 'মুক্তির গান' ছবি দেখার পর অবিশ্বাসীরা অনেকে হয়তো সম্বিত ফিরে পেয়েছেন। এই ছবিতে যেহেতু আমাদের স্বাধীনতার কথা এবং মুক্ত অঞ্চলের হুবহু বাস্তব বিবরণ আছে, যাতে আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে নতুন ছেলেমেয়েরা এতদিনের ইতিহাস বিকৃতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারে, তাই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে পাকিস্তানের ভক্তরা ঐ ছবি যেন চলতে না পারে। সত্য কখনো চাপা থাকে না। দুই দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও আজ বাংলার মানুষ জানতে পারছে, বুঝতে পারছে, তাদের মুজিবনগর সরকার কত শক্তিশালী ছিল।

মুজিবনগর সরকারের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

আঞ্চলিক প্রশাসন

আঞ্চলিক প্রশাসন স্থাপন ও পরিচালনা ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা-ধারার ফসল। পূর্ণাঙ্গ একটি সরকার প্রতিষ্ঠা. যার অধীনে আঞ্চলিক প্রশাসনসহ বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যক্রম চালু থাকবে, যার ভিত্তি হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং মূল লক্ষ্য হবে যুদ্ধে নিয়োজিত সেক্টর কমান্ড এবং মুক্তিবাহিনীকে সর্বাত্মক সাহায্য এবং সহযোগিতা— এই ছিল আমাদের ভাবনা। এই লক্ষ্যে ১১টি সেক্টরের সাথে ১১টি জোনাল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কাউন্সিলগুলোতে নির্দিষ্ট এলাকার নির্বাচিত এম.এন.এ/ এম.পি.এ.রা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সদস্য ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকেই আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এই কাউন্সিলকে প্রশাসনিক সাহায্য দেওয়ার জন্য একজন করে জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার নিয়োগ করা হয়। সেই সাথে নিযুক্ত হন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা।

আঞ্চলিক প্রশাসকগণ প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেক আঞ্চলিক চেয়ারম্যান তাঁর অধীনস্থ রাজনৈতিক এলাকার সুষ্ঠু সমন্বয়ের

জন্য উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করে উপদেষ্টা বা উপ-আঞ্চলিক চেয়ারম্যান নিয়োগ করার অধিকারী ছিলেন। এটি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত ছিল।

বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর শাসনভার গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রশাসনিক কাঠামো কার্যকর ছিল।

জোনাল কাউন্সিল এবং দপ্তরগুলো থাকার ফলে দেশ পূর্ণ মুক্ত হবার আগেই আমাদের নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। যে কারণে ১৬ ডিসেম্বরেই (কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার আগেই) আমাদের নিয়োজিত সকল জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার ও অন্যান্য কর্মকর্তা স্ব-স্ব পদে যোগদান করে কালবিলম্ব না করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

নিম্নলিখিত অফিসারগণকে তাদের নামের পাশে উল্লেখিত জেলাগুলোর জন্য জেলাপ্রশাসক হিসাবে মুজিবনগর সরকার নিয়োগ করেন :

১. জনাব শামসুল হক (পূর্বতন ইপিসিএস)-কুষ্টিয়া
২. জনাব ওয়ালিউল ইসলাম (পূর্বতন সিএসপি)-যশোর
৩. জনাব কামাল উদ্দীন সিদ্দিকী (ঐ)-খুলনা
৪. জনাব মামুনর রশীদ (ঐ)-বরিশাল
৫. শ্রী বি বি বিশ্বাস (পুর্বতন ইপিসিএস)-পটুয়াখালী
৬. জনাব খসরুজ্জামান (পূর্বতন ইপিসিএস)–ময়মনসিংহ
৭. জনাব এম ইসহাক (পূর্বতন ইপিসিএস)–ফরিদপুর
৮. জনাব এ মোমেন (পূর্বতন ইপিসিএস)-ফরিদপুর
৯. জনাব কে আর আহমদ (পূর্বতন সিএসপি)-কুমিল্লা
১০. শ্রী জে এন দাস (পূর্বতন ইপিসিএস)–নোয়াখালী
১১. জনাব এম. ই. শরিফ (ঐ)-পার্বত্য চট্টগ্রাম
১২. জনাব এস এ সামাদ (পূর্বতন সিএসপি)–চট্টগ্রাম
১৩. জনাব আকবর আলী খান (ঐ)-সিলেট
১৪. জনাব কে এল হক (পূর্বতন ইপিসিএস)-পাবনা
১৫. জনাব এ এল ভুঁইয়া (ঐ)-বগুড়া
১৬. জনাব জহুরুল ইসলাম ভূঁইয়া (ঐ)– রাজশাহী
১৭. জনাব এম এ কাশেম (ঐ)–রংপুর।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং সাফল্য

দেশ মুক্ত হবার প্রাক্কালে আরও কয়েকটি অত্যন্ত জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিপ্লবী সরকার। এগুলোকে ব্যাপক প্রচারও করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে।

ক. সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে। নভেম্বর ডিসেম্বরের বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর আসতে শুরু করে যে, দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এবং স্থানীয় জনসাধারণ রাজাকার/শান্তি কমিটি এবং অন্যান্য দেশদ্রোহীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণ-আদালত বসিয়ে বিচারও করা হচ্ছিল। যদিও এই গণদুশমনদের নির্মম শাস্তি প্রাপ্য ছিল তাদের জঘন্যতম অপরাধের জন্য (হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ), তবু সরকার মনে করেছেন যে, এই ধরনের বিচার বা স্থানীয় প্রতিশোধ স্বাধীনতা ঘোষণার পরিপন্থী। স্বাধীনতার মূল্যবোধের অন্যতম ছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। যা করতে হলে বিনা বিচারে অথবা আদালতের বাইরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা দেয়া যায় না। স্বাধীন বাংলা বেতারে তাই আমরা বারবার ঘোষণা করেছি 'আপনারা আইন নিজের হাতে তুলে নিবেন না। ভুলে যাবেন না আমাদের যুদ্ধ হলো গণতন্ত্র আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, শান্তি আর অগ্রগতির জন্য।'

খ. বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা। পূর্বেই বলেছি যে দেশ মুক্ত হবার আগেই প্রতিটি জেলার জন্য আমরা জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ টিম গঠন করেছিলাম, যাতে প্রশাসনে কোনো শূন্যতা দেখা না দেয়। একদিকে প্রশাসনের অনেকেই গোপনে আমাদের সাহায্য করেছেন, অপরদিকে অনেকে জ্ঞাতসারেই বিরোধিতা করেছেন। আবার অনেকের সম্পর্কে আমাদের কোনো তথ্য ছিল না। তারা হয়তো স্বাধীন দেশে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারেন। এই কারণেই আমাদের সম্পূর্ণ নতুন টিম গঠন করতে হয়েছিল।

গ. শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হয়। এক কোটির ওপর লোক ভিটে-মাটি ছেড়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে অসুস্থ, গোলাগুলিতেও আহত। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। গরু, মোষ, গৃহপালিত জন্তু কিছু নেই। হালের বলদ নেই। শুধুমাত্র স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেই আশ্রয় মিলবে না। আশ্রয় থাকতে হবে, তার জন্য প্রয়োজন ঢেউ টিন, কাঠ, খড় ইত্যাদি। গৃহনির্মাণ সামগ্রী, হালের বলদ, ফসলের বীজ, সার, কয়েক মাসের খাদ্য সামগ্রী— এসব কিছুর জন্য আমরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সেদিন ভারত সরকার সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ না করলে আমরা কঠিন সমস্যায় নিপতিত হতাম। হয়তো অনেকে মৃত্যুবরণ করতেন। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য বৈদেশিক সাহায্য এসেছে অনেক পরে।

ঘ. যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্বাসন ছিল আরেক কঠিন সমস্যা। সেতু, কালভার্ট, রেলওয়ে, ব্রিজ, বন্দর সবকিছুই ছিল ভগ্নপ্রায়, বিধ্বস্ত। বিকল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচল করার জন্য প্রয়োজন ছিল অতি-মানবিক প্রচেষ্টা, সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা। তাও বিপ্লবী সরকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঙ. খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ছিল আরেক চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যা মোকাবিলা ও সমাধানের জন্য পরিকল্পনা কমিশন এবং আমাদের সকল মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করেছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৭১-৭২ কোনো বড়ো সমস্যা দেখা দেয় নি। বিপ্লবী সরকারই কেবলমাত্র এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন–তাদের নিরলস প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিঃস্বার্থ দেশ সেবার দ্বারা।

চ. গণহত্যা সেল : এটি সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা ছিল। বাংলাদেশ হাইকমিশনে এই সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাথমিকভাবে দায়িত্বে ছিলেন মওদুদ আহমদ। পরে রাষ্ট্রদূত ফাতেহ সাহেব এবং মোমেন সাহেব দায়িত্ব নেন। প্রতিটি জোনের কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা যেন তথ্য সংগ্রহ করেন, সাক্ষীসাবুদ প্রস্তুত রাখেন, পরবর্তীকালে আদালতে ব্যবহারের জন্য। দেশের ভেতরে এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে প্রচুর তথ্য, সাক্ষী সংগ্রহ করা হয়। আমাদের মস্ত বড়ো দুর্ভাগ্য যে, আমরা স্বাধীনতার পর এইসব তথ্য ও সাক্ষী-সাবুদ ব্যবহার করে গণহত্যার বিচার করতে পারি নি। সেদিন যদি আমরা এইসব গণশত্রু এবং দেশদ্রোহীর বিচার করতে পারতাম, তাহলে আর পরবর্তীকালে দেশে রাজাকার, আলবদর, পাকিস্তানিদের পুনর্বাসন হতো না। এরাই পরে হত্যা আর ক্যু'র মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের বিচারের প্রহসন করার সুযোগ পেতো না। পাকিস্তানের ভাঙ্গা রেকর্ডও বাজতো না।

উপদেষ্টা পরিষদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের সমর্থনে যুদ্ধ পরিচালনা করা। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সব-কয়টি আসনে জয়লাভ করলেও, স্বাধীনতা যুদ্ধে (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফফর), কংগ্রেস ইত্যাদি দলও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। এই কারণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব তাঁদের সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ এবং শ্রী মনোরঞ্জন ধর ছিলেন এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য।

ভারতের সাহায্য

ব্যাপক জনসমর্থনের কারণে আমরা সহজেই দেশের বাইরেও সমর্থন পেয়েছিলাম। ১৯৭০ সালের নির্বাচন আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিসংবাদিত নেতৃত্ব প্রদান করে। ভারতেও অতি সহজে বাংলাদেশের প্রতি জনসমর্থন গড়ে ওঠে; যার প্রতিফলন ঘটে ভারত সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের মধ্যে। পরবর্তীকালে পাকদখলদার বাহিনীর অত্যাচার, নির্বিচার গণহত্যা, এক কোটি লোকের ভারতে আশ্রয়গ্রহণ, এই সমর্থনকে আরও দৃঢ় করে। এই সাহায্যকে আমরা কয়েক প্রকার বলতে পারি–

১. ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বাংলাদেশীদের আশ্রয় প্রদান। তাদের জন্য খাদ্য, ঔষধ সরবরাহ ইত্যাদি।
২. যুবশিবির স্থাপনে সাহায্য ও মুজিববাহিনীতে অংশগ্রহণকারী যুবকদের প্রাথমিক শিবির ও প্রশিক্ষণ।
৩. নিয়মিত বাহিনীর অর্থাৎ সেক্টর কমান্ডার সেনাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, রসদ, সর্বপ্রকার সাহায্য।
৪. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনে সহযোগিতা।
৫. গণসংযোগ এবং গণমাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের যৌক্তিকতা, আমাদের বিরুদ্ধে পাকবাহিনীর অন্যায় আক্রমণ, এই বিষয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারে সাহায্য।
৬. প্রবাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারকে সব রকম সহযোগিতা প্রদান।
৭. এই সরকারের অধীনস্থ আঞ্চলিক প্রশাসনগুলিকে অর্থাৎ zonal administration গুলিকে সাহায্য এবং সহযোগিতা।

ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বেসরকারিভাবেও আমরা প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ এসব ছাড়াও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও নৈতিক সমর্থন ছিল অভূতপূর্ব।

বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু প্রত্যাবর্তন করলেন সারা দেশে উল্লাস আর আনন্দের মধ্যে। প্রত্যাবর্তনের পর কয়েক ঘণ্টাও তিনি বিশ্রাম তো দূরের কথা, আপন পরিবারের সাথে কাটাতে পারেননি। দেশের জন্য, জনগণের জন্য, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তখন তাঁর ক্ষমতার উৎস স্বাধীনতার ঘোষণা, যার বলে তিনিই রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি ফিরে এসেই তাঁর কর্মভার গ্রহণ করলেন। প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই প্রয়োজন হলো সংবিধানের। পরদিন ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে প্রথম

মন্ত্রীপরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হলো। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো নতুন সংবিধান সম্পর্কে। ড. কামাল হোসেন খসড়া করলেন Provisional Constitution Order অর্থাৎ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, যা দ্রুততম সময়ের মধ্যে অধ্যাদেশরূপে গেজেটে প্রকাশ করা হলো। গঠন করা হলো Constituent Assembly অর্থাৎ রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নকারী পরিষদ, যার সদস্য হলেন সকল MNA এবং MPA। বাংলাদেশ থেকে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সকল সদস্যদের নিয়ে গঠিত হলো নতুন আইনসভা, যার প্রাথমিক দায়িত্ব সংবিধান প্রণয়ন। এই আইনসভা যে সংবিধান রচনা করেছিলেন, তার জন্য আমরা সকলে গর্বিত। ঐ সংবিধানই পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান এবং আরও পরে এরশাদ গ্রহণ করেছিলেন। তাদেরই উত্তরসূরিরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বা মুজিবনগর সরকারের বৈধতার প্রশ্ন তোলেন। কী ধৃষ্টতা!

উপসংহার

আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে একটি কথা প্রায়ই ভুলে যাই। সেটা হলো স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রবাসী সরকারের নেতৃত্ব, ভূমিকা এবং অবদান। বস্তুতপক্ষে সমকালীন যতগুলি স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে, যেমন— আলজিরিয়া, ফ্রান্স, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া সব ক্ষেত্রেই প্রবাসী সরকার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রবাসী সরকারই উপযুক্ত। প্রবাসী সরকার সুন্দরভাবে গঠন করা, কোন পরিস্থিতিতে কি পরিবেশে কতটুকু কাজ করতে পারবে না-পারবে তা যাঁরা পরিচালনা করবেন, তাঁদের নেতৃত্বের উপর এবং যাঁরা সাহায্য করছেন তাঁদের উপর নির্ভর করে। তবে আমি বলবো যে, সমকালীন যেসব প্রবাসী সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, তাঁদের তুলনায় আমাদের সরকার যথেষ্ট সংগঠিত ছিল। আমরা দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেছি। সার্বভৌম সরকারের যা যা থাকার কথা, আমাদের তা ছিল। আমাদের সরকার ছিল সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এবং সার্বভৌম। যেহেতু আমাদের নিজস্ব বাজেট ও আয় ছিল, তাই সরকার পরিচালনায় বা নীতি নির্ধারণে আমরা কখনও কারো মুখাপেক্ষী হই নি। ভারত সরকার আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন, কিন্তু সেটা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় অথবা গেরিলাদের ট্রেনিং ও রসদ সরবরাহে বা শরণার্থীদের ক্যাম্প স্থাপন ও রেশনের ব্যবস্থায়। আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল একটাই; দেশকে পাকিস্তানি কবলমুক্ত করে স্বাধীনতা অর্জন। এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই সরকার গঠিত হয়েছিল। মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করা, তাদের নেতৃত্ব দেওয়া, তাদের সাজ-সরঞ্জাম রসদের ব্যবস্থা করা, নিয়মিত বাহিনী এবং গেরিলা বাহিনীগুলোকে সংগঠিত করা,

যুদ্ধক্ষেত্রে হাসপাতাল ও চিকিৎসা। মুক্তিবাহিনীর বীরত্বের কথা জাতিকে জানানো ও তাদের উদ্বুদ্ধ করা। সেক্টর কমান্ডারদের সাহায্য ও সহায়তা ও তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও কৌশল নির্ধারণ করা— এই সমস্তই ছিল আমাদের প্রধানতম কাজ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কেন, এটা বহির্বিশ্বে প্রচার করা এবং এর প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি এবং সম্ভব হলে স্বীকৃতি আদায় করাও ছিল আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে, ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দেশের প্রতি, বাঙালির প্রতি যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রবাসী সরকারের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার ফলেই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার যে সে দেশের একমাত্র বৈধ সরকার, তা অধিকাংশ দেশ ও সরকারের কাছে স্পষ্ট হতে বেশি সময় লাগে নি। তার কারণ আমাদের নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি এবং পাকিস্তানিদের গণহত্যা। পাকিস্তান ও তার দোসরদের ব্যাপক অপপ্রচার সত্ত্বেও আমাদের সরকারের প্রতি সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছিল, তার প্রধানতম কারণ ছিল আমাদের প্রবাসী সরকারের স্বাধীন ও সার্বভৌম নীতিসমূহ এবং কার্যকলাপ। যুদ্ধের সময়ে ও পরবর্তীকালে এই সরকারকে ভারতের পুতুল বা পাপেট সরকার বলে পাকিস্তানি সমর্থকরা অনেক ঢাক-ঢোল পেটালেও তা ধোপে টেকে নি।

স্বাধীনতা যুদ্ধে সকলেই যেভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, ভেতরে বাইরে যে যেভাবে পেরেছেন, ফলে মুক্তিবাহিনী ব্যাপক সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে এবং আমরা খুব অল্পদিনেই জুন-জুলাই মাসের দিকে বেশ কিছু মুক্ত অঞ্চলও সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম।

আমাদের নিজস্ব বাজেট ছিল। বাজেট অনুযায়ী প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ে আমরা কাজ করেছি। কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল একটাই— দেশকে স্বাধীন করা। এর জন্য প্রতিরক্ষাই হলো সবচেয়ে বড়ো বিষয়। তাই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যা দরকার, সে বিষয়কে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। আমরা প্রতিকূল পরিবেশে ছোট একটি কামরায় সহকারী ছাড়াই কাজ করতাম। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা ঐ পরিস্থিতিতে তাজউদ্দিন আহমদ যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। অসীম ধৈর্য ছিল তাঁর। কোনো প্ররোচনাতেই তিনি উত্তেজিত হতেন না। সে সময়ে মন্ত্রী পরিষদের সভায় কেউ কেউ মুখের উপর কাগজ ছুড়ে দিয়েছেন, এমন ঘটনাও আমার মনে আছে। দেশ স্বাধীন করার জন্য আমরা যখন কাজ করছি, তখন খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশ হাইকমিশনে বসে মাহবুব আলম চাষীকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছেন, তা আমরা অনেকেই বুঝতে পারি নি।

রাষ্ট্র গঠন ও জাতির জনক শেখ মুজিব

অধ্যাপক ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

এক

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্র গঠন একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সমস্যাটি হচ্ছে : রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রের নৈতিক অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক কি প্রক্রিয়ায় নিরসন হবে? রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে ক্রিয়াশীল উৎপাদন সম্পর্ক। নৈতিক অর্থনীতির মধ্যে ক্রিয়াশীল জনসমষ্টির অধিকারবোধ। এই দুই ক্ষেত্রের সম্পর্ক থেকে তৈরি হয়েছে সমাজ নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজ মধ্যকার সাঙ্গীকরণ সমন্বয়ের সমস্যা। রাষ্ট্র-পরিচালক ও প্রশাসক এবং জনসমষ্টির রাষ্ট্র ও সমাজ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের স্বরূপ কি হবে? সেজন্য সমাজ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কর্তৃত্বের সমস্যা কেন্দ্রিক হয়ে দেখা দেয়। এই সম্পর্কে যুক্ত কাঠামোগত এবং ব্যাখ্যানমূলক উপাদানাবলী। রাষ্ট্র সমাজ-কাঠামোর ব্যাখ্যানের উপাদানাবলী কি কি। বিভিন্ন সম্পর্ক ও অধিকার ব্যাখ্যানের উপাদানাবলী কি কি। রাষ্ট্র, সেজন্য, নির্মিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন সংঘাত এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে উৎসারিত বিভিন্ন অধিকারবোধ। এই দুই উপাদানের যুক্ততা থেকে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ; রাষ্ট্র সিভিল সমাজ থেকে কতদূর পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন এবং কতদূর পর্যন্ত যুক্ত সেই সমস্যা। ঔপনিবেশিক আমলে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাঙালি সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ধারিত করেছে এবং ঔপনিবেশিকোত্তর সিভিল সমাজে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের পরিসর নিরূপণ করেছে। রাষ্ট্রের স্বরূপ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আধিপত্য নিয়ে। আবার জনসমষ্টির অধিকারবোধ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিয়ে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠনের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে ঔপনিবেশিক পরিসর এবং বিতর্ক থেকে; অন্যপক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্র-ক্ষমতার নির্দেশনা ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত হয়েছে সমাজ ম্যানেজমেন্টের ঐতিহ্য থেকে, যে-ঐতিহ্য রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক সময়ের পরিসরে একটি কাঠামো পেয়েছে। সময়ের পরিসর এসেছে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক (এবং ব্রিটিশ) এবং ঔপনিবেশিকোত্তর বোধ থেকে। এই

বোধ রাষ্ট্র ও সমাজের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দুই স্তর যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রের আধিপত্যের স্তরে। এই দুই স্তর আবার ব্যাখ্যা করেছে রাষ্ট্রের নৈতিক অর্থনীতি জনসমষ্টির অধিকারবোধ।

নৈতিক অর্থনীতি সামাজিক গ্রুপসমূহের সংস্কৃতি এবং রাজনীতি উদ্ভাসিত করে। এসব গ্রুপের অবস্থান রাষ্ট্রের প্রান্তে, প্রায় ক্ষেত্রে এসব গ্রুপ রাষ্ট্রবিরোধী। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক পরিসরে রাষ্ট্রের দিক থেকে বাঙালি সমাজ কিংবা বাঙালি সমাজের বিভিন্ন গ্রুপগুলোর (পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিক) অবস্থান ছিল রাষ্ট্রের প্রান্তে, এবং এসব গ্রুপের অবস্থান ছিল রাষ্ট্রবিরোধী। এই পরিসরে নৈতিক অর্থনীতি তৈরি করেছে অধিকার বোধ, সম্পত্তির বোধ, কমিউনিটি বোধের সংজ্ঞা : পূর্ববাংলা নামক প্রধানত কৃষিজীবী কমিউনিটির রাজনৈতিক চাপ এবং সংঘাতের মুখে বেঁচে থাকবার স্ট্র্যাটেজি তৈরি করবার চেষ্টা। এই প্রক্রিয়ায় পূর্ববাংলার বাসিন্দারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের আইন এবং কৃষিজীবী সমাজের প্রাক্সিসের (প্রচলিত প্রথা) সম্মুখীন হয়ে আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন করেছে প্রথা, সমাজের বিধি, পিতৃপুরুষের কানুন। (১) এই আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনে ক্রিয়াশীল গোটা বাঙালি সমাজের ডিসকোর্সের ভাষা, নির্দিষ্ট অর্থে পৃথক সমাজের নিজস্ব বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা। আবার, নৈতিক অর্থনীতিতে পরস্পর প্রবিষ্ট উৎপাদনের সামাজিক এবং টেকনিক্যাল ব্যবস্থাবলী, যার মধ্যে উচ্চারিত সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং পারস্পরিক বিভিন্ন সম্পর্ক। (২) বাঙালি কৃষক সমাজের ধান পাট উৎপাদন, বাজারের সন্ধান, উৎপাদন বাজারের ওপর কর্তৃত্বহীনতা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং শোষণ, কৃষক সমাজের ঋণগ্রস্ততা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার বিন্যাসের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং পারস্পরিক সহমর্মিতার অর্থ খোঁজার মধ্যে দিয়ে উপনিবেশে বিস্তৃত হয়েছে ধনতান্ত্রিক বাজার এবং এই বাজারের প্রচণ্ড অভিঘাত পড়েছে কমিউনিটির মূল্যবোধ এবং প্রত্যাশার ক্ষেত্রে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এজেন্টদের, আমলাদের ব্যবহারবিধি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কৃষক সমাজে একটি ধারণা তৈরি করেছে, রাষ্ট্রীয়তা সম্বন্ধে তৈরি করেছে এক ধরনের লোকজ বোধ এবং প্রত্যাশা। রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় এ ধরনের লোকজ বোধের অবস্থান খুবই জরুরি একটি বিষয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রান্তে অবস্থিত কৃষিজীবী জনসমষ্টি দরিদ্র, সামাজিক নিরাপত্তা এই কমিউনিটিতে একটি কেন্দ্রিক সমস্যা, সেজন্য রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াসমূহে এই ঝুঁকির বোধ এবং যেসব প্রতিষ্ঠান এসব ঝুঁকির দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের বিবেচনা রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে দোলায়িত জাতীয় রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং কৃষক উৎপাদনের রাজনৈতিক অর্থনীতির নির্দেশনা; এর মধ্যে সোচ্চার উন্নয়নের জাতীয় ডিসকোর্স এবং স্থানিক সংগ্রাম : এই ডিসকোর্স এবং সংগ্রাম জনপ্রীতির সুযোগ-সুবিধার চাহিদা এবং সংজ্ঞা নিয়ে।

দুই

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র। রাষ্ট্রকে ধরে নেয়া হয়েছে কতকগুলো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বৈধ যোগানদার এবং এই জন্যই রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায় করার বৈধ অধিকার আছে। রাষ্ট্রের এই যোগানদার এবং রাজস্ব আদায়ের ভূমিকা থেকে তৈরি হয়েছে একসার প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক এবং আইনানুগ সম্পর্কসমূহ; এসব সম্পর্ক রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ক্রিয়াশীল, আবার এসব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যকার স্বতন্ত্রীকরণ : এই স্বতন্ত্রীকরণ বাঙালি সমাজে রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালনা ও বোঝার জন্য খুবই জরুরি। উন্নত দেশে, অর্থনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান। সিভিল সমাজ উন্নত, বিভিন্ন এবং প্রতিষ্ঠানসম্পন্ন। ক্ষমতার সম্পর্কের মাধ্যম হচ্ছে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ ফর্ম, প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজন এসবের মধ্যে দিয়ে সামাজিক পুনরুৎপাদন ঘটে থাকে এবং তৈরি করে রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং সিভিল সমাজের মধ্যকার জটিল সম্পর্ক সূত্র । এভাবে তৈরি হতে থাকে সম্মতি-ভিত্তিকতার সামাজিক আবহাওয়া, যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক হয় না, বিতর্ক এবং মতান্তর হয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে : এই আবহাওয়ায় রাষ্ট্র হয়ে ওঠে সর্বজনীন সম্পন্ন এবং রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকাশবহ একটি কর্তৃত্বের জন্ম হয়, যে–কর্তৃত্ব সামাজিকভাবে গ্রাহ্য ও রাজনৈতিক এবং শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্র কর্তৃত্বের এই ধারণাটি বিশেষ এবং এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতাকে প্রদান করে বৈধতা এবং একইসঙ্গে রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের মধ্যকার স্বতন্ত্রতা করে সম্পন্ন। কিন্তু বাংলাদেশে, ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে তৈরি হয়েছে দু' ধরনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পুনরুৎপাদন। এই পুনরুৎপাদনে রাষ্ট্র হচ্ছে : ক. সংরক্ষক এবং অভিভাবক (ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অধিকাংশ চিন্তার ভিত্তি এই রাজনৈতিক ঐতিহ্য) এবং রাষ্ট্র হচ্ছে, খ. জবরদস্তি এবং নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যবস্থা, যে-ব্যবস্থা সামাজিক সম্পর্কের মূল পর্যন্ত বিস্তৃত (এই ব্যবস্থার ভিত্তি এই রাজনৈতিক ঐতিহ্য)। এই পরিসরে রাষ্ট্রের লক্ষ্য বৈধতার সার্বিকতা অন্বেষণ করা, এবং এই অন্বেষণ রাজনীতি এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে। এখানেই সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমস্যা : সমাজের উপর সার্বিক কর্তৃত্ব কিংবা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। (৩) রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের অর্থ রাষ্ট্র-ক্ষমতা পরিচালনা। এই পরিচালনার অর্থ সিভিল সমাজের ওপর অনুপুঙ্খ প্রভুত্ব বিস্তার নয়। এক্ষেত্রে একটি সমস্যা সক্রিয়। ঔপনিবেশিক আমলে, পূর্ববাংলার সমাজের নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে, এভাবে নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে, এভাবে

সমাজের সার্বভৌমত্ব রাজনৈতিকতা পেয়েছে এবং সমাজের সার্বভৌমত্ব সম্মুখীন হয়েছে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর, এ ক্ষেত্রে সমস্যার দুটি ফর্ম তৈরি হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে : বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা সমাজের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে : সমাজের সার্বভৌমত্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল সিভিল সমাজের বোধ নিষ্ক্রিয় করা এবং রাষ্ট্রকে সর্বেশ্বর করা। অন্যপক্ষে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব-বিরোধী বিভিন্ন বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলো সিভিল সমাজকে রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে ব্যবহার করার দরুন : ক. রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়েছে, খ. এই সংঘাতে সিভিল সমাজ দুর্বল এবং খণ্ডীকৃত হয়েছে, গ. রাষ্ট্রের 'নির্যাতনকারী' কর্তৃত্ব শক্তিশালী হয়েছে এবং ঘ. রাষ্ট্রের মতাদর্শ বিতর্কিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সমাজের ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তনের মৌল নির্ধারকগুলো বিবেচনা দরকার। গ্রামাঞ্চলে, কৃষক সমাজে সমাজের ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তনের একটি নির্ধারক হচ্ছে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম নিয়ন্ত্রণ এবং অন্য নির্ধারক হচ্ছে গ্রামীণ সমাজের ক্ষেত্রে জ্ঞাতগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ। এই দুই ক্ষেত্র, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর, কৃষি সংস্কারের প্রজেক্টের মাধ্যমে, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি উৎপাদকদের খাজনা মাফ এবং ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণের কারণে রাষ্ট্রের সঙ্গে জনসমষ্টির সম্পর্ক ভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি উৎপাদকদের খাজনা মাফ করার ফলে একটি বিরাট কৃষক জনসমষ্টি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আধিপত্য এবং রাষ্ট্রের রাজস্ব ভিত্তির আওতার বাইরে চলে গিয়েছে এবং সমাজের আধিপত্য, বিধি এবং পিতৃপুরুষের কানুনের মধ্যে এই জনসমষ্টি আবদ্ধ হয়েছে। মজুরির দর, ভাগচাষের ফসল, শ্রমক্ষেত্রে বেগার রাষ্ট্রের সংস্কারভিত্তিক এজেন্ডার বাইরে থেকে গেছে।

অন্যপক্ষে ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণের দরুন জ্ঞাতগোষ্ঠীর নামে জমির মালিকানা নামজারী করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সংস্কারমূলক আইনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে কলাকৌশলমূলক সম্পর্ক তৈরির প্রয়াসও সোচ্চার হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সংস্কারমূলক প্রয়াস এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়েছে : কৃষি উৎপাদকদের গরীব অংশ রাষ্ট্রের রাজস্ব কর্তৃত্বের বাইরে অবস্থান করেছে এবং কৃষি উৎপাদকদের ধনী অংশ রাষ্ট্রকে ব্যবহার করার কৌশল শিখেছে। দু'দিক থেকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের মধ্যে সংস্কারের প্রবল তরঙ্গ নিস্তেজ হয়েছে।

বাংলাদেশে, ঔপনিবেশিক-যুদ্ধ উৎসারিত রাষ্ট্রের মতাদর্শিক ফর্ম এভাবে ক্ষীণ হয়েছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভিত্তি সংকীর্ণ। সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ত পরিবর্তমান, এই পরিবর্তমানতায় মিশ্রিত প্রভুত্ব, পদবিন্যাস এবং নিয়ন্ত্রণের নতুন

এবং পুরনো ফর্ম সকল। রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেই অভ্যন্তরীণ টেনশন এবং সংঘাতের বিষয়ে পরিণত, এই ক্ষমতা মতাদর্শিক প্রভুত্বের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, এবং প্রতিযোগিতা পূর্ব বিদ্যমান সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রধানত প্যাট্রনেজের বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন জালসূত্রেবদ্ধ, এই সম্পর্কে যুক্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক এলিট গ্রুপগুলো। সিভিল সমাজ অন্তরালবর্তী এবং খণ্ডিত। এর অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রটি দুর্বল। রাষ্ট্রটি রাজস্ব উৎসারণে সক্ষম, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এলিটদের সেবা আদায়ে নিপুণ। সিভিল সমাজের ওপর সামগ্রিক দাবি বিস্তার না করেও সদ্যউদ্ভূত বাংলাদেশ রাষ্ট্র টিকে থাকতে সক্ষম।

তিন

সদ্য উদ্ভূত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমস্যা অন্যত্র। প্রথম হচ্ছে : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ রচনার পরিকল্পনাবিদরা, প্রধানত জাতির জনক ভেবেছেন রাষ্ট্র রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং জাতি নির্মাণের প্রধান ম্যানেজারিয়াল ভূমিকা পালন করবে।(৪) রাষ্ট্র হচ্ছে জাতির প্রতীক, রাজনৈতিক ভূভাগ, নাগরিকদের আবাসভূমি। উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র হচ্ছে পরিকল্পনার ক্ষেত্র, পাবলিক লগ্নীর স্থল, এবং সরকারি নির্দেশনার উপায়। এ সকল হচ্ছে উন্নয়নের কেন্দ্র ভিত্তিমূল।(৫) অন্যপক্ষে, বি-ঔপনিবেশিক ক্ষমতার দিক থেকে, স্বাধীনতাউত্তর প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্মাণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় যুক্ত হওয়ার বোধ জনসমষ্টির মধ্যে নাগরিকত্বের ভিত্তি প্রসারিত করেছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বনাম সমাজের সার্বভৌমত্বের বৈপরীত্য কিছু পরিমাণ নিষ্ক্রিয় হয়েছে নাগরিকত্বের বোধ হয় অংশগ্রহণের বোধের ভিত্তি প্রসারিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে।

এক্ষেত্রে দু'টি সমস্যা তৈরি হয়েছে। একটি হচ্ছে : সমাজ থেকে রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা নির্মাণ। অপরটি হচ্ছে : রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ সমাজের অন্যতম প্রধান প্যারাডক্স হচ্ছে রাষ্ট্র-কাঠামো আরোপিত, পাকিস্তানী (এবং ব্রিটিশ–) উপনিবেশিকতাপ্রসূত। রাষ্ট্র একপক্ষে আরোপিত, অন্যপক্ষে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠান সম্পন্নতা অর্জন করতে পারেনি। রাষ্ট্র এবং সমাজের বিচ্ছিন্নতা রাষ্ট্র কর্তৃক অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠান সম্পন্নতা অর্জনের মধ্যে দিয়েই সম্ভব, যার ভিত্তিতে ক্রিয়াশীল সরকারের একটি মূল্যবোধসম্পন্ন তত্ত্ব, যে-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা এবং জননীতি প্রণয়নের চূড়ান্ত সত্তা। সেজন্য রাষ্ট্র ও সমাজের বিচ্ছিন্নতা রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যেকার যুক্ততা নির্মাণের ওপর নির্ভরশীল।

এক্ষেত্রেই রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা ও প্রয়োজনের দুটি সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক এবং মতাদর্শিক ধারণা তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে শেখ মুজিব একটি ব্যক্তিগত শাসনের মডেল নির্মাণ করেছেন। এই মডেলে যুক্ত জ্ঞাতির বোধ : শেখ সাব, মুজিব ভাই, বঙ্গবন্ধুর বোধ (কৃষকদের কাছে তিনি শেখ সাব, অনুসারীদের কাছে তিনি মুজিব ভাই, লোক সাধারণের কাছে তিনি বঙ্গবন্ধু)। এই বোধ আশ্রয় করে রাষ্ট্র পরিচালকদের কাছে পৌঁছানো যায় এবং এই বোধকে রাষ্ট্রপরিচালক নিজেও মর্যাদা দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাষ্ট্রকে একটি সংঘাতের ক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপিত করা, যেখানে বিভিন্ন বিরোধী স্বার্থবহ গ্রুপগুলো নিজেদের সমস্যা মীমাংসা করবে। এক্ষেত্রে শেখ মুজিব আবার একটি প্লুরালিস্ট এবং একটি কর্পোরেটিস্ট মডেল তৈরি করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে দিয়ে তিনি একটি প্লুরালিস্ট মডেল তৈরি করতে চেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করে তিনি কর্পোরেটিস্ট মডেল তৈরি করতে চেয়েছেন। এ সব মডেলে অন্তরিত রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র প্র্যাকটিসের মধ্যকার টেনশন, এবং এসবে যুক্ত সমাজ নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজ অন্তরণের মধ্যকার টেনশন; সেজন্য এসব বিবিধ টেনশন থেকে তৈরি হয়েছে রাষ্ট্র-যন্ত্র এবং সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক উদ্ভুত বৈপরীত্যমূলক বিভিন্ন ঝোঁক।

শেখ মুজিব ঠিকই বুঝেছিলেন যে, পাবলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র মধ্যে প্রোথিত সমাজ ম্যানেজমেন্টের যুক্তি এবং সমাজ রাজনৈতিক প্রভুত্বের ক্ষেত্রে এলিটদের স্বার্থের মধ্যে মিল নেই, কিংবা প্রভুত্ব কখনোই নিরঙ্কুশ নয়। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রের যুক্তি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে রাষ্ট্রের স্বরূপ তদন্ত করা দরকার। এই যুক্ততা থেকে নির্মিত হয় গণভুবন, যে-ভুবন হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে নাগরিকত্বের জায়গা। এই জায়গায় অন্তরিত পাবলিক প্রতিষ্ঠান এবং পাবলিক ডিসকোর্স : পাবলিক প্রতিষ্ঠান আরোপিত কিন্তু পাবলিক ডিসকোর্সের একটা প্রধান অংশ শেখ মুজিব এবং তার সঙ্গীরা নিজেরাই নির্মাণ করেছেন : গণতন্ত্র, ভোট, নির্বাচন, স্ব-শাসন, স্বাধীনতা, অংশগ্রহণ প্রত্যয়গুলোর ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে। সেজন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র তৈরি হয়েছে নির্দিষ্ট অর্থে রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক অর্থনীতি তৈরি করেছে সঞ্চয় এবং প্রভুত্বের মধ্যেকার কাঠামোগত সম্পর্ক। রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রভুত্ব এবং পুনরুৎপাদনের মধ্যে লড়াই চলেছে অব্যাহতভাবে। (প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের মন্ত্রীপরিষদে বিভিন্ন পলিসি নিয়ে বিতর্ক এবং মেরুকরণ ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে।)

এর ফলে সুশীল শাসনের সমস্যা প্রধান রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে অগ্রাধিকার পেয়েছে। শেখ মুজিবের কাছে এই সুশীল শাসনের সমস্যা প্রতিভাত হয়েছে জনসমষ্টিকে কী করে নাগরিকে পরিণত করা যায়। সে জন্য রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় রাষ্ট্র ক্ষমতার নৈতিক হিসাব-নিকাশ দেখা দিয়েছে। কারণ, এই হিসাব-নিকাশই নাগরিকত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে থাকে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিকতা দাবি করেছে সরকারের একটি তত্ত্ব প্রণয়নের, একটি মূল্যবোধভিত্তিক রাষ্ট্রক্ষমতার ভাষা নির্মাণ এবং একটি জাতীয়তা নির্ধারণের। তিনি, শেখ মুজিব, বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক বৈধতার দুই আয়তনিক প্রজেক্টের সম্মুখীন হয়েছেন। একটি হচ্ছে : তাঁকে তাঁর রাজত্বকে বৈধ করতে হবে। এক ধরনের স্বীকৃতি পেতে হবে, এক ধরনের জবাবদিহিতা তৈরি করতে হবে। সেজন্য সংবিধান প্রণয়ন করে তিনি এক ধরনের বৈধতার স্বীকৃতি আদায় করেছেন এবং প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠান করে এক ধরনের জবাবদিহিতা তৈরি করেছেন। অন্যটি হচ্ছে : তাঁকে রাষ্ট্রকে বৈধ করতে হবে সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। তাঁকে, এক্ষেত্রে, বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন, বিরোধী জনসাধারণের মধ্যে নাগরিকত্বের বোধ তৈরি করার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। এই সমস্যার তিনি জবাব খুঁজেছেন সরকারের একটি মূল্যবোধভিত্তিক ভাষা নির্মাণে ব্রতী হয়ে। এই ভাষার মধ্যে তিনি যুক্ত করেছেন একপক্ষে কৃষক সমাজের শেখ সাব, অনুসারীদের মুজিব ভাই, লোক সাধারণের বঙ্গবন্ধুর বোধ, অন্যপক্ষে যুক্ত করেছেন আধুনিক রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধানের বোধ। তিনি ভেবেছেন এই ভাষা সক্ষম হবে নিয়ন্ত্রণ এবং সম্মতির সামাজিক রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে এবং একই-সঙ্গে দক্ষ হবে আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করতে। অসম্ভবকে যুক্ত করতে চেয়েছেন তিনি : ঐতিহ্যনির্ভর সমাজের ডিসকোর্সের সঙ্গে তিনি মেলাতে চেয়েছেন রাষ্ট্রের আধুনিক ভাষার জটিলতা। হয়তো অসম্ভবই তাঁর লক্ষ্য, এ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দূরস্পর্শী স্বপ্ন এবং নিরন্তর লড়াই।

তথ্যপঞ্জী

১. E.P. Thompson, Customs in common, 1991.

২. J. Scott, The Moral Economy of the Peasant : Subsistence and Rebellions in Southeast Asia, 1976.

৩. (a). Jurgen Habermas, Legitimation Crisis, 1976.

(b). J. Skocpol, State and Social Revolutions ; A Comparative Analysis of France, Russia and China, 1979.

৪. (a). J. Migdal, Strong Societies and Weak States : State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, 1988.

(b). C. Young, Ideology and Development in Africa, 1982.

(c). Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, Public Enterprise in a Intermediate Regime.

৫. (a). J. Breman and S. Mundle, eds., Rural Traansformtion in Asia 1991.

(b). R. Bates, Beyond the Miracle of the Market : the Political Economy of Agrarian Development in Kenya 1989.

(c). Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere 1989.

স্বাধীনতা উত্তরকালে শেখ মুজিব

কামরুদ্দীন আহমদ

শেখ সাহেব ছিলেন ভালো-মন্দের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। কঠোরতা ও নম্রতার এক অদ্ভুত উদাহরণ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ছিলেন একজন ব দেশপ্রেমিক। বাংলাদেশকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু তি চরমপন্থীদের রাজনীতি বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁর পক্ষে বাস্তব পদক্ষেপ গ্র করা সম্ভব হয়নি। ভারতের আচার্য কৃপালিনী তার এক গ্রন্থে লিখেছে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। তবে দেশপ্রেমি বলতে যা বোঝায় ইন্দিরা তা নন। তার কারণ বোধহয় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হওয়া ছাড়া দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে দে সেবা করার সুযোগ তার হয়নি। দেশপ্রেমিকরা স্বপ্নিল হন, তাই বাস্তব ক্ষেত্রে ভুলচুক হওয়া তাদের জন্য স্বাভাবিক। দেশপ্রেমিকের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে যতটা প্রসারিত থাকে ততটা থাকে না বর্তমানের দিকে। আচার্যের দেশপ্রেমিক সম্বন্ধে উপরিউক্ত মন্তব্য অনেকটা শেখ সাহেবের ওপর প্রযোজ্য।

শেখ সাহেব সম্বন্ধে যাই বলা যাক না কেন, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, তাঁর সময় গণভবন একটা পুরোদস্তুর আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল। শেখ সাহেবকে সাহায্য করতে তাঁর পাশে যারা অবস্থান করতো তারা প্রত্যেকেই মনে করতো যে, তারা আজীবন গণভবনের অধিবাসীই থাকবে। নানারকম নির্দেশ যেত ঐ গণভবন থেকে। থানার দারোগা থেকে সচিবালয়ের কর্মকর্তারা পর্যন্ত সবাই তটস্থ থাকতেন গণভবনের নির্দেশের ভয়ে। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে এটা প্রায়ই দেখা গেছে যে, স্বাধীনতার পরপরই নেতারা তাদের দলের লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন। দলের লোকজনের জন্য সেক্রেটারিয়েটে থাকে অবাধ যাতায়াতের অধিকার। ভারতে একসময় মাথায় খদ্দরের টুপি দেখলেই লোকে তাকে পারমিট শিকারী বা মাল পাচারকারী ভাবতো। পাকিস্তান হওয়ার পর করাচিতে ঐ অবস্থা কিছু দেখা গিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু জিন্নাহ সাহেব বা লিয়াকত আলী খান রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না তাই সেক্রেটারিয়েটে ভিড়টা হতো ব্যবসায়ীদের। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মীরা

যেহেতু নব্য ব্যবসায়ী হয়ে উঠলো তাই তাদের ব্যস্ত থাকতে হতো শেখ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। মন্ত্রীদের ঘরে পারমিট শিকারীদের ভিড় লেগেই থাকতো। ফলে মন্ত্রীদের পক্ষে কাজকর্ম করা ছিল সাধ্যের বাইরে। মন্ত্রীদের ঘরে চলতো একে অন্যের ব্যাপারে কুৎসা রটনা। ফলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। দেশের ঐ দুর্দিনে কিছু ভারতীয় সাংবাদিক শেখ সাহেব সম্বন্ধে মুখরোচক কথা লিখে বাহাদুরি পেতে লাগলেন। তাদের লেখা পড়লে মনে হতো যে, রাষ্ট্রের যতো গোপন কথা বা ভারতীয় হাইকমিশনের সাথে আলাপ-আলোচনা, এমনকি দিল্লির সাথে আলোচনাও তাদের উপস্থিতিতেই হয়। বসন্ত চ্যাটার্জি নামক এক সাংবাদিক *'In side Bangladesh Today'* নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। বইটি সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর ভিত্তি করে লেখা। শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা ও সমালোচনায় পরিপূর্ণ। তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে ভারতের দালাল হিসেবে। হাইকমিশন থেকে খবর নিয়ে দেখা গেল যে, বইটি লিখেছেন বাংলাদেশেরই একজন বামপন্থী সাংবাদিক। বসন্ত চ্যাটার্জি নামক ভদ্রলোক কিছু টাকার বিনিময়ে তার নাম বইটিতে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

শেখ সাহেব রাতের অন্ধকারে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। তিনি এ ধরনের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যেও সাড়ে তিন বছর জীবিত ছিলেন এটাও তাঁর জন্য যথেষ্ট বলেই মনে হয়। কারণ গান্ধীজী আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতার কয়েক মাস পরেই। বার্মার আওংসান তার মন্ত্রীদের নিয়ে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন বার্মার স্বাধীনতা আসার পূর্ব মুহূর্তে। লিয়াকত আলী খান পাকিস্তান হওয়ার সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই নিহত হয়েছেন আততায়ীর গুলিতে। ভারত এবং বার্মার আততায়ীদের বিচার হয়েছে, দোষী ব্যক্তিরা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছে। বিচার হয়নি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হত্যার, বিচার হয়নি শেখ মুজিব হত্যার। এর কারণ হতে পারে যে, গান্ধীজী ও আওংসান হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে কোনো বিদেশী শক্তি জড়িত ছিল না। পক্ষান্তরে, লিয়াকত আলী খান ও শেখ মুজিব হত্যার পেছনে জড়িত ছিল আন্তর্জাতিক শক্তি। শ্রীলঙ্কায়ও নিহত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েকে। কিন্তু অন্য কোনো দেশে রাষ্ট্রনায়ককে সবংশে হত্যা করা হয়নি। শেখ মুজিবের বাড়িতে তার আট-নয় বছরের ছেলেকেও রেহাই দেয়নি হত্যাকারীর নির্মম হাত। নিহত হয়েছিলেন তার স্ত্রী, তার সকল পুত্র সন্তান ও পুত্রবধূরা। শেক্সপিয়রের ভাষা : 'Men, wives and children stare, cry out and run, As it were dooms day'.

সত্তর দশকে সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলছিল কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত রেষারেষি। ১৯৭১ সালে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যখন যুক্তরাষ্ট্র-চীন-পাকিস্তানের আতাত গড়ে উঠেছিল তখনই হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। বাঙালিদের ওপর তাই ক্ষিপ্ত হলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।

মারণাস্ত্র তৈরি প্রতিযোগিতা চলছিল দুই পরাশক্তির মধ্যে। মারাত্মক প্রতিযোগিতা চলছিল বিশ্বজোড়া প্রভাব বিস্তারের। সত্তর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে সোভিয়েত যখন উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ক্ষুণ্ন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল তখন ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তেমনি একটির পর একটি কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। যেসব রাষ্ট্রে সোভিয়েতের প্রভাব ছিল বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছিল, সেসব রাষ্ট্রে নেতৃত্বকে সিআইএর মাধ্যমে বিপর্যস্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণকে, অস্ট্রেলিয়ার হুইটলামের বিরুদ্ধে ফ্রেজারকে, শ্রীলঙ্কার মাদাম বন্দরনায়েকের বিরুদ্ধে জয়বর্ধনকে নির্বাচনে জেতার জন্য তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করল। কিন্তু বাংলাদেশে কাউকে পাওয়া গেল না, শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় তাঁর স্থান দখল করার জন্য। সুতরাং বাংলাদেশে চিলির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো এবং শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ঘটানো হলো সামরিক অভ্যুত্থান।

তিন বছর ধরে যথেষ্ট চেষ্টা করেও শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো বিপ্লব বা বিদ্রোহ অথবা কোনো বড় ধরনের বিক্ষোভও সৃষ্টি করতে পারেনি সিআইএ। তাই রাতের অন্ধকারে তাকে ঘাতকের গুলিতে প্রাণ হারাতে হলো। জারি হলো 'মার্শাল ল' বা সামরিক শাসন। বাংলাদেশের ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেয়া হলো এক যুগেরও বেশি। বাংলার মানুষ চার বছর আগেও অন্য একটি সেনাবাহিনীর 'মার্শাল ল' দেখেছে। সুতরাং আবার দেশে 'মার্শাল ল' আসায় সাধারণ জনগণ ভীত হয়ে পড়লো। তারা ভাবলো আবার বুঝি ১৯৭১-এর মার্চের পুনরাবৃত্তি হবে। তারপর চলতে লাগল শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে একতরফা অপপ্রচার। শেক্সপিয়র তার 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে মার্ক এন্টনির মুখ দিয়ে বলেছেন,

'The evit that men do lives after them
The good is oft interred with their dones.'

শেখ মুজিবের সাথে আমার পরিচয় ছিল দীর্ঘদিনের। ১৯৪৩ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত। দুঃখের বিষয় রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার সাথে তার মতের মিল হয়নি কোনো দিন। কিন্তু আমি রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার পর ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শেখ সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সাহস আমার মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছিল। ঐ সময় মুজিবের পরিবর্তন আশ্চর্যজনক বলেই মনে হয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। অসংখ্য জনতার জয়ধনির মধ্যে মাথা ঠিক রেখে প্রতিটি পদক্ষেপ সঠিকভাবে নেয়া যথেষ্ট প্রতিভাবান নেতার পক্ষেও সম্ভব হয় না। বিশেষ করে যখন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান থেকে শুরু করে নাম

না জানা নেতারা পর্যন্ত ১৯৭০ সালে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন জনসভায় তখন শেখ সাহেব তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেননি। কারণ স্বাধীনতার আগে তিনি নির্বাচন চেয়েছিলেন এবং নির্বাচন বানচালের সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ বাংলাদেশের কয়েক ডজন নেতা নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে নেতা বলে মানতে রাজি ছিলেন না। প্রত্যেকেই মনে করতেন যে তিনিই জনগণের যথার্থ নেতা। আমার ভয় হয়েছিল যে শেখ সাহেব ঐ ডামাডোলের মধ্যে সাংঘাতিক একটা ভুল করে না বসেন।

তারপর এল ১৯৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলন। পাকসেনারা এখানে ওখানে গুলি চালাচ্ছিল, উত্তরবঙ্গে, ঢাকার জয়দেবপুরে, চট্টগ্রাম বন্দরে। কিন্তু শেখ সাহেব শেষ পর্যন্ত হিমালয়ের মতো অটল থেকেছেন আপন সিদ্ধান্তে। ঐ একুশ দিনের অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব তাঁকে ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ নেতাদের সারিতে এনে দাঁড় করেছে। দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায়ের কথা ভেবেছিলেন, বিনা রক্তপাতে সমাধানের একমাত্র পথ হিসেবে।

শেখ মুজিব দেশ-জাতির সম্মানকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

নিজের ব্যক্তিত্বকে দেশের কাজে লাগানোর জন্য উৎসুক ছিলেন। বাংলাদেশের মানুষে মানুষে সমন্বয় ঘটানোই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। বাধ্যতামূলক সমবায় পদ্ধতির ওপর শেখ সাহেবের দৃঢ় আস্থা ছিল। ভূমিহীন কৃষকদের জন্য বাধ্যতামূলক সমবায় খামার প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে তাদের সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করায় সাধারণ কৃষকের কোনো উপকার হয়নি। ঐ উচ্ছেদ আইনে ভূমির শোষণ বন্ধের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশে কৃষি জমি যা আছে তা কৃষক সমাজের সবাই উপভোগ করবে। গ্রামের ভূমিহীন কৃষকরা ক্ষুধার তাড়নায় অত্যন্ত কম মজুরিতে উৎপাদন কাজে অংশ নিতে বাধ্য হয়। অথচ ঐ উৎপাদিত ফসলের ওপর তাদের কোনো অংশ থাকে না। ফলে উৎপাদনেও তাদের তেমন উৎসাহ থাকে না।

এর সমাধানের জন্য গ্রামে গ্রামে আত্মনির্ভরশীল বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে। সমবায় খামারগুলোকে কেন্দ্র করে গ্রাম প্রশাসন গড়ে উঠবে। এ বিষয়ে যুগোশ্লাভিয়ার নীতি অর্থাৎ ডিসেন্ট্রালাইজেশন ও সেলফ ম্যানেজমেন্ট নীতি ছিল তাঁর পথ-প্রদর্শক–কি শিল্পাঞ্চলের প্রশাসনে, কি যৌথ খামারে। যার ফলে শাসনব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের কাজ অনায়াশেই সম্পন্ন হতে পারবে। (Participation of all production in management in fields and factories

is the ultimate good of BKSAL)। বাকশাল নীতি প্রবর্তনের পর তার সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেনি। বাকশাল নীতি সম্বন্ধে সংসদে তাঁর ২ জানুয়ারির বক্তৃতায় ও ২৬ মার্চের জনসভায় ভাষণ ছাড়া আর কোনো উপকরণ বা মালমশলা পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ড. রওনক জাহান তার সদ্য প্রকাশিত পুস্তকে (Bangladesh Politics Problems and Issues) আমার এ মতের সমর্থন করেছেন। বাকশাল গঠনের সাথে সাথেই দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ যেভাবে গণভবনে ভিড় করেছিল তাতে শান্তভাবে সময় নিয়ে শেখ সাহেবের সময়ে আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। বাকশাল নীতি ঘোষণার সাথে সাথেই রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, শ্রমিক, চাকরিজীবী প্রভৃতি সর্বস্তরের জনগণ বাকশাল সদস্য পদের জন্য দরখাস্ত করতে থাকে। দরখাস্তের সংখ্যা এতো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শেখ সাহেবের সচিব রহিম সাহেব সেগুলো ফাইলবন্দি করার চেষ্টা না করে চটের বড় বড় থলিতে ভরে রাখতে আরম্ভ করেন। তথাকথিত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ কেন যেন স্বার্থরক্ষার তাগিদে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। বোধহয় শেখ সাহেবের কথাই সত্য যে, বাংলাদেশের পাঁচ শতাংশ লোক যারা নিজেদের শিক্ষিত বলে দাবি করে তারা দেশের সকল পাপের উৎস। শেখ সাহেব ১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারির জনসভায় বাংলাদেশের সমস্যাসমূহ তার মতে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন; আর তার সমাধানের জন্য চিহ্নিত করেছিলেন একটি মতবাদ। এ মতবাদটি হলো বহুমুখী সমবায় (Multipurpose Co-operative). শেখ সাহেব মার্চ মাসের ২৬ তারিখের বক্তৃতায় নতুন সিস্টেমের যে ব্যাখ্যা দেন তা হলো তার ভাষায় :

'কিন্তু একটা কথা এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বছরের প্লানে বাংলাদেশের পঁয়ষট্টি হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ এর জমি মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ– যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকেই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফারটিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলের যারা টাউট আছেন তাদেরকে বিদায় দেয়া হবে।'

উপরিউক্ত মতবাদ বা কর্মসূচি সফল করার জন্য যে পদ্ধতি তিনি ঐ তারিখের জনসভায় উপস্থিত করলেন, তা ছিল তার ভাষায়–

'ভাইয়েরা আমার, একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের প্রত্যেক বছর ত্রিশ লক্ষ লোক বাড়ে। আমাদের জায়গা হলো পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল। যদি

বছরে আমাদের ত্রিশ লক্ষ লোক বাড়ে, তাহলে পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর বাংলাদেশের কোনো জমি থাকবে না হালচাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সেজন্য আজকে আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে, এটা হলো তিন নম্বর কাজ। এক নম্বর হলো দুর্নীতিবাজ খতম করা। দুই নম্বর হলো কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে প্রোডাক্শন বাড়ানো। তিন নম্বর হলো পপুলেশন প্ল্যানিং, চার নম্বর হলো জাতীয় ঐক্য।

জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে, এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানে, সৎ পথে চলে তারা সকলেই এ দলের সদস্য হতে পারবে। যারা বিদেশী এজেন্ট, যারা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নেই। সরকারি কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারবে।'

এর আগে অর্থাৎ ২ জানুয়ারি গঠনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী পাসের সময় শেখ সাহেব সংসদের বক্তৃতায় বলেন, 'আজকের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই। আমরা জীবনভর সংগ্রাম করেছি। কেউ যদি মনে করেন যে জনগণের ভোটের অধিকার আমরা কেড়ে নিয়েছি তাহলে আমি বলব না, আজকে এখানে যে সিস্টেম করা হয়েছে তাতে পার্লামেন্টের মেম্বাররা জনগণের দ্বারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তাকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।

আজকের এমেন্ডেড কনস্টিটিউশনে যে নতুন সিস্টেমে আমরা যাচ্ছি তাও গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই, এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাংলার মাটিতে কোনোদিন আসতে পারবে না, আমরা তা হতে দেব না। বাংলাদেশকে ভালোবাসব না, বাংলার মাটিকে ভালোবাসব না, বাংলা ভাষা ভালোবাসব না, বাংলার কালচারকে ভালোবাসব না, এ আমরা চলতে দিব না। আমি ফ্রি-স্টাইল দিয়ে রেখেছিলাম–তাই যার যা ইচ্ছা তাই লেখে। কেউ এ নামে বাংলাদেশকে ডাকে, কেউ ও নামে বাংলাদেশকে ডাকে। বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে তারা লজ্জাবোধ করে। তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার। যেমন নাই চোরাকারবারী, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজদের, তেমনি নাই ঐসব সন্ত্রাসবাদীদের।'

শেখ মুজিবের উপরিউক্ত দুটি বক্তৃতা ছাড়া বাকশালের ওপর তার জীবদ্দশায় লিখিত কোনো পুস্তক বা কোনো লিফলেট পাওয়া যায়নি। উপরিউক্ত দুটিই মৌখিক ভাষণ। মৌখিক ভাষণ দেয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা গভীরে যায় না। ঐ বক্তৃতার পরেও শেখ সাহেব প্রায় পাঁচ মাস জীবিত ছিলেন ও প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার চারপাশে লেখাপড়া জানা লোক ছিল। কিন্তু মনে হয় তারা

কেউ শেখ সাহেবের সহযোগিতা করেননি। এর সম্ভাব্য কারণ, সংসদ সদস্য বা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী সদস্যরা বহুমুখী সমবায়ের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। কেউ চাননি তার জমিজমার ওপর পরোক্ষভাবেও অন্য কেউ ভাগ বসাক। ঐ কারণেই যখন ১৫ আগস্ট ক্যু হলো তখন তার হত্যাকারীদের সরকারে তাঁরই মন্ত্রীরা (অবশ্য সবাই নয়) যোগ দিলেন। উল্লেখ্য, শেখ সাহেব মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমানোর জন্য একশত টাকার নোট অচল ঘোষণা করেছিলেন। তখন দেশের যত কালো টাকার মালিক তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছিল। হঠাৎ বাজারে টাকা ঘাটতি হওয়ায় মোনাফাখোর ব্যবসায়ী মহল তাকে অভিশাপ দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

অনেকে বলেন যে, সোভিয়েত, পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় নীতি তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল, যার ফলশ্রুতি একদলীয় প্রেসিডেনশিয়াল সিস্টেম প্রবর্তন। আরও কারণ ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিষ্ঠুরতা শেখ মুজিবকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। যার ফলে কমিউনিস্ট নেতা মনি সিং ও প্রফেসর মোজাফফর আহমদের পরামর্শে শেখ মুজিব বাকশাল গঠন করেন। কিন্তু বাকশাল ঘোষণার কয়েক মাস পূর্বে তার সাথে Compulsary Co-operative Economy এবং Workers Participation in Management নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল আমার। সে সময়ে এ ধরনের কোনো ইঙ্গিত তার কাছ থেকে পাইনি। শেখ সাহেব প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, ক্ষমতা একটি কেন্দ্রে থাকলে ব্যবসায়ীদের চাপ অনর্থের সৃষ্টি করবে। ব্যবসায়ীদের যে লবি তা কোটি কোটি টাকার, তাই ক্ষমতা যথেষ্ট বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যেই ঐসব প্রেসার গ্রুপের ষড়যন্ত্র থেকে প্রশাসনকে রক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। আমার এখনও অনেক সময় মনে হয় যে, গ্রাম-বাংলার জন্য ঐ Compulsary Co-operative Economy এবং শিল্পাঞ্চলের জন্য Workers Participation in Management ছিল তাঁর স্বপ্ন। কিন্তু ঐ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য যে ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো ও ক্যাডার তৈরি করার প্রয়োজন ছিল তা তিনি না করেই বাধ্যতামূলক সমবায় অর্থনীতি (Compulsory Co-operative Economy) পদ্ধতি ঘোষণা করেন। যার ফলে উচ্চাভিলাষী লোক তো প্রশ্নাতীত তার নিজের দলের ভূমি মালিক ও জোতদাররাও যদি তাকে হত্যা করতো তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। যে দেশের রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় থাকার জন্য বছরের পর বছর নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখে, যে দেশের শিক্ষকরা একবার অধ্যক্ষ হলে সারা জীবন নামের পূর্বে অধ্যক্ষ ব্যবহার করেন, যে দেশের বিচারপতিরা বিচারের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেও বিচারপতি কথাটা নামে যুক্ত রাখেন, অবসরপ্রাপ্ত লেখেন না, যে দেশের সাধারণ

মানুষ বিচারপতির অভাবে আদালতে বিচার পায় না, সে দেশের জমির মালিকের জমি চলে যাবে Co-operative-এ অর্থাৎ পরোক্ষভাবে যাবে ভূমিহীনদের হাতে এবং জোতদাররা স্বেচ্ছায় তা মেনে নেবে এটা কি সম্ভব?

আওয়ামী লীগ সংগঠন শেখ সাহেবের নতুন সিস্টেমের পক্ষে কোনো প্রচারপত্র ১৯৭৫ সালে প্রকাশ করেনি। যদিও বামপন্থী সাংবাদিকরা শেখ সাহেবের সিস্টেমের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অপপ্রচার চালাচ্ছিল। তাদের পক্ষে সেটা ছিল স্বাভাবিক, কারণ শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী যে সে শ্রেণী সমন্বয়ে বিশ্বাসী মানুষের বন্দনা রচনা করতে পারে না।

আততায়ীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করে শেখ মুজিব শাহাদাতের দরজা পেলেন কিনা তা স্থির করা ওলামায়ে কেরামের কাজ। বাংলাদেশের জনগণের ভাবনা ছিল যে, তারা কোথায় দাঁড়াল? জনগণের জন্য যে ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হলো তা তারা বুঝেছিল। কিন্তু পিছিয়ে গেল কোথায়– আবার ১৯৫৮ সালে? আবার সেই সামরিক আইন দিয়ে শুরু?

দক্ষিণ এশিয়ার গণতান্ত্রিক ধারা বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের সামরিক জান্তার শাসন প্রক্রিয়া অনুসরণ করল। বার্মা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, দক্ষিণ কোরিয়া তথা দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার যোগসূত্র হলো বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ উন্নয়ন দৌড়ে কোথায় দাঁড়াতো?

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত

"বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ উন্নয়ন দৌড়ে কোথায় দাঁড়াতো?" এ কোন সহজ প্রশ্ন নয়। তবে ঐতিহাসিক কারণেই এ-প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া উচিত এবং সেই সাথে প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরও অনুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত। এ-প্রশ্ন উত্থাপনের কয়েকটি সহজ সরল যুক্তি আছে। যুক্তির মর্মবস্তু এরকম : যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষাকারী এক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আমরা ছিলাম বৈষম্যের শিকার এবং জনসংখ্যায় গরিষ্ঠ আমরা ঐ বৈষম্যের উচ্ছেদ চেয়েছিলাম, যেহেতু শেষ পর্যন্ত আমরা ১৯৭১-এর সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণ-বৈষম্যহীন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলাম, এবং যেহেতু ঐ স্বপ্ন বাস্তবায়নে স্বাধীনতার ঘোষণা (Proclamation of Independence, এপ্রিল ১৯৭১) এবং ১৯৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি-ভিত্তি হিসেবে জনগণের মালিকানাধীন একটি রাষ্ট্রকাঠামোতে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত একটি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, যেখানে বলা হয়েছিল "আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে" (সংবিধানের প্রস্তাবনা), সেহেতু আমরা স্পষ্টভাবেই চেয়েছিলাম স্বাধীনতা (free-dom) ও মুক্তি (liberty), যেখানে মুক্তি-ভিত্তিক উন্নয়ন হবে স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী (Freedom mediated) একটি প্রক্রিয়া যা এদেশে প্রতিটি 'নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার' (সংবিধান, ১৯ অনুচ্ছেদ) লক্ষ্যে এ দেশের সকলের জন্য পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, যেগুলি হল : ১. রাজনৈতিক স্বাধীনতা; ২. অর্থনৈতিক সুযোগ; ৩. সামাজিক সুবিধাদি; ৪. স্বচ্ছতার গ্যারান্টি; এবং ৫. ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

"বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ উন্নয়ন দৌড়ে কোথায় দাঁড়াতো" প্রশ্নটি একদিকে যেমন যুক্তিযুক্ত, আর অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) বিষয়টির প্রায়োগিক চিন্তা-ভাবনার স্পষ্ট নির্দেশনা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ-ভেদহীন মানুষ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাই ছিল স্বাধীনতার মর্মবস্তু, যে আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখেই এদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দেশ গঠনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন বিষয়টি সঙ্গত কারণেই গুরুত্ব পেলেও মূল দিক-নির্দেশনার বিষয় ছিল ভবিষ্যতের বাংলাদেশ–বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহে যা বলা হয়েছিল তা স্পষ্ট এসব নির্দেশ করে। বলা হয়েছিল :

১. পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য হ্রাস। আর লক্ষ্যার্জনের কৌশল হিসেবে বলা হয়েছিল : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, এবং সমতা-ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী আর্থিক ও দ্রব্যমূল্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা।

২. অর্থনীতির প্রতিটি খাতে বিশেষত ঃ কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫%-এ উন্নীত করা। আর আনুষ্ঠানিক খাতসমূহে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের বিকাশ। মানবশক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী স্থানীয়-সরকার কাঠামো শক্তিশালী করা।

৪. নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য (বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্য-তেল, কেরোসিন, চিনি) উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসবের বাজার মূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে রাখা এবং স্থিতিশীল করা (কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে)।

৫. বন্টন নীতিমালা (পুনঃবন্টনমূলক আর্থিক নীতিকৌশল) এমন রাখা যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হার গড় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয় (এবং উচ্চ আয়ের মানুষদের এক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে)।

৬. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা তার ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা-দক্ষতার ভিত্তিতে নিরূপণ করা; গ্রাম-শহরে স্ব-কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি করা; অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জনকল্যাণকামী পরিবর্তন সাধন করা।

৭. বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা। স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশ নিশ্চিত করা। বৈদেশিক মুদ্রার আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানী কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বহুমুখী করা

এবং আমদানী কাঠামো পুনঃবিন্যাস করা। বিশেষ করে সার, সিমেন্ট এবং স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশনির্ভরতা ভিত্তিক অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।

৮. কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করা; খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কমিটমেন্ট এবং সামাজিক চেতনা বিকাশ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

১০. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ন, পানি-সরবরাহ ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের সাধারণ সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পনা দলিলের মুখবন্ধে লিখলেন : "এ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ বিকাশের দিক-নির্দেশনা এবং উন্নয়নে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে স্বল্প সময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে।... জাতি গঠনে আমাদের সবাইকে একাগ্রচিত্তে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যেমনটি মুক্তিযুদ্ধে আমরা সাহস ও উদ্দীপনাসহ করেছিলাম।" আর প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল ইসলাম পরিকল্পনা দলিলের মুখবন্ধে লিখলেন : "কয়েক দশকের বৈষম্য উদ্ভূত একটি দেশে মাত্র পাঁচ বছরে পুনর্গঠনের কাজ, উন্নয়নের কাজ, আর বৈষম্য দূর করার কাজ সম্পন্ন করে, দারিদ্র্য উচ্ছেদের মতো আমাদের যৌথ প্রয়াসটি শুরু করা যেতে পারে মাত্র।... সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যের কাজটির প্রস্তুতি পর্ব গুরুত্বপূর্ণ... উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গতি হয় ধীর এবং যন্ত্রণাদায়ক। এর অর্থ ভবিষ্যৎ অর্জনের জন্য বর্তমানে ত্যাগ স্বীকার।"

উপরের আলোচনা থেকে অন্তত দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয় বলে মনে করি। প্রথমতঃ মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্য ও কৌশলটি স্বাধীনতার চেতনা-আকঙ্ক্ষার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়তঃ উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তুও সে অনুযায়ী বিনির্মাণ করা হয়েছিল (সব সীমাবদ্ধসহ) যেখানে মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাস নিমিত্ত শক্ত-ভিত্তিক জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাঝপথে গভীর এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন পরিকল্পিতভাবে বিনষ্টের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করা হয়। এক্ষেত্রে আমার ধারণা হল এরকম যে যদি কেনোভাবে এমন কোন হিসেব করা সম্ভব হয় যেখানে "বঙ্গবন্ধুসহ আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতির চেহারা কেমন হতে পারতো" এটা দেখানো যায়, সে ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা হয়তো-বা উন্মোচিত হয়ে যাবে।

বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে এবং সেইসাথে গণতন্ত্র-জাতীয়তাবাদ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সমাজতন্ত্র সংশ্লিষ্ট চার-দর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবণতা যদি বহাল থাকতো, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের চেহারাটি কেমন হতে পারতো? এক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নহার এবং বৈষম্য-বিমোচনমুখী উন্নয়ন-কৌশল যদি বজায় থাকতো তাহলে মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়ে যে পরিবর্তন ঘটতে পারতো তা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের আজকের মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেতো। আমি মালয়েশিয়াকে তুলনীয় হিসেবে বিবেচনা করেছি প্রধানত দুটো কারণে : (১) মালয়েশিয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে অর্থনৈতিক বিকাশের একটি প্রকৃষ্ট মডেল; (২) স্বাধীনতা-অব্যবহিত ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় (GNP) আর একই সময়ে মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয় ছিল সমান।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয় ছিল প্রায় সমান, ১,০৩৩ কোটি ডলার। তিরিশ বছর পরে মালয়েশিয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে 'দেশের মাটি উত্থিত' অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণের পরে তাদের মোট জাতীয় আয় এখন ৮,৬০০ কোটি ডলার, আর আমাদের ৪,৮০০ কোটি ডলার অর্থাৎ আমরা এখন মোট জাতীয় আয়ের নিরিখে প্রায় দ্বিগুণ পিছিয়ে (আমাদের জনসংখ্যা তাদের তুলনায় প্রায় ৬ গুণ বেশি)। অথচ আমাদের হিসেবে বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে এবং যেসব উন্নয়ন নীতিমালা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো চলতে থাকলে আজকের বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয় হতে পারতো ১৬,০০০ কোটি ডলার, যা আজকের মালয়েশিয়ার তুলনায় ৮,০০০ কোটি ডলার বেশি, আর বঙ্গবন্ধুহীন আজকের বাংলাদেশের তুলনায় ১১,২০০ কোটি ডলার বেশি। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তারা শুধু বঙ্গবন্ধু নামক এক বিশাল ব্যক্তিত্বকেই হত্যা করেনি, তারা হত্যা করেছে একটি উদীয়মান জাতির ভবিষ্যৎ; এবং হত্যার সময়কাল হিসেবে বেছে নিয়েছে সম্ভাব্য দ্রুততম হারে অর্থনৈতিক বিকাশের ঐতিহাসিক সময়কালকে। ঐতিহাসিক সময় চয়নটিও গভীর এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন মাত্র। হত্যা করেছে জাতির দ্রুততম বিকাশের ঐতিহাসিক সময়কালটিকেই।

যদিও ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয় ছিল সমান তথাপি জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে সমসাময়িক সময়ে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল মালয়েশিয়ার চেয়ে কম : বাংলাদেশে ১২০ ডলার, মালয়েশিয়ার ৪৩০ ডলার। আজকের (২০০১ সালে) বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় ৩৭০ ডলার, আর মালয়েশিয়ার ৩,৫৪০ ডলার। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে— বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও সংবিধানের ভিত্তিতে তিনি যেসব উন্নয়ন নীতিমালা

ও কৌশল গ্রহণ করেছিলেন সে সব বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু জাতীয় আয় হতে পারতো ২,০০০ ডলার, যা আজকের তুলনায় ১,৬৩০ ডলার বেশি। অর্থাৎ মাথাপিছু জাতীয় আয়ের নিরিখে বঙ্গবন্ধুসহ আজকের বাংলাদেশ দরিদ্র একটি দেশ থেকে মধ্যম আয়ের একটি দেশে রূপান্তরিত হতো— এটা নিশ্চিত। অতএব এ কথাও তো জোর দিয়ে বলা যায় যে, বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাহীন দরিদ্র দেশ হিসেবে জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল।

একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিমাপের শ্রেষ্ঠ পরিমাপক হল সে দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (অর্থাৎ আয়ের ক্রয়ক্ষমতা– আয় দিয়ে কতটুকু দ্রব্য ক্রয় করা যায়)। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়ের নিরিখে ছিল সমান অবস্থানে–উভয় দেশেই ২৮০ ডলার। আজকের বাংলাদেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় ১,৭২০ ডলার, আর মালয়েশিয়ার ৮,২৮০ ডলার (আমাদের তুলনায় প্রায় ৫ গুণ বেশি)। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে আজকের আমাদের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় হতো আজকের মালয়েশিয়ার চেয়েও বেশি, ১০,২০০ ডলার। অনেকের কাছেই এটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিফলিত বঙ্গবন্ধুর চিন্তার ফসল কৃষি-সংস্কার (ভূমি-সংস্কারসহ), শিল্প বিকাশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ মানব-উন্নয়ন খাতসমূহের অগ্রাধিকার, ব্যাপক বিদ্যুতায়ন, অবকাঠামো-উন্নয়ন, সামাজিক খাতসমূহের বিকাশ, ধনী-দরিদ্র বৈষম্য হ্রাস, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, বৈদেশিক বাণিজ্যের সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ সংক্রান্ত নীতিমালা ও উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়িত হলে আজকের বাংলাদেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় আজকের মালয়েশিয়ার চেয়ে বেশি হতো–এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরো গুরুত্বপূর্ণ হ'ল এই যে বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশের বিকাশ হতো মালয়েশিয়ার তুলনায় কম বৈষম্যপূর্ণ (অর্থাৎ অধিকতর বন্টন সমতার কারণে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হতো কম)। এসবই তো ছিল স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার মর্মবস্তু। বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশে এসব অর্জিত হয়নি। কিন্তু এসব অর্জন ছাড়া গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত বাংলাদেশকে ওঠানো সম্ভব নয়। কাজটি জরুরি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত এদেশের মানুষকে সম্ভবত আরো একবার জেগে উঠতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। বিলম্ব ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা

ড. মো. মাহবুবর রহমান

১. ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র সাড়ে তিন বছর (১০.০১.১৯৭২ থেকে ১৪.০৮.১৯৭৫) বাংলাদেশের সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে তিনি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পুনর্গঠন করেন। এই ছোট প্রবন্ধে সেই অবদানের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের চিত্র

(ক) কৃষি : বঙ্গবন্ধু যখন সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন এই দেশটি নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তান-বাহিনীর জ্বালাও পোড়াও নীতির ফলে হয়ে পড়েছিল এক যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূখণ্ড। দেশের ৮৫ ভাগ মানুষ যে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল তাঁর পুনর্বাসন কাজ ছিল এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস খাদ্যশস্য উৎপাদন এমনিতেই বিঘ্নিত হয়েছিল; উপরন্তু পাকিস্তানী-বাহিনী পরাজয়ের পূর্বমুহূর্তে সরকারি খাদ্যগুদামে মজুদ খাদ্যশস্য, শস্যবীজ, সার ও কীটনাশক ধ্বংস করেছিল। তাছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী–বাহিনী ও রাজাকার-দালাল কর্তৃক কয়েক লক্ষ হালের বলদ ও গাভী জবাই করে মাংস খাওয়ায় হালচাষের জন্য গবাদিপশুর সংকট দেখা দেয়। কৃষি ধ্বংস হওয়ায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হয়। এমনি সংকটময় পরিস্থিতিতে সরকারকে ৯০ হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী, আটককৃত ৩৭ হাজার রাজাকার ও দালাল এবং সোয়া লক্ষ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর খাদ্য সরবরাহের এক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়।

(খ) ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস ভবন : পাকিস্তানী বাহিনী সারা বাংলাদেশে প্রায় ৪৩ লক্ষ বসতবাড়ি, ১৯ হাজার গ্রাম্য হাট-বাজার, ৩ হাজার অফিস ভবন, ৬ হাজার প্রাইমারী স্কুল ও মাদ্রাসা এবং ৯০০ কলেজ পুড়িয়ে দেয়। সে সময় এসবের আসবাবপত্র, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(গ) অবকাঠামো ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি ও সংকট : মুক্তিযুদ্ধের সময় ৩০০টি রেলসেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রায় ২০০ মাইল দীর্ঘ রেললাইনের সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতি সাধন হয়। সরকারি পরিবহনের শত শত বাস ও ট্রাক ধ্বংস করা হয়। প্রায় ৩ হাজার বড় বড় মালবাহী নৌকা পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে 'মাইন' পোতার কারণে বন্দর দুটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। দেশের বিমানবন্দরসমূহের রানওয়ের ক্ষতি সাধিত হয়। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল বিপর্যস্ত। সারাদেশে বিদ্যুৎ পোলগুলো ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিদ্যুৎ-লাইন বিচ্ছিন্ন, সাব-স্টেশনগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত, গোডাউনে বিদ্যুৎ তার কিংবা খুঁটি কিছুই মজুদ ছিল না। বিদ্যুৎ খুঁটি ও তার সবকিছুই ছিল আমদানীযোগ্য পণ্য।

দেশের ব্যাংকিং সেক্টরকে দাঁড় করানো নতুন সরকারের জন্য ছিল এক কঠিন কাজ। আত্মসমর্পণের পূর্বে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত কাগজের নোট, প্রয়োজনীয় দলিল ও ফাইল পুড়িয়ে দেয়। সে সময় ব্যাংকগুলো হয়ে পড়ে তহবিলশূন্য। শিল্প কল-কারখানাতে আমদানীযোগ্য কাঁচামালের সংকট দেখা দেয়।

(ঘ) বিপর্যস্ত শিক্ষা কার্যক্রম ও বেসামরিক প্রশাসনিক কাঠামো এবং দক্ষ জনবল সংকট : মুক্তিযুদ্ধের সময় কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস ভবনই পোড়ানো হয়নি, অসংখ্য শিক্ষক শহীদ হওয়ায় সে পদগুলো পূরণের প্রয়োজন হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী পাঠ্যবই রচনা ও প্রকাশের এক গুরুদায়িত্বও সরকারকে পালন করতে হয়। তাছাড়া দেশ গঠনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন ছিল দক্ষ প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, ব্যাংকার এবং এমনকি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যবসায়ীবর্গের। ডাক, তার, রেল প্রভৃতি সেক্টরেও অভিজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান আমলে অবাঙালিরা এসব অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতো। মুক্তিযুদ্ধের পর তারা আত্মগোপন করায় নতুন রাষ্ট্রে দক্ষ কর্মীর অভাব দেখা দেয়।

(ঙ) সংবিধান প্রণয়ন ও আইনের শূন্যতা পূরণ : নতুন সরকারকে একটি সংবিধান-প্রণয়ন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভ, জাতিসংঘের সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক অনুদান লাভ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি কাজগুলোও করতে হয় বঙ্গবন্ধুর সরকারকে।

(চ) সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা : বঙ্গবন্ধুর সরকারকে তাৎক্ষণিকভাবে কতকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। যেমন :

১. দেশের জনগণের আকাশচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা, ১১-দফায় উল্লেখিত দাবিগুলো যেমন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ,

ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা, কৃষকদের খাজনা কমানো, বকেয়া খাজনা মওকুফ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা।

২. মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন করা। শহীদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা।

৩. দালালদের আটক করে বিচারের সম্মুখীন করা।

৪. পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনা।

৫. ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভারতে ফেরত পাঠানো।

৬. সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা।

৭. আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধিজনিত প্রভাব, বাংলাদেশকে ঘিরে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি মোকাবিলা করা বঙ্গবন্ধু সরকারের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

৮. সর্বোপরি বিরোধী রাজনীতি— যেমন জাসদ ও সর্বহারা পার্টির সরকারবিরোধী কার্যকলাপ নতুন সরকারের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

৩. বঙ্গবন্ধুর অবদান—

(ক) সংবিধান প্রণয়ন ও আইনের শূন্যতা পূরণ : বঙ্গবন্ধুর সরকার মাত্র এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান জাতিকে উপহার দেন (১৬.১২.১৯৭২)। সংবিধানটি ছিল একটি ব্যাপক ও সুলিখিত দলিল এবং এই উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের তুলনায় উন্নতমানের। নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইনের শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৬.১২. ১৯৭১ থেকে ১৫. ১২. ১৯৭২ পর্যন্ত এক বছরে প্রায় দেড়শত আইন প্রণয়ন করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আইন, যেমন :

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরণ আইন (৩.১.১৯৭২)

২. পাট, বস্ত্র ও চিনিকলসমূহ, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করে আইন পাস (২৫.৩.১৯৭২)।

৩. বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২ জারি (২৪.১.১৯৭২)। এই আইনের আওতায় সারা দেশে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ২৪. ১. ১১৯৭২ থেকে ৩০. ১১. ১৯৭৩ পর্যন্ত ৩৭,৪৭১ জন দালাল গ্রেফতার করা হয়। এ সময় ৭৫২ জন দালাল দণ্ডিত হয়।

(খ) কৃষকদের কল্যাণ সাধন : কৃষকের কল্যাণার্থে বঙ্গবন্ধু কতকগুলো সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১. সকল বকেয়া খাজনা মওকুফসহ পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন (২৬.৩.১৯৭২)।
২. পরিবার পিছু সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সিলিং নির্ধারণ করেন।
৩. প্রায় ৩০ কোটি টাকার কৃষি-ঋণ বিতরণ করেন।
৪. কৃষকদের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার গাভী বিতরণ করেন।
৫. ১৯৭৩-৭৪ সেশনে কৃষকদের জন্য ৪০ হাজার পাম্পের ব্যবস্থা করেন।
৬. সফল, নিষ্ঠাবান ও উৎসাহী কৃষকদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' নামে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করেন।
৭. ফারাক্কা বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশিষ্ট পানি বিজ্ঞানী বি.এম. আব্বাসকে দিল্লী পাঠান এবং শুকনো মৌসুমে পদ্মা নদীতে ৫৪,০০০ কিউসেক পানির নিশ্চয়তা লাভ করেন।
৮. বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পূর্ণোদ্যমে চালুর ব্যবস্থা করেন।

(গ) শিক্ষার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান :

১. বঙ্গবন্ধু দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন। ফলে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি সরকারি হয়। আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু সরকার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করেন। তাছাড়া তিনি দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ৫ মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের পূর্বেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়।
২. বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়ন করেন।
৩. বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল ভবন পুনঃনির্মাণ করেন।

(ঘ) অর্থনৈতিক পুনর্গঠন : বঙ্গবন্ধু সরকার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. বঙ্গবন্ধু সরকার পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়ন করেন।
২. বঙ্গবন্ধু চারটি নতুন করপোরেশন গঠন করেন, যেমন
–বাংলাদেশ জুট করপোরেশন

–বাংলাদেশ সুগার করপোরেশন
–বাংলাদেশ টেক্সটাইল করপোরেশন
–বাংলাদেশ গ্যাস এন্ড ওয়েল করপোরেশন

৩. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ শিল্প-ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্প-ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি-ব্যাংক গঠন করেন।

৪. সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কমিশন ও ১০ স্তরবিশিষ্ট নতুন বেতন-স্কেল বাস্তবায়ন করেন (জুলাই, ১৯৭৩)। শ্রমিকদের কল্যাণের লক্ষ্যেই তিনি জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ এবং শ্রমিকদের জন্য নতুন বেতন-কাঠামো ঘোষণা করেছিলেন।

৫. গ্রাম বাংলার উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সমন্বিত পল্লী-উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

৬. বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বছরে শতকরা ৭ ভাগেরও বেশি অর্জিত হয়েছিল।

(ঙ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন : যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। ১৯৭৪ সালের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল ব্রীজ-সেতু নির্মাণ সমাপ্ত করা ছাড়াও ৯৭টি সড়ক-সেতু নির্মাণ করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত রেলসেতুগুলোর পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিশন ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর যমুনা সেতুর প্রাথমিক সম্ভাব্যতা রিপোর্ট প্রণয়ন করেন।

বঙ্গবন্ধুর বিশেষ প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের ৭ মার্চের মধ্যেই ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-যশোর ও ঢাকা-কুমিল্লা রুটে বিমান চলাচল শুরু হয়। তিনি আন্তর্জাতিক রুটে একটি বোয়িং সংযোজন করেন। ১৯৭৩ সালের ১৮ জুন ঢাকা-লন্ডন রুটে বিমানের ফ্লাইট চালু হয়। কুর্মিটোলার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে। বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পরিবহন এবং নদীপথসমূহ সুষ্ঠু পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জলযানের ব্যবস্থা করে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৫৫,০০০ টেলিফোন চালুর ব্যবস্থা করেন। বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ স্থাপনের জন্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূ-উপগ্রহ স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করেন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু অবদান রাখেন। তিনি ৫,০০০ বিদ্যুৎ পোল আমদানী করেন। ১৯৭২-এর ডিসেম্বরের মধ্যে ১৫০০ কি. মি. দীর্ঘ নতুন বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন ও ৩০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে দেশব্যাপী পল্লী-বিদ্যুৎ

কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়। এমনকি সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে পল্লী বিদ্যুতায়নের প্রতিশ্রুতি সন্নিবেশিত হয়।

(চ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম : বঙ্গবন্ধুর সরকার ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী এক কোটি শরণার্থীকে তাদের স্ব স্ব বাসস্থানে পুনর্বাসন করেন। এছাড়া তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৩ লক্ষ বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(ছ) আদমশুমারি : বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৪ সালের ৮ জুন বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি সম্পন্ন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এক অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করেন।

(জ) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ : দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর শত আর্থিক সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বাহিনীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ১৯৭২ সালের ৬ মার্চ তিনি বি.ডি.আর. বাহিনী গঠনের নির্দেশ দেন। ৮.৪.১৯৭২ তারিখে পদাতিক, নৌ ও বিমান-বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। ১১.৩.১৯৭৪ তারিখে তিনি কুমিল্লায় বাংলাদেশের প্রথম সামরিক একাডেমী উদ্বোধন করেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যুগোস্লাভিয়া থেকে ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র ও সাঁজোয়া-বাহিনীর জন্য ভারী অস্ত্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য থেকে বিমান-বাহিনীর জন্য হেলিকপ্টার, মিশর থেকে সাঁজোয়া গাড়ি বা ট্যাংক (যা পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে চক্রান্তকারীরা ব্যবহার করে) সংগ্রহ করেন। এছাড়া ভারতের অনুদানে ৩০ কোটি টাকায় সেনাবাহিনীর জন্য পোশাক ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০ হাজারেরও অধিক সামরিক সদস্যকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন। এভাবে বঙ্গবন্ধু প্রায় ৫০ হাজার সদস্যের একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন।

(ঝ) পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে সফলতা : পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের মাত্র দুই মাস সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন (১২.৩.১৯৭২)। বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশে ৪.৪.১৯৭২ তারিখে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি, ১০.৫.১৯৭২ তারিখে আন্তর্জাতিক তহবিল সংস্থার সদস্যপদ এবং ১৮.৯.১৯৭৪ তারিখে জাতিসংঘের সদস্যপদসহ ১২১টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে। বঙ্গবন্ধু ২৫.৯.১৯৭৪ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করে বাঙালির মাতৃভাষার মর্যাদাকে বিশ্বের দরবারে উন্নীত করেন।

(ঞ) মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংরক্ষণ : বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের স্মরণে ৯.৩.১৯৭২ তারিখে সাভার ও মেহেরপুর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ

প্রকল্প অনুমোদন করেন। ১৬.১২.১৯৭২ তারিখে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের এবং ২২.১২.১৯৭২ তারিখে ঢাকার মীরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকারের শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত মূল্যায়ন, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের পুনর্বাসিত প্রভৃতি কাজেও বঙ্গবন্ধু গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

(ট) সমাজ সংস্কারমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর অবদান : বঙ্গবন্ধু ক্ষমতাগ্রহণের তিন দিনের মধ্যেই (১৫.১. ১৯৭২) এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে মদ, জুয়া, হা'ডজী, ঘোড়-দৌড় নিষিদ্ধ করেন এবং একই সাথে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হিসেবে ঘোষণা দেন। তিনি ২৪.৫. ১৯৭২ তারিখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনেন এবং তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দান করেন। তিনি ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমী স্থাপন করেন এবং ঢাকার রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্থায়ী নতুন ভবন উদ্বোধন করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়— এই আদর্শে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গীতে জমি বরাদ্দ করেন।

৪. মূল্যায়ন : এভাবে আমরা দেখি বঙ্গবন্ধু মাত্র তিন বছর সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি এগার হাজার কোটি টাকার ধ্বংসস্তূপের উপর আরো তের হাজার কোটি টাকার উন্নয়নস্তম্ভ দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য

ফারুক চৌধুরী

সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জন্য একটি গতিশীল, সবল এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির কাঠামো সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই আমরা লাভ করেছিলাম বিশ্বের প্রায় সকল দেশেরই স্বীকৃতি। চীন আর সৌদি আরব যদিও তখনো ছিল না সেই দলে, সেই দুই দেশের সঙ্গে উচ্চতম পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুসময় পর্যন্ত এই দুই দেশের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না এলেও, তাদের সঙ্গে হয়েছিল রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সূচনা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল পারস্পরিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে। পাকিস্তানের সঙ্গে, সেই সময়কার বিরূপ পরিস্থিতিতেও সূচনা হয়েছিল অবাধ আনাগোনার; তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের গড়ে উঠেছিল অর্থবহ সহযোগিতার ভিত্তি এবং বঙ্গবন্ধুর ওয়াশিংটন সফর আর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জারের ঢাকা সফর রচনা করেছিল দুই দেশের মাঝে স্বাভাবিক প্রারম্ভ। সেই তিনটি বছরের মাঝে বাংলাদেশ যোগ দিয়েছিল কমনওয়েলথে, লাভ করেছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ, হয়েছিল ইসলামিক জোট সম্মেলনে সাদরে আমন্ত্রিত, যোগ দিয়েছিল জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রমণ্ডলীর দলে। তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধিদের মাঝে বাংলাদেশে এসেছিলেন যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বোমেদিয়ান, সেনেগালের প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সেনগর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখ নেতা। জাপান থেকে এসেছিল ৪৫ সদস্যের সুবৃহৎ একটি অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদল। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর নিযুক্ত বিশেষ প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন বেশ ক'টি দ্বিপাক্ষিক সফরে। বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত দেশ পাকিস্তান ভেঙে বেরিয়ে আসা, যুদ্ধ-উত্তর পুনর্গঠনে নাভিশ্বাস ওঠা, নবগঠিত দরিদ্র একটি রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই প্রতিষ্ঠালাভ বঙ্গবন্ধু আর তাঁর সফল পররাষ্ট্রনীতিরই পরিচায়ক।

মাত্র তিনটি বছরে বঙ্গবন্ধু বেশ ক'টি আন্তর্জাতিক এবং বহুপাক্ষিক সম্মেলনে রেখেছিলেন তাঁর অবদান। ১৯৭৩ সালের আগস্টে কানাডার অটোয়ায় কমনওয়েলথ সম্মেলন, সে বছরেরই সেপ্টেম্বরে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন, ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন, সেই বছরের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আর ১৯৭৫-এর মে মাসে জামাইকার কিংসটনে কমনওয়েলথ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু রেখেছিলেন তাঁর উপস্থিতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর, পালন করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই সকল সফরের মাঝে আমি তাঁর সহগামী ছিলাম যথাক্রমে ১৯৭৩-এ অটোয়ায়, ১৯৭৪-এ নিউইয়র্কে আর ১৯৭৫-এ কিংসটনে। এই তিনটি সম্মেলনেই কাছে থেকে দেখেছি রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ।

১৯৯৫-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হলো বর্তমানের ৫২-সদস্যবিশিষ্ট কমনওয়েলথ সম্মেলন। সম্মেলনে পুনরায় যোগ দিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এবার কৃষ্ণাঙ্গ নেলসন ম্যানডেলার নেতৃত্বে। বর্ণবাদী সরকারের অধীন দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৬১ সালে। গত নভেম্বরের (১৯৯৫) অকল্যান্ড কমনওয়েলথ সম্মেলনে স্থগিত করা হলো নাইজেরিয়ার সদস্যপদ, সেই দেশের সামরিক সরকারের অমানবিক ও নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের জন্য। কিন্তু ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে কমনওয়েলথের সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩১। সেই বছর সম্মেলনে প্রথমবারের মতো যোগ দিল বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। আমাদের সদস্যপদ লাভে উষ্মাভরে কমনওয়েলথ থেকে পদত্যাগকারী ভুট্টোর পাকিস্তান ছিল সেই সম্মেলন থেকে অনুপস্থিত। কিন্তু আমাদের কমনওয়েলথে যোগদানের শুরুতে নাইজেরিয়াই করেছিল সমস্যার সৃষ্টি। ১৯৭২ সালে নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়াকুবু গওন আমাদের কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভের বিরোধী ছিলেন। তাঁর তখন ছিল বায়াফ্রার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমস্যা। তিনি তাই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভকে বায়াফ্রার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে বলে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। কমনওয়েলথের সেক্রেটারি-জেনারেল তখন ছিলেন কানাডার আর্নল্ড স্মিথ। আমি তখন লন্ডনে। মনে আছে কমনওয়েলথে আমাদের যোগদান পাকাপোক্ত করতে আর্নল্ড স্মিথকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল, একাধিক সুদীর্ঘ টেলিফোন আলোচনায় নাইজেরিয়ার ইয়াকুবু গওনকে আমাদের সম্বন্ধে রাজি করাতে।

সেই ইয়াকুবু গওনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রথম মুখোমুখি দেখা অটোয়াতে কমনওয়েলথ সাংবাদিক প্রদত্ত একটি 'রিসেপশনে'। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, কালো মুজিব কোট আর চাদর-পরিহিত বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেই অভ্যর্থনাসভার সবচেয়ে দৃষ্টিকাড়া রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর চারপাশে অনেক বিদেশি সাংবাদিক। হঠাৎ দেখি তিন-

পিস-ধোপদোরস্ত স্যুট পরিহিত জেনারেল ইয়াকুবু গওন এগিয়ে আসছেন বঙ্গবন্ধুর দিকে। পেছনে তাঁর সামরিক পোশাকে ভীমকায় এক সহচর। বঙ্গবন্ধুর পেছনে কম্পিত হৃদয়ের বেসামরিক বঙ্গসন্তান আমি। সম্ভাষণ জানালেন ইয়াকুবু গওন বঙ্গবন্ধুকে। তারপর অপ্রত্যাশিত একটি প্রশ্ন তিনি করলেন।

বললেন, "আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী, বলুন তো, অবিভক্ত পাকিস্তান ছিল একটি শক্তিশালী দেশ। কেন আপনি সেই দেশটিকে ভেঙে দিতে গেলেন?"

অবাক আমরা সেই প্রশ্নে। অবাক চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কমনওয়েলথের সাংবাদিকরা। এর কী জবাব দেবেন নবাগত দেশ বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক? চারদিকে পিনপতন নীরবতা। হো হো করে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে নীরবতা ভাঙলেন বঙ্গবন্ধু। বুঝলাম উত্তরটি তিনি ঠিক করে নিচ্ছেন এই হাসির ফাঁকেই। তারপর গম্ভীর, তর্জনীসঙ্কেতে বললেন, "শুনুন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আপনার কথাই হয়ত ঠিক। অবিভক্ত পাকিস্তান হয়ত শক্তিশালী ছিল, তার চেয়েও শক্তিশালী হয়ত হতো অবিভক্ত ভারত। কিন্তু সেসবের চেয়ে শক্তিশালী হত সংঘবদ্ধ এশিয়া, আর মহাশক্তিশালী হত একজোট এই বিশ্বটি। কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সব চাইলেই কি পাওয়া যায়?"

কথাটি বলেই তাঁর গলার সাদা চাদরটি হাতে নিলেন বঙ্গবন্ধু। তুলে দিলেন হতবাক নিশ্চুপ প্রেসিডেন্ট গওনের হাতে। বললেন, "এই নিন, বাংলাদেশের জনগণের তরফ থেকে আমার এই ক্ষুদ্র উপহার।" তারপর তাকালেন উপস্থিত সাংবাদিকদের পানে, এবার সহাস্যে বললেন, Gentlemen, this is of the record' ("মহোদয়, এটা ছাপবেন না যেন")। তার কারণ ছিল। নাইজেরিয়া তখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। বঙ্গবন্ধু সেই সময়ে চাননি যে ঘটনাটি জানাজানি হোক। কিন্তু অটোয়াতে সেই সন্ধ্যায় বাকযুদ্ধে কে ছিলেন জয়ী, সাংবাদিকদের মনে ছিল না সন্দেহের কোনো অবকাশ। আমরা সবাই ছিলাম পুলকিত।

২ আগস্ট ১৯৭৩ থেকে ১০ আগস্ট ১৯৭৩ পর্যন্ত অটোয়াতে সেই সম্মেলন চালু ছিল। সেই সম্মেলনে বাংলাদেশকে কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে সকলেই জানিয়েছিলেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। বঙ্গবন্ধু সম্মেলনের প্রত্যেকটি অধিবেশনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। রেখেছিলেন উল্লেখযোগ্য বক্তব্য। এক এক করে পরিচিত হয়েছিলেন কমনওয়েলথের অন্য রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে। সেই আট নয়টি দিন এতই কর্মব্যস্ত ছিলেন তিনি যে পাশ্চাত্যের কায়দায় তিনি ভোরে প্রাতঃরাশেও মিলিত হয়েছিলেন অনেক সরকারপ্রধানের সঙ্গে। একদিন হোটেলে প্রাতরাশ আয়োজনকারী, আমাদের প্রতিনিধিদলের একজন কর্মকর্তা, যার খুঁটিনাটি দেখার ছিল বিশেষ প্রবণতা, জানতে চাইলেন, ডিমের সঙ্গে গরুর মাংসের যে 'স্টেক' পরিবেশন করা হবে তা হবে মাঝারি এক ইঞ্চি পুরু না ছোট আধা ইঞ্চির। প্রশ্নটি

বঙ্গবন্ধুর সমীপে পেশ করলাম। অবাক বিস্ময়ে তিনি তাকালেন আমার দিকে। হাস্যরসের তাঁর ছিল না অভাব। বললেন, "দেখো, গরুর হাড় খাওয়া মানুষ আমি। টেপ দিয়ে মাংস মাপার হিসাব আমি কি জানি? সে কাজ তোমাদের।"

মনে পড়ে, অটোয়ার গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ এক অপরাহ্নে গাড়ি করে কিছুক্ষণের জন্য হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন তিনি। অটোয়া শহরের উপকণ্ঠের সুবিশাল অরণ্যরাজির মাঝ দিয়ে জনমানব আর যানবাহনহীন পিচঢালা পথে দ্রুত বেগে চলেছি আমরা। ঘনপল্লবিত গ্রীষ্মের তরুরাজির উপর পড়ন্ত রোদের আবরণ। পিচঢালা পথে তাই আলোছায়ার মাখামাখি। নীরবতা ভাঙলেন বঙ্গবন্ধু। বললেন, "ভেবে দেখো, সাত কোটি মানুষের বাংলাদেশ। চারদিকে মানুষ আর মানুষ।" কানাডার অরণ্যরাজির মাঝেও তাঁর চোখে ভাসছে বাংলাদেশের জনঅরণ্য। তাঁর ধ্যানে আর তাঁর চিন্তায়, সর্বক্ষণ বাংলাদেশ!

১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরে তাঁর জাতিসংঘ সাধারণ সভার ভাষণটির কথা মনে পড়ে। তখন বাংলাদেশের তথ্য প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তাহেরুদ্দিন ঠাকুর নামক একজন ব্যক্তি। তার সঙ্গে আমার কখনো হয়নি চাক্ষুষ পরিচয়। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে তিনি ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদের দোসর। কিন্তু তার মাত্র এগারটি মাস আগে, ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরে তিনি বোধকরি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য লাভের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায়। আমি তখন লন্ডন থেকে ঢাকা এসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে নিউইয়র্ক যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। একদিন তদানীন্তন পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমদ আমাকে বললেন, জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রণয়নে নাকি সেই তথ্য প্রতিমন্ত্রী অহেতুক আগ্রহ প্রদর্শন করছেন। বাংলা ভাষায় নাকি তাঁর জবর দখল। যেহেতু বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, জাতিসংঘে বাংলা ভাষায়ই তিনি তাঁর ভাষণ প্রদান করবেন, সেই মন্ত্রীপ্রবর নাকি বাংলায় খসড়া একটি ভাষণ বঙ্গবন্ধু সমীপে ইতোমধ্যে পেশ করেছেন। পরে শুনেছিলাম বঙ্গবন্ধু তাকে দিয়েছিলেন পত্রপাঠ (এই ক্ষেত্রে ভাষণপাঠ!) বিদায়। অতএব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রণীত ভাষণটি নিয়ে একদিন ভোরে পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমদ আর আমি হাজির হলাম বঙ্গবন্ধুর দফতরে। কক্ষে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু পড়ছেন আমাদের প্রদত্ত খসড়া ভাষণটি। এমন সময়ে তাঁর কামরায় প্রবেশ করলেন বাংলাদেশ বিমানের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। মুখ তুলে তাকালেন বঙ্গবন্ধু তার দিকে।

কর্মকর্তাপ্রবরের প্রশ্ন, "স্যার আপনার নিউইয়র্ক যাত্রাকালে বিমানে কি ধরনের খাবার পরিবেশন করব?" কানাডায় ইয়াকুবু গওনের সঙ্গে বাকযুদ্ধে জয়ী শেখ মুজিব এবার বাক্যহারা! আমতা আমতা করেই বললেন, "আমি কি জানি? ডাল ভাত মাছ দিয়ো আর কি। যে কোন কিছু একটা!" প্রশ্ন কর্মকর্তা নিষ্ক্রান্ত হলেন।

আবার প্রধানমন্ত্রী মনোনিবেশ করলেন খসড়া ভাষণ পাঠে। কিছুক্ষণ পরই আবার খুলল দরজা। ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা। স্যালুট জানালেন প্রধানমন্ত্রীকে।

'হ্যাঁ বলো, কী ব্যাপার?' ভাষণ পাঠে বাধাপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর প্রশ্ন।

পুলিশ কর্মকর্তাটির জিজ্ঞাসা, 'স্যার আজ বিকেলে দুর্গতদের সাহায্যার্থে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের যে প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার পাহারায় কারা রইবেন? রক্ষীবাহিনী না পুলিশ?'

অবাক বঙ্গবন্ধু আর তাঁর সামনে উপবিষ্ট ফখরুদ্দিন আহমদ আর আমিও।

"এই সিদ্ধান্ত দেয়ার, আমি ছাড়া এই সরকারে কি আর কেউ নেই", মর্মাহত প্রধানমন্ত্রীর যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন।

অবস্থা বেসামাল বুঝেই আবার স্যালুট জানিয়ে বিদায় নিলেন কর্মকর্তাটি। বঙ্গবন্ধু আবার মনোনিবেশ করলেন খসড়া ভাষণ পাঠে। সেদিন সেখানে বসে প্রশ্ন জেগেছিল মনে, এই অবস্থাটির জন্য দায়ী কে? সান্নিধ্যকামী অযোগ্য আমলার বহর, না বঙ্গবন্ধুর উদারতা? মেলেনি উত্তর।

ভাষণ পাঠ শেষে প্রধানমন্ত্রী তাকালেন আমাদের দিকে। বললেন, "ভালোই তো তোমাদের ফরেন অফিসের বক্তৃতা। কিন্তু আসল কথাই যে লেখনি। দেশে দুর্ভিক্ষ হতে যাচ্ছে সেই কথাটিই তো আমি জাতিসংঘে বলবার চাই। বাংলাদেশের সমস্যার কথা বিশ্ববাসী আমার মুখ থেকেই শুনুক। তোমাদের সংশয় কেন?"

ডাক পড়ল সাঁটলিপিকার রোজারিওর। আমাকে অদূরের সোফা দেখিয়ে বললেন বঙ্গবন্ধু, "ওখানে বসে আসন্ন খাদ্যাভাব সম্বন্ধে একটি লাইন তুমি আমার বক্তৃতায় জুড়ে দাও।" তারপর মনোনিবেশ করলেন সফর বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে অন্যান্য আলোচনায়। তার কিছুদিন পর ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলাতে প্রদত্ত বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদটি আমাকে পাঠ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য নিউইয়র্ক হোটেলে তাঁর কামরার রুদ্ধ কক্ষে প্রধানমন্ত্রী আর আমার হয়েছিল বার তিনেক বক্তৃতা পাঠের রিহার্সাল। তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধু!

১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাংলাদেশ সফর ছিল দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি বিপর্যয়ময় অধ্যায়। ভুট্টোর কাছে সফরটি ছিল একটি রাজনৈতিক চালবাজি। বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের কোন ইচ্ছাই তাঁর সেই সফরে ছিল না। তিনি আমাদের চরম খাদ্যাভাবের সেই দিনগুলোতে পরিহাসছলেই যেন উপহার হিসেবে সঙ্গে এনেছিলেন বিভিন্ন আকারের চালের প্যাকেট। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা দু' দেশের মাঝে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কোন আলোচনায়ও ছিলেন ভুট্টো

গররাজি। মনে পড়ে দ্বিপাক্ষিক আনুষ্ঠানিক সভায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধি আনেননি, তিনি সঙ্গে আনেননি তাঁর চেক বই! তাঁর নাকি ধারণাই ছিল না যে, এই প্রসঙ্গটি আমরা উত্থাপন করব।

তাঁর সফরের আগেই গণসংযোগের জন্য তিনি এদেশে পাঠিয়েছিলেন তাঁর লোকলশকর। তাঁদের প্ররোচনায় এদেশের সেই সময়ের স্বাধীনতা-বিরোধী জনগোষ্ঠী ভুট্টোকে জানিয়েছিলেন বিমানবন্দরে আর রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে উষ্ণ সংবর্ধনা। ভুট্টোর এতেই মনে ধারণা জন্মেছিল যে তিনি করেছেন বঙ্গবিজয়! এখানে অবস্থানকালে তাঁর ব্যবহারের ঔদ্ধত্য এমনই ছিল যে, তিনি সাভারে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি সম্মান জানাতেও ছিলেন অনিচ্ছুক। তখন তাঁকে স্পষ্ট ভাষায়ই বলা হয়েছিল, হয় আপনি সাভার যাবেন, নতুবা আপনার বাংলা সফর বাতিল। তখনই তিনি গিয়েছিলেন সাভারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র আমলারা সেই সময়টিতে এই সফরের ছিলেন বিরোধী। সেই সময়কার পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমদ তার 'Critical Times' বইটিতে লিখেছেন যে, তাঁর ধারণায় এই সফরটি, দুই দেশের আমলা পর্যায়ে যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়া অনুষ্ঠিত হতে দেয়া ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেনের বিরাট একটি ভুল। আমি তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

কিন্তু এ বিপর্যয়ের রাজনৈতিক পাল্টা জবাব বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন ১৯৭৫ সালের মে মাসে জ্যামাইকার কিংস্টনের কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে তাঁর একক প্রচেষ্টায়। সেই সম্মেলনের যুগ্ম ইশতেহারের ১৪ অনুচ্ছেদে রয়েছে একটি ঘোষণা। তাতে বলা হয়েছে যে, কিছু অমীমাংসিত সমস্যার জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে, হয়েছে জাতীয় পুনর্গঠনের গতি শ্লথ। তার মাঝে রয়েছে 'মানুষের স্বদেশ পুনঃপ্রেরণ [illegible] সম্পত্তির বাঁটোয়ারা।' সেই ঘোষণায় কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানরা আশা করেন যে, 'সংশ্লিষ্ট দেশগুলো'র মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যাবলির সমাধান ঘটবে।

এই ধরনের একটি প্রস্তাব পাস করানো ছিল আমাদের প্রতিনিধিদলের অভিপ্রায়। পাকিস্তানের কূটনীতিবিদদের প্রতি ভুট্টোর আদেশ ছিল যে, বাংলাদেশের এই উদ্যোগ বানচালের যেন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে কিংসটনে এলেন কানাডায় পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইফতেখার আলী। পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে ইফতেখার আলী ছিলেন আমার সিনিয়র সহকর্মী। ১৯৫৬ সালে করাচিতে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে আমি যখন যোগ দিই, আমি এবং আমার 'ব্যাচ'কে সার্ভিসে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন এই ইফতেখার আলীই। কিন্তু ১৯৭৫-এর মার্চ মাসে কিংসটন জ্যামাইকায় আমরা দুই দেশের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত। কিংসটনে তিনি আমার সঙ্গে টেলিফোনে

যোগাযোগ স্থাপন করলেন। আমার সঙ্গে দেখা করার জানালেন অভিপ্রায়। কথাটি বঙ্গবন্ধুকে আমি সঙ্গে-সঙ্গেই জ্ঞাত করলাম। তাঁকে বললাম যে, ইফতেখার আলী নিশ্চয়ই আমাদের প্রস্তাবটির বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন।

সেই দিনটি ছিল শুক্রবার, ২ মে, ১৯৭৫। কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনের একটি রেওয়াজ আছে যে, সম্মেলন চলাকালীন সপ্তাহ শেষে শুধু সরকারপ্রধানরা চলে যান শহর থেকে দূরে কোথাও তাঁদের নিজেদের মাঝে দুইদিন আলাপ-আলোচনার জন্য। তাঁরা রাজধানীতে ফিরে আসেন রোববার বিকেলে। আমলাবিহীন রাষ্ট্রনায়করা সেই দু'টি দিন তাদের মাঝে করেন খোলাখুলি আলোচনা। সেই শুক্রবারটি ছিল বঙ্গবন্ধুর শহর থেকে দূরে যাওয়ার দিন। তিনি আমাদের বললেন যে, পাকিস্তানিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে অন্যান্য রাষ্ট্রনায়ক, বিশেষ করে স্বাগতিক দেশের প্রধানমন্ত্রী মাইকেল ম্যানলি আর ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে তিনি নিজেই কথা বলবেন। আমাদের আমলাদের এই বিষয়ে করণীয় কিছু নেই।

ইফতেখার আলীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ হলো যে, নিশ্চয়ই যেন আমি দেখা করি এবং তাঁকে অভয় দিই যে, এই প্রস্তাবটি নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল কোন প্রচেষ্টাই করছেন না। কথাটি মিথ্যা নয় এই অর্থে যে, সরকারপ্রধানের কর্মকাণ্ড প্রতিনিধিদলের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং একান্ত পরিবেশে তাদের আলাপ-আলোচনা আমাদের জানার কথা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য, কথাবার্তায় ইফতেখার আলীকে আশ্বস্ত রাখা যাতে তাদের প্রস্তাব-বিরোধী কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় পড়ে ভাঁটা। ঠিক তাই হলো। শুক্রবার রাতেই একটি রেস্তোরাঁর নিভৃতে নৈশভোজের সময়ে (বিলদাতা ছিলেন তিনিই!) ইফতেখার আলীকে জানালাম যে, পাকিস্তানিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করানোর বিষয়ে আমি অথবা আমাদের প্রতিনিধিদলের কেউই নই সক্রিয়। আশ্বস্ত ইফতেখার আলীকে নৈশভোজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে নিলাম বিদায়।

সোমবার ভোরে অধিবেশনের সকালেই বঙ্গবন্ধু আমাদের জানালেন যে, তিনি প্রস্তাবটির বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। তাঁর সহজসরল ভাষায় বললেন, "তোমাদের সেই বিষয়ে আমি মাইকেল আর হ্যারল্ডের সঙ্গে কথা বলেছি।" তারপর চোখ টিপে বললেন, "সব ঠিক আছে।"

সেইদিন সকালের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বক্তব্য রাখলেন। বাংলাদেশে ভুট্টোর সফর সম্বন্ধে তিনি অন্য সরকারপ্রধানদের জ্ঞাত করলেন। তারপর জোর আশা প্রকাশ করলেন যে, কমনওয়েলথের সরকারপ্রধানগণ, পাকিস্তানিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং দুই দেশের মাঝে সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা বিষয়ে তাদের চিন্তা

সরকারিভাবে ব্যক্ত করবেন। বঙ্গবন্ধুর উক্তির সঙ্গে-সঙ্গেই জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী মাইকেল ম্যানলি বললেন যে, তাঁর মতে যুগ্ম ইশতেহারে বাংলাদেশের বক্তব্যটি ব্যক্ত হওয়া উচিত এবং কী ব্যক্ত হবে, তার একটি খসড়া যেন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল প্রণয়ন করেন। স্বাগতিক দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মাইকেল ম্যানলি ছিলেন সেই সম্মেলনের সভাপতি। তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব তাই ছিল অনেক। সেই বক্তব্যের সঙ্গে-সঙ্গেই বক্তব্য রাখলেন হ্যারল্ড উইলসন। তিনি বললেন যে, বাংলাদেশের দাবি ব্রিটেন সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। তাঁর ভাষায়, ইতিহাসে এমন কোন নজির নেই যে, দুই জাতিতে পরিণত একটি রাষ্ট্রের মাঝে সম্পত্তির যথাযথ বাঁটোয়ারা হয়নি। ('No precedent in history when a country separated into two nations and the asets were not equitably Shard')

শুধু বাধ সাধলেন তানজানিয়ার জুলিয়াস নায়রেরে। তাঁর বক্তব্য, তিনি বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। তবে কমনওয়েলথ একটি ক্লাব। পাকিস্তান তার সদস্য নয়। অতএব এই ক্লাবটির উচিত কি হবে সেই দেশকে জড়িয়ে কোন প্রস্তাব পাস করা? আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য আর মাইকেল ম্যানলি আর হ্যারল্ড উইলসনের সমর্থন বঙ্গবন্ধুর সপ্তাহ শেষের পরিকল্পনাউদ্ভুত। কিন্তু আমাদের উৎকণ্ঠা, এখন তিনি কী বলবেন জুলিয়াস নায়রেরের কথার জবাবে। চোখ থেকে তাঁর কালো ফ্রেমের চশমাটি অপসারণ করলেন বঙ্গবন্ধু। স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন জুলিয়াস নায়রেরের দিকে।

তারপর বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছো জুলিয়াস। কমনওয়েলথ একটি ক্লাব। কিন্তু আমি সেই ক্লাবেরই একজন সদস্য। অন্য সদস্যরা যদি সামান্য একটি প্রস্তাব পাস করে আমাকে সাহায্য না করেন, তাহলে এই ক্লাবের সদস্য হওয়ার আমার কিইবা ছিল প্রয়োজন? একটি দরিদ্র দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমি। কেন তবে আমি অর্ধেক পৃথিবী পেরিয়ে এসেছি এই সম্মেলনে?"

অখণ্ডনীয় যুক্তি।

হতবাক জুলিয়াস নায়রেরে। হেসে বললেন, "ঠিক আছে মুজিব। তুমি যা চাও, তাই হবে।"

প্রসন্ন বঙ্গবন্ধু। ফিরে তাকালেন তাঁর পেছনে উপবিষ্ট আমাদের দিকে। তাঁর চোখে-মুখে সাফল্যের হাসি।

সেই প্রস্তাবটি পাসের একশ'টি দিনের মধ্যেই সপরিবারে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধু। মনে কখনো কখনো প্রশ্ন জাগে, তাঁর হত্যা কি ছিল বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক সাফল্যের মুখে ভুট্টোর পাল্টা জবাব?

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু

ফারুক চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি। তিনি না থাকলে এ দেশের স্বাধীনতার সূর্যোদয় কবে হতো তা বলা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় তার মেয়াদ ছিল তাঁর পরবর্তী ধর্তব্য সকল সরকারপ্রধানের চাইতে কম। সেই সরকারপ্রধানগণ হলেন জেনারেল জিয়া, জেনারেল এরশাদ এবং বেগম জিয়া। শেখ হাসিনা সবে সরকারপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু তার বর্তমান পাঁচ বছরের মেয়াদ বঙ্গবন্ধুর সরকারপ্রধান হিসেবে সাড়ে তিন বছরের মেয়াদকে ছাড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশের অন্যান্য সরকারপ্রধান বিভিন্ন কারণে এই গণনা বহির্ভূত। খন্দকার মোশতাক আমাদের জাতীয় ইতিহাসের কোনো অংশ নন। তিনি জাতির একটি বিরাট কলঙ্ক। রাতের অন্ধকারে, কারও আবাসগৃহে অতর্কিতে কোনো সশস্ত্র দস্যুর আগমন এবং ক্ষণিকের অবস্থান তাকে গৃহস্বামীতে রূপান্তরিত করে না। ঠিক তেমনি হত্যাকারীদের কাঁধে চেপে, এ দেশের ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত খন্দকার মোশতাক সরকারপ্রধান হিসেবে গণ্য হতে পারেন না। বিচারপতি সায়েম কিছুদিনের জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে সরকারপ্রধান ছিলেন। কিন্তু তা শুধু কাগজে-কলমেই। আসলে তিনি ছিলেন একটি সামরিক পরিবেষ্টনীতে ক্ষমতাহীন ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার পর, বিচারপতি সাত্তারও তাঁর নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচন-উত্তর সময়ে, দুই কিস্তিতেই সরকারপ্রধান ছিলেন। তবে সর্বাবস্থায়ই মূলত তিনি ছিলেন একটি সুপরিকল্পিত এবং অবধারিত সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় প্রতীক্ষারত থরথর কম্পমান বলির পাঁঠা। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এবং প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সরকারপ্রধান হিসেবে সীমিত সময়ের জন্য বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এদের ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানের মাঝে কেউই সরকারপ্রধান ছিলেন না। তাদের ভূমিকা ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক।

অতএব, সরকারপ্রধান হিসেবে, তা রাষ্ট্রপতি পদেরই হোক অথবা প্রধানমন্ত্রী হোক, বঙ্গবন্ধুর মেয়াদ ছিল, সত্যিকার অর্থে অন্য সরকারপ্রধানদের তুলনায় ন্যূনতম সময়ের। পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তিলাভের পর লন্ডন আগমনের ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ড অবধি, মাত্র সাড়ে তিন বছরের কিছু বেশি।

সত্তরের দশকের প্রারম্ভে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের মতো একটি ভাষা ও কৃষ্টিভিত্তিক দেশ সৃষ্টির অনুকূলে ছিল না মোটেও। উপমহাদেশে তখন পাকিস্তান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরযোগ্য মিত্ররাষ্ট্র এবং চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক স্বার্থে হৃদ্যতাপূর্ণ এবং বহুমুখী। তখন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক কর্মসূচিতে, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ছিল অগ্রাধিকার। নিক্সন-ইয়াহিয়া সহযোগিতা তখন ছিল তুঙ্গে। হেনরি কিসিঞ্জারের পাকিস্তান হয়ে চীনে গুরুত্বপূর্ণ অতি গোপনীয় সফরটি তখন অনুষ্ঠিত হলো। অতএব, পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী কোন বিবর্তনই তখন যুক্তরাষ্ট্র অথবা চীন, কারোরই মনোপূত ছিল না। **দ্বিতীয়ত,** পাকিস্তান ছিল একটি বৃহৎ এবং প্রভাবশালী মুসলিম রাষ্ট্র। তা ভেঙে দু'টুকরো হবে, তা পূর্ব অথবা পশ্চিম এশিয়ার কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের পছন্দ ছিল না আর তেলগর্বে গরীয়ান পশ্চিম এশীয় মুসলিম রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক প্রভাব তখন ছিল ক্রমবর্ধমান। **তৃতীয়ত,** তদানীন্তন তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই ছিল টানাপড়েন। তাদের ভীতি ছিল একটি প্রতিষ্ঠিত দেশ ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রভাব পড়তে পারে তাদের নিজের আঙিনায়, উৎসাহিত করতে পারে তাদের দেশের অপকেন্দ্র বলকে। নীতিগতভাবে তাই তারা ছিল যে কোনো দেশ বিভাজনের বিরোধী। **চতুর্থত,** পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর জনসাধারণের মাঝে বাঙালিদের স্বাধীনতার পক্ষে যদিওবা যথেষ্ট সমর্থন ছিল, তা রাষ্ট্রীয় নীতিতে যাতে প্রতিফলিত না হয়, তার জন্য পাকিস্তানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং শক্তিশালী। তাছাড়া, দেশ-বিদেশে আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিগুলোও হয়ে উঠেছিল সক্রিয়।

এই অবস্থায় সরকারপ্রধান হিসেবে তাঁর কর্মমুখরতা কিছু বেশি। এক হাজার দিন-রাতের মাঝেই, এক আশ্চর্য সাবলীলতায় সহস্র প্রতিকূলতার মাঝেও বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজনৈতিক পরিপক্বতা এবং দূরদর্শিতায় তিনি বাংলাদেশের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন একটি গতিশীল, বলিষ্ঠ এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির কাঠামো— যা আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উত্তরকালে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু

উপরিউল্লিখিত কারণগুলোর জন্য পাকিস্তান ভেঙে বেরিয়ে আসা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ ছিল একটি প্রধান সমস্যা। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধুর কর্মতৎপরতা আমাদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পথ সুগম করেছিল।

সেই সময়ের দুটি বিশ্বশক্তির একটি সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমাদের স্বীকৃতি প্রদান করে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা ফেরার পর, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২-এ। পরদিনই বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে আমন্ত্রিত হলেন। বঙ্গবন্ধু যেসব কারণে তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তাঁর এই বিশ্বাস যে, একটি সুপার পাওয়ার দেশ সফর বাংলাদেশের বিশ্বস্বীকৃতির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। তাই তিনি তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণের সংবাদটি বার্তা মাধ্যমে কালক্ষয় না করেই প্রচারিত করার নির্দেশ দেন। তার ফলে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ শেষ হতে না হতেই প্রায় পঞ্চাশটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করল। ১২ মার্চ ১৯৭২-এ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিশ্বের নজরে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় আমরা চীন এবং সৌদি আরব ব্যতীত বিশ্বের সকল দেশেরই স্বীকৃতি লাভ করেছিলাম। বঙ্গবন্ধুর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, এই দুই দেশের সঙ্গে আমাদের অচিরেই গড়ে উঠবে আনুষ্ঠানিক ও অর্থবহ সম্পর্ক। তাই তাঁরই উৎসাহে, স্বীকৃতির অপেক্ষা না করেই, এই দুই দেশের সঙ্গে আমাদের শুরু হয়েছিল উচ্চপর্যায়ের আনাগোনা এবং বাণিজ্যিক লেনদেন। ১৯৭৪ সালে বন্যায় সৌদি আরব আমাদের দিয়েছিল দশ মিলিয়ন ডলারের অনুদান। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৎপর ও দূরদর্শী।

ভারত, পাকিস্তান এবং আমাদের এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর শেখ মুজিব সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন। অতীত অভিজ্ঞতার কোনো তিক্ততাই তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবান্বিত করতে দেননি। পাকিস্তান থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পরপরই ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ তিনি পাকিস্তানকে উদ্দেশে করে বলেছিলেন, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো বৈরীভাব পোষণ করি না। তোমাদের স্বাধীনতা তোমাদেরই রইল।

আমাদেরকেও স্বাধীনতায় থাকতে দাও। সঙ্গত ক্ষোভে ভরা নবীন দেশের এই রাষ্ট্রনায়কের পাকিস্তানের প্রতি আচরণে এই সংযম ও স্পষ্টবাদিতা ছিল প্রশংসনীয়। পাকিস্তানের স্বীকৃতির পরপরই তিনি ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে নির্দ্বিধায় যোগদান করেন এবং বিশ্বের ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে তাদের অধিকাংশই দুই বছর আগেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিল, তাদের সঙ্গে স্থাপন করেন হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। ১৯৭৪-এর শেষার্ধে বঙ্গবন্ধুর কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর এই অঞ্চলে বাংলাদেশীদের কর্মলাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

ভারতের সঙ্গে স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে একটি অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২-এ যখন ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে এলেন তখন কোনো ভারতীয় সৈন্য বাংলার মাটিতে ছিল না। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি সম্বন্ধে এ দেশে কখনও কখনও আলোচনার ঝড় বয়ে যায়, রাজনীতির অঙ্গনে এ নিয়ে হয় অযথা মাতামাতি। সিঁকি শতাব্দী আগেকার আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি ছিল একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। চুক্তিটির মেয়াদ ফুরিয়েছে গত মার্চ মাসে। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিতে এ চুক্তি নবায়নের আর কোনো প্রয়োজন নেই। ১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধে বঙ্গবন্ধুর দিল্লি সফরকালে ভারতের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৭৫ সালের প্রারম্ভেই শুরু হয়েছিল দুই দেশের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রক্রিয়া। বঙ্গবন্ধুর হত্যার দুই যুগ পরেও যাতে হয়নি কোনো অগ্রগতি। বঙ্গবন্ধুর সময়েই দহগ্রাম আর আঙ্গরপোতা ছিটমহলে বাংলাদেশ তার অধিকার স্থায়ী করে নেয়। আর ভারতের হাতে তার বদলি রয়ে যায় বেরুবাড়ি। দহগ্রামকে বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য তিন বিঘা করিডোরটি চুক্তি অনুযায়ী পেতে আমাদের লেগেছে দুই যুগ। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে এই সমস্যাটির সমাধান ১৯৭৫-এ হতো বলেই আমার বিশ্বাস। ফারাক্কার পানি বণ্টনে বঙ্গবন্ধু সরকার শুষ্ক মৌসুমে পেয়েছিল ৪৪০০০ কিউসেক পানির নিশ্চয়তা। তার বিশ বছর পর ১৯৯৫-তে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে হয়েছিল ১৩ হাজার কিউসেফ পানিতে। উপমহাদেশে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তাধারার প্রকাশ আমরা দেখি তাঁর বিভিন্ন বিবৃতিতে। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ কোলকাতা সফরের সময়ে রাজভবনে তার সম্মানার্থে ইন্দিরা গান্ধী প্রদত্ত নৈশভোজসভায় তিনি একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার একান্ত কামনা, উপমহাদেশে অবশেষে শান্তি ও সুস্থিরতা আসবে। প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতার বন্ধ্যানীতির অবসান হোক। আমাদের জাতীয় সম্পত্তির অপচয় না করে আমরা যেন তা আমাদের দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহার করি। দক্ষিণ এশিয়াকে একটি শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করায় আমরা সচেষ্ট রইবো। যেখানে আমরা সুপ্রতিবেশী হিসেবে পাশাপাশি বাস করতে পারি। যদি আমরা সেই দায়িত্বে ব্যর্থ হই, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।' দেশেও বঙ্গবন্ধু একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। ১৯৭৪-এর ৪ মার্চ দাউদকান্দিতে এক জনসভায় বলেছিলেন, এই উপমহাদেশে আমরা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল আর শ্রীলঙ্কা মিলে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমরা কারো সঙ্গে বিবাদ চাই না। আমরা স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে, আত্মমর্যাদার সঙ্গে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বাস করতে চাই। আমি চাই না যে, আমাদের

বিষয়াদিতে কেউ হস্তক্ষেপ করুক। আমরাও অন্যের বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নই। তার এক যুগ পরে ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে সার্কের ঘোষণাপত্র প্রণয়নের সঙ্গে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম। ঘোষণাপত্রটি মূলত ছিল এক দশক আগেকার বঙ্গবন্ধুর উচ্চারিত উপরিউক্ত ভাবনা আর ভাষারই প্রতিধ্বনি।

সত্তরের দশকের স্নায়ুযুদ্ধের সেই সময়টিতে শেখ মুজিব একটি জোট-নিরপেক্ষ, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯৭২-এ তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর সেই দেশের সঙ্গে আমাদের অর্থবহ সহযোগিতার সূচনা করেছিল। ১৯৭৪-এ বঙ্গবন্ধুর ওয়াশিংটন সফর, প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জারের ঢাকা সফর দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক ছিল। হেনরি কিসিঞ্জারের সেই বাংলাদেশ সফরের পর আজ পর্যন্ত মার্কিন মুলুক থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের কেউ এ দেশ সফর করেননি।

অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর জাপান সফর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৯৭৩-এর ১৮ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু জাপান সফর করেন। তাঁর সফর শেষে যুক্ত ইশতেহারে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সংহত করার ক্ষেত্রে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকার যে গুরুত্ব আরোপ করে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বাংলাদেশকে নিয়ে শেখ মুজিবের স্বপ্ন ছিল অনেক। ১৯৯৮ সালে যমুনা সেতুর উদ্বোধন হবে তার একটি স্বপ্নেই বাস্তবায়ন। তার সফরকালে বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র উন্নয়নশীল এশিয়ায় জাপানকে অর্থনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তাঁর সফরের পরেই বাংলাদেশ সফর করে ৪৫ সদস্যের একটি জাপানি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক মিশন। জাপানের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তখনই বাংলাদেশের সুসম্পর্কের সূত্রপাত হয়।

বঙ্গবন্ধু সরকারের দায়িত্বের সাড়ে তিন বছরের মাঝে, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রেখেছিল তার আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ১৯৭২ সালেই বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ যাত্রার পথে লন্ডনে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের কমনওয়েলথে যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। তারপর পাকিস্তান নিয়ে কিছু দেশের বিরোধিতার মুখেও বাংলাদেশ সেই এপ্রিলে কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করেছিল।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করল। বঙ্গবন্ধু সেই উপলক্ষে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ভাষণ রাখলেন ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। ভাষ

আন্দোলনের সময়ের জেলে বন্দি তরুণ নেতা শেখ মুজিব ১৯৭৪-এ জাতিসংঘে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, ১৯৫২-তে অপমানে জ্বলে ওঠা বর্ণমালায় বাংলায় প্রদত্ত তার ভাষণ। জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলায় প্রদত্ত ভাষণ প্রদানের মুহূর্তটি ছিল এক নিবিড় আত্মতৃপ্তির। বঙ্গবন্ধুর বাংলা বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদ জাতিসংঘে তাৎক্ষণিকভাবে পাঠ করার দায়িত্ব বর্তেছিল আমার ওপর। তা হয়ে রয়েছে আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে চির অম্লান একটি অভিজ্ঞতা, চির জাগরুক একটি স্মৃতি।

১৯৭৪-এ বঙ্গবন্ধু নিজ শর্তে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন লাহোরের ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে। মুসলিম বিশ্বেও দেশগুলোর সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। সেই বছরে আলজিয়ার্সের জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বের একজন সম্মানিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন সমাদৃত।

১৯৭৩-এর আগস্টে অটোয়ায় কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে ছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। তাঁর কর্মবহুল জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ছিল ১৯৭৫-এর ২৯ এপ্রিল থেকে ৬ মে'র কিংসটন, জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন।

এ দুটি সম্মেলনেই তার সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মনের মণিকোঠায় জমা আছে তাঁর অনেক স্মৃতি। অটোয়াতে প্রথমবারের মতো অনেক রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় হয়। অস্ট্রেলিয়ার হুইটলাম, জ্যামাইকার মাইকেল ম্যানলি, মালয়েশিয়ার টুন রাজ্জাক, মরিশাসের শিবসাগর রাম গোলাপ, সিঙ্গাপুরের লি কোয়ান ইউ, নিউজিল্যান্ডের নরম্যান কার্ক, শ্রীলঙ্কার শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাঁদরেল সব ব্যক্তিত্ব। প্রথম পরিচয়েই মনে হতো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যেন তাদের পরিচয় অনেক দিনের। বঙ্গবন্ধুর ব্যবহারের উষ্ণতা এবং অমায়িকতা তাদের সবার মনকে ছুঁয়ে যেতে দেখেছি। তাঁদের সবার মাঝে বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি আত্মবিশ্বাসী, সমুন্নত শির।

১৯৭৫-এ কিংসটনে শীর্ষ সম্মেলনের ৬ মে'র একটি স্মৃতি থাকবে চির অম্লান। তাঁর জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেটাই ছিল অন্তিম দিন। সেই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে নিউজিল্যান্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নরম্যান কার্ক মৃত্যুবরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নরম্যান কার্কের প্রথম পরিচয় হয় ১৯৭২ সালে ঢাকায়, যখন নিউজিল্যান্ডের বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনি ঢাকা সফর করেন। ১৯৭৩ সালে অটোয়ায় কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে তাঁর পরিচয় হয় নিবিড়তর। ১৯৭৪-এর জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরম্যান কার্ক আবার বাংলাদেশ সফর করেন। তারপর তিনি নির্বাচনে পরাজিত হন এবং বিরোধী দলনেতা হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।

কিংসটনে শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিন, ৬ মে-তে বঙ্গবন্ধুর মনে হলো যে, সম্মেলন চলাকালীন কোনো রাষ্ট্রনায়কই নরম্যান কার্কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেননি। তিনি সম্মেলনেব সভাপতি জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী মাইকেল ম্যানলির কাছে একটি চিরকুট পাঠালেন যে, তিনি নরম্যান কার্কের স্মরণে দুই একটি কথা বলতে চান। মাইকেল ম্যানলি সেই সভায় ঘোষণা করলেন যে, একটি বিশেষ এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমান কিছু বলার সময় চেয়েছেন (Sheikh Mujibur Rahman has asked for time to raise a special and commendable point) বঙ্গবন্ধুকে কিছু বলার অনুমতি দিলেন তিনি।

নরম্যান কার্কের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, নরম্যান কার্ক ছিলেন এমন একজন মানুষ যাঁকে প্রথম পরিচয়েই ভালো লেগেছিল আর নিবিড়তর পরিচয়ে লেগেছিল আরো বেশি ভালো। (Norman Kirk was one of that persors whom one like at the first meeting and liked still more when one got to know hime more intimately) তিনি আরো বলেছিলেন, নরম্যান কার্ক ছিলেন একজন মহান প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন মহান (Norman Kirk was a great prime minister, but more than that, he was a great man).

বঙ্গবন্ধুর জীবনের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এটাই ছিল তার শেষতম উক্তি। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পিটার রাউলিং তার আসন ছেড়ে এসে অশ্রুসজল নয়নে, আবেগভরা কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুকে তার এই ভাষণের জন্য তার দেশের তরফ থেকে জানিয়েছিলেন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

বঙ্গবন্ধুর এই মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর ভাষাতেই জানান। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এমন একজন মানুষ তাকে প্রথম পরিচয়েই ভালো লেগেছিল আর নিবিড়তর পরিচয়ে লেগেছিল আরো বেশি ভালো। তিনি একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তিনি ছিলেন মহান একজন মানুষ।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি

আবুল হাসান চৌধুরী

একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে দেশটির অভ্যন্তরীণ নীতির একাধারে সম্প্রসারিত ও সংযোজিত অংশ। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এক রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক দেশটির নির্মাতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির আদি স্থপতি। এজন্য ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের ২৫তম অনুচ্ছেদে প্রত্যাশিতভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'The state shall base its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, non-interference in the internal affairs of other countries, peaceful settlement of international disputes, and respect for international law and the principles enunciated in the United Nations Charter.'

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম নিয়মিত অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণেও আমাদের পররাষ্ট্রনীতির এ মূল কথাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারিত হয়েছে : 'The noble ideals enshrined in the United Nations Charter are the very ideals for which millions of our people have made the supreme sacrifice. The Bengalee nation fully commits itself to the building of a world order, in which the aspiration of all men for peace and justice will be realised.' একইভাবে ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, 'Bangladesh will continue to strive for good neighbourly relations with all its neighbours based in the principles of peaceful co-existence, respect for sovereignty and territorial integrity and non-interference in each other's internal affairs. We will continue to support every move which seeks to promote peace in our

region and in the world.' প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির এটিই হচ্ছে ভিত্তিপ্রস্তর, যাকে তিনি পৌনঃপুনিকভাবে 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়' বলে উল্লেখ করেছেন।

উপরিউক্ত উচ্চারণের মাধ্যমে জাতির পিতা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অন্যসব স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থই হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির স্থায়ী উপাদান। বঙ্গবন্ধুর এ উচ্চারণে আমরা লর্ড পামারস্টোনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই–'We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies, Our interests are eternal and perpetual.' তার বিঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে বঙ্গবন্ধু নিজের প্রতিষ্ঠিত নতুন দেশটির জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান এবং অসামান্য কূটনৈতিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তিনি মাত্র সোয়া দু'বছরের ব্যাপ্তিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের ১২১টি দেশের পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য, আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এতো অল্প সময়ের মধ্যে অন্য কোনো রাষ্ট্রনায়ক এতোগুলো দেশের সর্বাত্মক স্বীকৃতি লাভের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হননি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক কুশলতার অন্য একটি অনন্য দিক হচ্ছে, অতীতের সমুদয় দৃষ্টান্ত ম্লান করে দিয়ে তিনি জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভের পূর্বেই বাংলাদেশের জন্য এই বিশ্বসংস্থার সব বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের সদস্যপদ লাভে সক্ষম হন। একটি বৃহৎ দেশ ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে 'ভেটো' প্রদান করলে বঙ্গবন্ধু তার পররাষ্ট্র দপ্তরকে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের সদস্যপদ লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর বিচক্ষণ নির্দেশ প্রদান করেন, যা বাংলাদেশকে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে বিপুলভাবে সহায়তা করে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভের পূর্বেই জেনেভা, ভিয়েনা, লন্ডন, রোম, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের সদস্যপদ লাভ করে। এ ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে অভূতপূর্ব, যা জাতির জনকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক কুশলতার সাক্ষ্য গ্রহণ করে। তাই ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হওয়ার ঘটনাটিকে বিদগ্ধ বিশ্বসমাজ তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন বলে গণ্য করেছেন।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উল্লেখ্য, একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার পর বঙ্গবন্ধু যদিও মূলত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, এতদসত্ত্বেও তার অনন্যসাধারণ নেতৃত্বের কারণে ১৯৭৪ সালের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই

পাকিস্তানসহ বিশ্বের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এছাড়া বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথ, ১৯৭৩ সালে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এবং ১৯৭৪ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে, যা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বের অবিচল আস্থার পরিচায়ক।

ভারত ও পাকিস্তানসহ প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও কূটনৈতিক কুশলতার মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ১৩ মার্চ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নির্ধারিত সময়ের ১২ দিন পূর্বেই স্বদেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন। এছাড়া ১৯৪৭ সাল থেকে অমীমাংসিত সীমান্ত সমস্যা সমাধান, সমুদ্র সীমার নীতি-নির্ধারণ, গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদন এবং বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ভারতের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানসহ অন্য মুসলিম দেশসমূহের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হন, যা পরবর্তীকালে তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায় করতে সহায়তা করে। এছাড়া দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক সহায়তা লাভে সক্ষম হন। একই সাথে তিনি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপানসহ অন্যান্য দেশ সফর করেন। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য প্রণীত তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পেশ করেন, যা বাংলাদেশকে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭২-৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুই প্রথম তদানীন্তন জাপান সরকারের কাছে যমুনা সেতু নির্মাণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন, যার ফলশ্রুতিতে একটি জাপানি বিশেষজ্ঞ দল ঐ সময়ে বাংলাদেশ সফর করে যমুনা সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখেন। এ থেকেই জাতীয় উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া এ থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধু দেশের স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে হার ছিল, তা তাঁর শাসন পরবর্তী ২১ বছরের সরকারগুলো কখনই অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এছাড়া বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বর্তমানে যে অর্থনৈতিক

কূটনীতি অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন, তার শুভ সূচনা বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের একজন মহানায়ক হিসেবে তিনি বাঙালি জাতিকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসনে আসীন করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। আসলে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শুধু একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রই উপহার দেননি, বরং তিনি বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতির আত্মিক বৈশিষ্ট্য ও হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পুনরুদ্ধারের জন্য আমৃত্যু ঐকান্তিক প্রয়াস চালিয়েছেন। এজন্য এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, হাজার বছরের সংগ্রামী বাঙালির মূর্ত প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত জনকই নন, বরং তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দূরদর্শী স্থপতিও বটে।

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর অবদান

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশ-ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কের প্রথম পর্যায়ে দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, এবং তা হলো : (ক) ইসলামী বিশ্ব কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি দান-সংক্রান্ত বিতর্ক; ও (খ) স্বীকৃতি পাবার পর বাংলাদেশের দিক থেকে প্রতিদানমূলক ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ইসলামী বিশ্বের বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা, স্বাধীনতার পর ইসলামী বিশ্বে পাকিস্তানের বাংলাদেশে-বিরোধী প্রচারণা এবং সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি–ইত্যাদির কারণে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ ও ইসলামী বিশ্বের মধ্যে এক বিরাট মানসিক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রভাবে ক্রমান্বয়ে এ ব্যবধানের অবসান হয়।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর ইসলামী বিশ্বের যে ভূমিকা ছিল তা যেমন একাধারে বাংলাদেশ-বিরোধী, তেমনি পাকিস্তানের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনমূলক। ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টিতে এ মুক্তিযুদ্ধ ইসলাম-বিরোধী অপপ্রয়াস হিসেবে এবং ইসলামী সংহতির প্রতি হুমকি হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিল। ১৯৭১-এ ২২-সদস্যবিশিষ্ট ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) জেদ্দা অধিবেশন 'জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায়' পাকিস্তানের 'ন্যায়সঙ্গত' প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায়।

অধিবেশন শেষে প্রকাশিত ইশতেহারে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্যে বিদেশী শক্তিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়। চরম সংকটকালে পাকিস্তানের পাশাপাশি যুদ্ধ করার জন্যেও ইরান ইচ্ছা প্রকাশ করে; কারণ ইসলামী সংহতি রক্ষার জন্যে তা ছিল জেহাদের মতো নৈতিক কর্তব্য। তবে এ সময়ে মিশরের ভূমিকা ছিল বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং কূটনৈতিক বিবেচনা-প্রসূত: তার দৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা সঠিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়নি। কাজেই দু'অংশের মধ্যে ঐক্য অটুট রাখতে হলে সুনিশ্চিত সমাধান খুঁজে বের করা দরকার। তবে অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রই শুধুমাত্র নৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন

জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করছিল। মার্কিন কংগ্রেসের বিধিনিষেধ আরোপিত হবার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তানের পক্ষে সরাসরি অস্ত্র পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে কতিপয় আরব রাষ্ট্রের সহযোগিতা পাকিস্তানী সামরিক চক্রকে বাংলাদেশে গণহত্যায় উৎসাহিত করে।

১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ইসরায়েলের ভূমিকা ছিল বেশ বিস্ময়কর। ২ জুলাই ইসরায়েলী সংসদ (Knesset) বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান সামরিক চক্রের "পাশবিকতা ও বেপরোয়া ধ্বংসলীলাকে" নিন্দা করে একটি প্রস্তাব পাশ করে। এমনকি তাদের রেড ক্রস (Magen David Adom) বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ওষুধ, কাপড় ও খাবার পাঠায়। শুধু এই নয়, ১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে ইসরায়েল বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানায়। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ সরকার ইসরায়েলের এ সহানুভূতি গ্রহণ করেনি। ইসরায়েলের এ ভূমিকায় নাটকীয় বিস্ময় থাকলেও একেবারে দুর্বোধ্যও নয়। ইসরায়েলের নীতি বাংলাদেশের প্রতি যথার্থ মমত্ববোধ দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়নি; উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামী বিশ্বের দুঃখজনক বৈরিতায় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশের ওপর একটি মানসিক প্রভাব গড়ে তোলা। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ইসরায়েলের অর্থ, অস্ত্র ও কূটনৈতিক স্বীকৃতি গ্রহণ করলে তা হতো আরব বিশ্বের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের এক বিরাট কূটনৈতিক বিজয়। অবশ্য তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। যখন আরব-বিশ্ব সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করছে তখন ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। কিন্তু তা না করে বাংলাদেশ আরব-বিশ্বকে একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষাই দিয়েছিল।

অবশ্য আরব বিশ্বের বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। প্রথমত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাদের কাছে পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে ইসলামী সংহতি বিনষ্টের একটি অপপ্রয়াস মনে হয়েছিল। ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনও এ ধারণা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছিল। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের অপপ্রচার তাদের জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত সমস্যা সম্পর্কে আরব বিশ্ব সম্যকভাবে অবহিত ছিল না। বলা যেতে পারে, কিছুটা 'ইনফরমেশন গ্যাপ'-এর মতো পরিস্থিতি ছিল। ১৯৭৩-এর জানুয়ারি মাসে ঢাকা সফরকারী মিশরীয় সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের নেতা মোহাম্মদ হায়কল এ কথা স্বীকার করেছিলেন : "সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল না। এখন মনে হয় আমরা যা ভেবেছিলাম ঘটনাটা আদৌ তা ছিল

না।" কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিশ শতকের পৃথিবীতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দানে ধন্য সহজতর সংবাদ প্রবাহের যুগে এ ধরনের 'ইনফরমেশন গ্যাপ' কি ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ ও কান ঢেকে রাখার মত ব্যাপার নয়? অবশ্য আমরা দেখেছি, মিশর প্রথম থেকেই একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সার্বিকভাবে আরব বিশ্ব তথাকথিত ধর্মীয় বিবেচনার দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের কাছে মনে হয়েছিল ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্ররোচনায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় কিছু বিপথগামী বাঙালি ইসলামী সংহতি বিপন্ন করছে। তারা এটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, এ মুক্তিযুদ্ধ ছিল বঞ্চনা, স্বৈরাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে; যা যুক্তির বিচারে ইসলামী আদর্শের সমর্থন পেতে পারতো।

আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে : কেন স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো ইসলামী রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি? তিনটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। **প্রথমত**, আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রতি ইসরায়েলের সমর্থন ও স্বীকৃতি তাদেরকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এ সমর্থন ও স্বীকৃতি বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করলেও তাদের মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ইসলামবিরোধী রাষ্ট্র হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করবে। **দ্বিতীয়ত**, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়ে তারা ইসলামী সংহতির 'একনিষ্ঠ সেবক' পাকিস্তানের বিরাগভাজন হতে চায়নি। **তৃতীয়ত**, তারা ভেবেছিল, ভারতের তাঁবেদার একটি দুর্বল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে কোন কূটনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার হবে না।

অবশ্য সময়ের বিবর্তন ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষেই মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছিল। এবং বঙ্গবন্ধুর আমলে ও ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি চালু থাকার সময়েই ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন সূচনা হয়। এ পরিবর্তনের পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হলে ১৯৭২-এ ঘোষিত সংবিধানের ভিত্তি ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি আলোচনা করা প্রয়োজন।

সাংবিধানিকভাবে মুজিব সরকার ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭২-এর ৪ নভেম্বর ঘোষিত প্রথম সংবিধানে (ক) যাবতীয় সাম্প্রদায়িকতা, (খ) কোন একটি বিশেষ ধর্মের জন্যে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার, এবং (ঘ) ধর্মের ভিত্তিতে পার্থক্য করার ঐতিহ্যকে বিলোপ করা হয়। এ ছাড়া সংবিধানের ভূমিকাতেও অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭১-এ ইসলাম ও ইসলামী সংহতির নামে যে নৃশংস বাঙালি (পাকিস্তানি ইসলাম-সেবক ও তাদের বাঙালি সহযোগীদের পরিভাষায় 'কাফের') নিধন যজ্ঞ চলেছিল, তার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এমনি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী দিনগুলোতে হত্যাযজ্ঞের সহযোগী

ধর্মান্ধদের ও তথাকথিত ইসলামের বিরুদ্ধে আপামর জনগণের যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা পরিলক্ষিত হয়েছিল তা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে ইসলাম অনুপস্থিত থাকবে। এ ধারণা বাস্তবে পরিণত হলো যখন ১৯৭২-এ সরকার বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণকারী দক্ষিণপন্থী ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তবে মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়; বঙ্গবন্ধু নিজেই তা মনে করেন নি কখনই।

১৯৭৪-৭৫-এর অর্থনৈতিক সংকট ও ইসলামী বিশ্বের নিকট থেকে স্বীকৃতি আদায়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নতুন মোড় নিতে থাকে। ১৯৭৫-এর মাঝামাঝি এ পরিবর্তনের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকট হয়েছিল। ১৯৭৫-এর ২২ মার্চ তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ-বলে ইসলামিক একাডেমী ও বায়তুল মুকাররম সোসাইটিকে একীভূত করে বৃহত্তর পরিসরে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২৮ মার্চ 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাকট' প্রবর্তিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রম, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী মন্তব্য করেন, "ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি বাংলাদেশ আস্থাশীল; এবং ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি শান্তি ও বিশ্বজনীন সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সে প্রয়াস চালিয়ে যাবে।" এ বক্তব্য ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ। মনে রাখতে হবে, এ সময়ে বাংলাদেশ ছিল জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আবর্তে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পেট্রো-ডলারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেছিল। তবে এটা বলা অযৌক্তিক হবে যে, শুধুমাত্র ১৯৭৪-৭৫-এ বাংলাদেশ এ ব্যাপারে সচেতন ছিল; তবে ১৯৭৫-এ তা ছিল তীব্র। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে নিজের ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে সচেষ্ট ছিল। বিভিন্ন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ভ্রাম্যমাণ বিশেষ দূত পাঠানো হয়েছিল। ১৯৭৩-এ আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠক উপলক্ষে সমবেত ইসলামী নেতৃবৃন্দের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্যে বঙ্গবন্ধুর আকর্ষণীয় বাগ্মিতা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এবং এর থেকেই দেখা যায়, বাংলাদেশের জন্যে ইসলামী বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মিশর, আলজিরিয়া ও মালয়েশিয়া তৎপরতা শুরু করেছে। ফলে দেখা যায়, ১৯৭৫-এর আগস্ট মাসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নিচের সারণীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতিদানের সময়কাল দেয়া হলো ঃ

ইরাক–২৪ জুন ১৯৭২; আলজিরিয়া/মরিতানিয়া/তিউনিসিয়া–১৭ জুলাই ১৯৭৩; মরক্কো–২০ জুলাই ১৯৭৩; মিশর–১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩; সিরিয়া/জায়ারে/গ্যাবোন–১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩; সুদান–১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩;

লিবিয়া–১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩; কুয়েত–৩ সুদান–১৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান/তুরস্ক–২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪; সংযুক্ত আরব/ আমিরাত–৬ মার্চ ১৯৭৪; সৌদিআরব/সুদান–১৬ আগস্ট ১৯৭৫; জর্দান/ইরান/ ইয়েমেন–১৯, ২০, ২১ আগস্ট ১৯৭৫।

বাংলাদেশের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম সূচনা ১৯৭২-এ আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থা-র (AAPS) সম্মেলনে। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়। সম্মেলনে সমবেত আরব রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশ এই সংস্থার সদস্য হয়। এরপর থেকেই বাংলাদেশকে ইসলামী বিশ্বের সক্রিয় সদস্য করে নেয়ার জন্যে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। একই বছর জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে (২৯ ফেব্রুয়ারি–২ মার্চ ১৯৭২) সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোর মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হবে। লক্ষণীয় যে, এ পর্যায়েও পাকিস্তানের বিরাগভাজন হতে কেউ চায়নি। অবশ্য উক্ত সম্মেলনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময়ে পরিস্থিতি বদলে যায়; বেশিরভাগ সদস্যই পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার সমর্থনমূলক নীতিতে অবিচল থাকার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে।

বৈঠকের মাধ্যমে পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ভেবেছিল হয়তো পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে আপোষ করা সম্ভব হবে; এবং এ উদ্যোগের পেছনে পাকিস্তানের প্ররোচনা কাজ করেছিল, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তবুও বলা চলে যে, বাংলাদেশ–ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে ১৯৭২ ছিল একটি ক্রান্তিকাল। কারণ, এ বছর মিশর, ইরাক ও দক্ষিণ ইয়েমেনের সমর্থনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্য হতে পারে। এ দেশগুলোর সরকার-প্রধানদের প্রতি পাঠানো এক বাণীতে বঙ্গবন্ধু ইসলামী বিশ্বের প্রতি তাঁর সরকারের নীতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন, "এ দেশগুলোর বিষয়টি অজানা নয় যে, পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনী ধ্বংস করে যাওয়া অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে বাংলাদেশ নিয়োজিত এবং এতে তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।" ঢাকার একটি ইংরেজি দৈনিক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে– "আমরা এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে পারি না যে, এ সংকটময় মুহূর্তে সারা বিশ্বের, বিশেষ করে আরবদের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব আমরা চাই এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবি করতে পারি।"

আফ্রো-এশীয় সম্মেলন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল। ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাস আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন এমনি আর একটি সুযোগ করে দিয়েছিল। বিশেষ করে আরব বিশ্বের

কাছে যথার্থ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করার জন্যে এ সম্মেলনেও বঙ্গবন্ধু তৎপর ছিলেন। বিভিন্ন বৈঠকে আরব নেতৃবৃন্দকে এটা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা শুধু ভ্রান্তই নয়, বরং অপর্যাপ্ত। এ ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর সফলতায় সেদিন সৌদি আরবের একজন সরকারি মুখপাত্র মন্তব্য করেছিলেন, "মধ্যপ্রাচ্যে এখন বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক পরিষ্কার হয়েছে।" বাংলাদেশ সম্পর্কে লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান গাদ্দাফীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ! মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই গাদ্দাফী বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে আসছিলেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার যে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এক নাতিদীর্ঘ আলোচনার পর তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করতে শুরু করেন। অথচ আলোচনার সূচনায় গাদ্দাফী চরমভাবে বাংলাদেশ-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। আলজিয়ার্স সম্মেলন থেকে দেশে ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু বাহরাইনে যাত্রাবিরতি করেন। বাহরাইনে তাঁর এটা ছিল প্রথম সফর। ইসরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আরবদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে বাংলাদেশের দ্বিধাহীন সমর্থনের কথা জানিয়ে তিনি সেখানকার সরকারি মহলে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জন করেন।

ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক গড়ে ওঠার ইতিহাসে লাহোর ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) শীর্ষ বৈঠক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বৈঠক শুরু হবার বেশ আগে থেকেই যে-বিতর্ক জমে উঠেছিল তা হলো : বাংলাদেশকে এই সংস্থার সদস্য করে নেয়া সমীচীন হবে কিনা। অথচ ১৯৭৪-এর মধ্যে কয়েকটি ইসলামী রাষ্ট্রসহ বিশ্বের ১১৬টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। কাজেই বাংলাদেশকে সদস্য না করার ব্যাপারটা বেশ অযৌক্তিক ছিল। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর একটি বক্তব্য সংস্থার কর্মকর্তাদের বেশ বিব্রত করেছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল : "যদিও আমাদের শতকরা আশি ভাগ জনগণ মুসলমান এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অধিবাসী তবুও আমরা ইসলামী শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে আগ্রহী।" তবে তিনি একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন : পাকিস্তান স্বীকৃতি দিলেই বাংলাদেশ বৈঠকে যোগ দেবে, নইলে নয়। বাংলাদেশের এ শর্ত সম্মেলন-কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতর্ক ও কূটনৈতিক তৎপরতার সূচনা করে। সে মুহূর্তে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না; এ সময়ে পাকিস্তানের বিশেষ অনুরোধে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সা'দাত মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে রাজী হন। কায়রোতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদ ও বাংলাদেশের বিশেষ দূত বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী ১২ ফেব্রুয়ারি পৃথক পৃথকভাবে আনোয়ার সা'দাতের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু আনোয়ার সা'দাতের এ-উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, কারণ পাকিস্তানের স্বীকৃতি ছাড়া বাংলাদেশ লাহোর যেতে অসম্মতি জানায়।

সুতরাং পাকিস্তানকেই একটু নমনীয় হতে দেখা যায়। ১৬ ফেব্রুয়ারি সে স্বীকৃতি দিতে রাজী হয়। তবে একটি শর্তে। শর্তটি হলো, ভারতে আটক ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীর কোন বিচার করা হবে না, এ মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হবে। বাংলাদেশ এ নিশ্চয়তা দিতে রাজী ছিল না; কাজেই নতুন সংকটের সৃষ্টি হলো। ২০ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে সোমালিয়ার প্রস্তাব অনুসারে ঢাকায় একটি বিশেষ প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়। এ প্রতিনিধিদল ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে আলোচনায় সন্তোষজনক অগ্রগতি হওয়ার প্রেক্ষিতে ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। একই দিনে মুজিব ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের স্বীকৃতির অর্থ এই নয় যে, যুদ্ধবন্দীর বিচার না করার শর্ত মেনে নেয়া হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ২২-সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে লাহোর যান।

লাহোর সম্মেলনে যোগ দেয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ও ইসলামী বিশ্বের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সার্বিক বিচারে বলা যেতে পারে, ১৯৭৪ ছিল বাংলাদেশের জন্যে কূটনৈতিক সাফল্যের বছর। কারণ, একই বছর বাংলাদেশ জাতিসংঘেরও সদস্য হয়। ইসলামী বিশ্বে নিজের স্থান করে নিতে যেমন পাকিস্তানের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় তেমনি জাতিসংঘে মোকাবেলা করতে হয়েছিল চীনের বিরোধিতা।

নিহত হবার (১৫ আগস্ট ১৯৭৫) পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করেছিলেন ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে। এ সময়ে প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ তার সীমিত সামর্থ্য সত্ত্বেও আরব বিশ্বের জন্যে যাবতীয় সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। তবে উল্লেখ্য যে, ইসরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আরবদের সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের সহানুভূতির বাস্তব প্রমাণ দেবার প্রথম সুযোগ এসেছিল ১৯৭৩-এর আরব-ইসরায়েলের যুদ্ধের সময়ে। এ যুদ্ধের শুরু থেকেই বাংলাদেশের জনগণ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। সারাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রতিবাদ সভা আর বিক্ষোভ মিছিল। আরবদের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে পাঠানো হয়েছিল ২৮-সদস্যের একটি ডাক্তার দল; এটি ছিল বিদেশ থেকে পাঠানো সংগ্রামরত আরবদের জন্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ডাক্তার দল। সবচেয়ে বড় দল পাঠিয়েছিল কিউবা। একই সময়ে এ যুদ্ধের গুরুদায়িত্ব বহনকারী মিশরের জন্যে পাঠানো হয়েছিল এক লক্ষ পাউন্ড চা। উপরন্তু আরবদের পাশাপাশি যুদ্ধ করার জন্য পাঠানো হয় ৫,০০০ সদস্য বিশিষ্ট একটা স্বেচ্ছাযোদ্ধা বাহিনী, যাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন ভূতপূর্ব মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের এ ভূমিকা আরবদের জন্যে ছিল বিমুগ্ধ বিস্ময়। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশ তখনও প্রধান ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর স্বীকৃতি পায়নি। অপরদিকে আরবদের এ মরণপণ সংগ্রামের প্রতি পাকিস্তানের নিস্পৃহতা ও ঔদাসীন্য ছিল বিপন্ন বিস্ময়। কাজেই আরবদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

জাগতে সময় লাগেনি। এ যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের একজন সাংবাদিককে মিশরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছিলেন : "আমরা এতদিন পাকিস্তানের প্রচারণা বিশ্বাস করে এসেছি; এবং আপনাদের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলাম। এখন আমরা উপলব্ধি করছি যে, ইয়াহিয়া চক্রের দ্বারা সংঘটিত অপরাধে প্রধানমন্ত্রী জনাব ভুট্টোরও যোগসাজশ ছিল।" একই সময়ে আরেকজন মিশরীয় কূটনীতিবিদ এ সাংবাদিককে কিছুটা অভিভূত করে মন্তব্য করেছিলেন : "আপনাদের প্রধানমন্ত্রী (শেখ মুজিব) একটি ব্যাপক যুদ্ধে একটিও গোলা বা অস্ত্র ব্যবহার না করে আরব বিশ্বসহ প্রায় অর্ধেক আফ্রিকা জয় করে নিয়েছেন।" এ মন্তব্যে অতিরঞ্জন থাকলেও বাস্তবতার অভাব ছিল না। কারণ আরব বিশ্বে সে সময়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এমন ব্যাপকভাবে স্থান করে নিয়েছিল যে, একজন সাধারণ মানুষও শেখ মুজিবের নাম জানতো। তবে মনে রাখা দরকার, জনমত ও সরকারি মতের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবধান ছিল। জনমত যখন পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশের জন্যে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে তখনও দেখা যায় বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। অবশ্য পেছনে সার্বিক কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত চিন্তা-চেতনা কাজ করছিল।

ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কের সূচনা থেকেই বাংলাদেশ প্যালেস্টাইন সমস্যার ব্যাপারে তার নীতি-অবস্থান ও মূলনীতি নির্ধারণে সচেষ্ট ছিল। ১৯৭৩-এর নভেম্বর মাসে এ-সমস্যার প্রতি শেখ মুজিব সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে তৎকালীন সংসদ স্পীকার আবদুল মালেক উকিল মন্তব্য করেছিলেন : "নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন প্যালেস্টাইনবাসী ও সংশ্লিষ্ট আরব রাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করেই মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর তা ছাড়া এটাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, পি.এল.ও. একটি বাস্তব সত্য এবং ইয়াসির আরাফাত প্যালেস্টাইনীদের নেতা হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।" জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের প্রথম ভূমিকাই ছিল প্যালেষ্টাইন সমস্যাকে কেন্দ্র করে। জাতিসংঘের প্যালেস্টাইন আলোচনায় পি.এল.ও-কে প্যালেস্টাইনের মুখপাত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে মিশর যে প্রস্তাব এনেছিল বাংলাদেশ তা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। বাংলাদেশের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৫-এর জানুয়ারি মাসে পি.এল.ও. ঢাকায় একটি রেসিডেন্ট অফিস খোলে। এর কিছুদিন পরেই আরাফাতের অনুরোধে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার জন্যে প্যালেস্টাইনী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করে।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক রাষ্ট্রীয় সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণেই বঙ্গবন্ধু সুযোগ পেলেই ইসলামী রাষ্ট্র সফর করতেন। ১৯৭৪-এর নভেম্বর মাসে তাঁর কায়রো ও কুয়েত সফর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সফরের সময়ে তিনি প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানে আরবদের

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও ইসরায়েলকে অধিকৃত আরব এলাকা ছেড়ে দেবার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এ সফরের পর আরব বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। অপরদিকে নিষ্ক্রিয়তা ও নিস্পৃহতার কারণে পাকিস্তানের ভাবমূর্তির বেশ অবনতি হয়েছিল। মনে হয় পাকিস্তানের এহেন ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূমিকার গুরুত্ব মানসিক কারণে অতিরঞ্জিত হয়। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক।

বঙ্গবন্ধুর আমলে বাংলাদেশের দুটো চিত্র ছিল। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিত্যনতুন শক্তি সঞ্চয় করছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তি, পাকিস্তানসহ অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি, চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ– এ সবই বাংলাদেশকে রুশ-ভারত প্রভাব এড়িয়ে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে সাহায্য করেছিল। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভূমিকার এ নতুন প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর রাষ্ট্রীয় আদর্শেও কিছু সুপরিকল্পিত পরিবর্তন আনতে শুরু করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭৫-এর মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিবর্তনের এটিই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। অধ্যাদেশের ভূমিকায় বলা হয়েছিল, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হবে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের অবদান সম্পর্কে গবেষণা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামের মূলনীতির প্রসার করা। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে বাংলাদেশ ১৯৭২-এর স্বাধীনতা-পরবর্তী চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছিল। বাস্তবে কিন্তু তা ছিল না। মনে রাখতে হবে, এ পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ তথাকথিত ধর্মান্ধতার অর্থে ইসলামী আদর্শের কথা বলেনি; একটা গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অতি সহজেই লক্ষণীয়। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে এ ধারণা দেয়া যে, বাংলাদেশ ইসলাম-বিরোধী কোন কাজ করছে না। উপরন্তু মনে রাখতে হবে, অন্তত শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতায় কোন পরিবর্তন করা হয়নি। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু ইসলামকে কূটনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এ মন্তব্যের উদ্দেশ্য এমন একটা ধারণা দেয়া নয় যে, তিনি দেশে ইসলাম-বিরোধী ভূমিকা পালন করছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বঙ্গবন্ধু ধর্মহীনতা বোঝাননি। এ ভূমিকার মাধ্যমে তিনি নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য জীবদ্দশায় তিনি এ নীতির সুফল দেখে যেতে পারেন নি, রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাঁর উত্তরসূরীদের জন্যে তা বরাদ্দ ছিল।

বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

ড. সুকুমার বিশ্বাস

আমরা জানি, ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জাপান বাংলাদেশকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে প্রত্যাবর্তনের মাত্র এক মাসের মধ্যে জাপানের এই স্বীকৃতিকে উভয় দেশের মানুষই অভিনন্দিত করে। জাপানের পত্রিকা Mainichi Daily News প্রসঙ্গে জানালো "Japan Thursday morning officially recognized the government of People's Republic of Bangladesh and immediately informed Dacca of its decision, the foreign Ministry announced.

"Japan was the 31st country to recognize the Bangladesh Government. India, the Soviet Union, Australia and Britain have already done so.

"After the Cabinet's decision Foreign Minister Takeo Fukuda informed Bangladesh Foreign Minister Mohammad abdus samad Azad through masatada Higaki, Japanese Consul General in Dacca of it. (১)

On the sam e day the Japanese newspaper published an editorial titled 'Logical Recognition.' The editorial said :

"The Government's decistion to recognize Bangldesh is a logical move. The state of Bangladesh was destined to be born. In opposition to West Pakistan's colonial rule-like discrimination, Bangladesh have demanded more autonomy bordering on independence ever since the elections in 1970. The then Yahya Government in West Pakistan refused, however, to taklk with the Benglese people. On the contrary, West Pakistan embarked on

armed suppression which led to the tragic war. The independence of Bangladesh was a natural course of events." (২)

এ প্রসঙ্গে জানালো জাপান সরকারের এই স্বীকৃতিকে কেবল বাংলাদেশর মানুষ নন, জাপান প্রবাসী বাংলাদেশের মানুষও অভিনন্দিত করলো। এ বিষয়ে 'দি জাপান টাইমস্' লিখলো :

"Bangladesh nationals in Tokyo Thursday afternoon celebrated the recognition of the Dacca Government by the Japanese Government at the home of S.M. Maswood, 56, the Bangladesh representative in Japan, at Ichiban-cho in Chiyoda Word, Tokyo. (৩)

জাপান সরকারের স্বীকৃতি সংবাদ কেবল জাপান নয়– বাংলাদেশের সংবাদপত্রেও সেটা ফলাও করে প্রকাশ করা হয়।(৪)

"Co-operation with Japan will expaned" শিরোনামে অপর এক সংবাদে বলা হলো : "Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman said in Dacca on Thursday that the area of co-operation between Japan and Bangladesh would steadily expand in future to the mutual benefit of the two peoples," reports BSS.

He Also said : "On behalf of my Government and people and on my own behalf, I take this opportunity to extend our warm greeting and felicitations to the Government and people of Japan."

Mr. M.G. Higaki, Chief of the Japanese Mission in Dacca called on the Prime Minister Bangabadhu Sheikh Mujibur Rahman on Thursday Morning and handed over a letter from the Japanese premier Mr. Eisako Sato. (৫)

আমরা দেখেছি, বাংলাদেশকে জাপান সরকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির পূর্বেই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য জাপানের জনগণ, বেসরকারি সাহায্য-সংস্থা, ব্যক্তি এবং সরকার সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন।

১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি জাপান এয়ার লাইন্সের একটি বিরাট বিমান নানা সাহায্য সামগ্রী নিয়ে ঢাকা পৌঁছায়। সাহায্য-সামগ্রীর মধ্যে ছিলো ১০ টন দুধ, ৫,০৪০টি কম্বল, ২,০০০টি ট্রানজিস্টর এবং টিনজাত খাদ্য, জাপানের জনগণ ও স্কুলের ছেলেমেয়েরা জাপান রেডক্রসের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য এই সাহায্য দান করেন।(৬)

জাপান রেডক্রস সোসাইটি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সাহায্য সামগ্রী এবং নগদ অর্থ প্রদান করে তার পরিমাণ ছিলো ২২০.০৬ মিলিয়ন ইয়েন।(৭)

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনারেল ফুজিয়ারার নেতৃত্বে চার-সদস্যবিশিষ্ট জাপানি শুভেচ্ছা প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন। প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় প্রতিনিধি দলের নেতা বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে জাপান বড় রকমের সাহায্য দিতে ইচ্ছুক বলে জানান। এই আলোচনা কালে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি মিশনের প্রধানও উপস্থিত ছিলেন।(৮) বলা প্রয়োজন যে, জেনারেল ফুজিয়ারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জাপানে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে প্রভাবশালী Diet সদস্য মিঃ তাকাশি হায়াকাওয়ার নেতৃত্বে চার-সদস্যবিশিষ্ট একটি পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে প্রতিনিধি দলটি রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, শিল্পোন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিনিধি দলের নেতা মি. তাকাশি হায়াকাওয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে জাপানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি ব্যক্তিগত চিঠি হস্তান্তর করেন।

অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাকালে প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সম্ভাব্য সকল প্রকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেন। মি. হায়াকাওয়া বাংলাদেশের চাহিদার অর্থনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনার জন্য একটি প্রতিনিধি দলকে জাপান সফরের আমন্ত্রণ জানান।

পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনাকালে প্রতিনিধি দলকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, বাস্তুহারা ও ভারত থেকে প্রত্যাগতদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য সাহায্যদ্রব্যের চাহিদা সম্পর্কে অবহিত করানো হয়। জাপান প্রতিনিধি দলের নেতা জানান যে, তাঁরা ঘোড়াশাল সার কারখানা চালু করে ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের সার সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন। তিনি আরো জানান যে, জাপান সরকার প্রায় ৩ হাজার সেকেন্ডহ্যান্ড মোটরকার, ট্রাক, বাস ও অন্যান্য যানবাহন এবং কয়েকটি নৌযান সরবরাহ করতে পারে।

শিল্পোন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনাকালে প্রতিনিধি দলের নেতা 'সোনার বাংলা'র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে, জাপানের জনগণ এই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কামনা করে। তাঁরা বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণকে পূর্বের চাইতে অধিকতর সহযোগিতা প্রদান করতে আগ্রহী।(৯)

১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসেই জাপান সরকার বাংলাদেশকে ৮০ লক্ষ ডলার মানবিক সাহায্য দেবার কথা ঘোষণা করেন।(১০)

এ বছরই ১৫ অক্টোবর টোকিওতে অনুষ্ঠিতব্য পানি-নিয়ন্ত্রণ সেমিনার বিষয়ে আলোচনার জন্য জাপান সরকারের কৃষি-সমবায় বিভাগের পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রধান তাকালিজে কিমিরা ঢাকা আসেন। কিমিরা বলেন যে, এফ.এ. ইউ-র সহযোগিতায় জাপান সরকার এ সেমিনারের আয়োজন করেছে। সেমিনারের লক্ষ্য হচ্ছে এশীয় দেশগুলোর কৃষিবিষয়ক পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করেমত বিনিময় করা।(১১)

১৯৭২ সালের আগস্ট মাসেই জাপান সরকার অক্টোবর মাসের মধ্যে বাংলাদেশে ৫০ হাজার টন চাল রফতানী করবে বলে জাপানি দফতর সূত্রে জানা যায়। জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শ্রী মনোরঞ্জন ধর ও জাপানি পররাষ্ট্র দফতরের এশীয় ব্যুরো প্রধান মিঃ কেঞ্জো ইওশিদা-এর মধ্যে এই মর্মে তথ্য বিনিময় হয়।(১২)

এ বছর নভেম্বর মাসে জাপান সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রদত্ত সাহায্যের অংশ হিসাবে যমুনা নদীর উপর একটি সেতু তৈরি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি এ বিষয়ে অনুরোধ জানিয়েছিল। জাপান সরকারের নির্মাণ মন্ত্রণালয়ের একটি সম্ভাব্যতা জরিপকারী দল তথ্য সংগ্রহের জন্য এ বছরই বাংলাদেশ সফর করবে বলে জানা যায়। যমুনা-সেতু নির্মাণে সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয় ২০ কোটি মার্কিন ডলার।(১৩)

১৯৭৩ সালের ৫ ডিসেম্বর Bangladesh and Japan signed an agreement providing for 12 million dollar Japanese Commodity grant to Bangladesh.(১৪)

১৯৭৩ সাল জাপান-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যময় বছর। এ বছরেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাপান সফর করেন। জাপান থেকেও বহু প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেন। উভয় দেশের মধ্যে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয় বেশ কিছু।

১৯৭৩ সালের ২৭ জানুয়ারি খাদ্য-সাহায্য কর্মসূচির অধীনে ১২,৫০০ টন চাল সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চালের দাম ২০ লাখ মার্কিন ডলার। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে খাদ্যমন্ত্রী শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্য জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যতে এ দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।(১৫)

এ বছর ২৪ মার্চ কারিগরি সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য জাপান ও বাংলাদেশ এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশস্থ জাপানি রাষ্ট্রদূত মিঃ তাকাশি ওয়োমাদা ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সচিব স্ব স্ব সরকারের পক্ষে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন।(১৬)

এ বছর এপ্রিল মাসে ঢাকা ক্লাব এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাপান বাংলাদেশকে ২২০টি বাস ও ১৫০টি ট্রাক প্রদান করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী মনসুর আলী জাপানি রাষ্ট্রদূত মি: ওয়োমাদা মন্ত্রীর হাতে চাবিগুলি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে জাপানি রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের প্রয়োজনের তুলনায় এ মঞ্জুরী সামান্য হলেও এতে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি জাপানি জনগণের প্রীতি ও ভালোবাসার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গতিশীল নেতৃত্বে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ বর্তমান সমস্যাটি কাটিয়ে উঠে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রদূতের ভাষণের জবাবে যোগাযোগ মন্ত্রী মনসুর আলী এ মঞ্জুরীর জন্য বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানান। আনরব প্রধান মিঃ এফ ল্যাকটি এ-মঞ্জুরীর জন্য জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে ট্রাক ও বাস নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান জাপান মিৎসুবিশি মোটরস কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ মিয়াবারা যোগাযোগ মন্ত্রীকে বাসের একটি প্রতিকৃতি উপহার দেন।(১৭)

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জরুরী চাহিদা পূরণের জন্য জাপান সরকার এক কোটি ৬০ লাখ গজ জাপানি কাপড় দান করেন–যার বাংলাদেশ বাজার মূল্য ২৫ কোটি টাকা।(১৮)

৩০ এপ্রিল ঢাকায় জাপানের মহামান্য সম্রাট হিরোহিতোর ৭২তম জন্ম বার্ষিকী পালিত হয়। সাংস্কৃতিক সংগঠন "এশিয়া বুংকা কায়কান দেশকাই" এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে মৈত্রী-সম্পর্ক ও সমঝোতা আরো বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে উল্লেখ করে বলেন যে, মুক্তি সংগ্রামে বিজয়ী বাংলাদেশের মানুষের জন্যে জাপান সরকার ও জনসাধারণের গভীর সহানুভূতি রয়েছে।(১৯)

এ দিকে যমুনা নদীর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করার জন্য একটি জাপানি বিশেষজ্ঞ দল জুন মাসে ঢাকা সফর করবেন বলে জানা যায়। ইতোপূর্বে একদল জাপানি বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ সফর করেন। তাঁরা যমুনার উপর সেতু নির্মাণের ব্যাপারে প্রাথমিক জরিপ করেন। জাপানি বিশেষজ্ঞ দলের জরিপ রিপোর্ট ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়।(২০)

১৯৭৩ সালের ১১ জুন জাতিসংঘ ত্রাণ-কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশকে জাপানের দেওয়া ২২০টি বাসের মধ্যে ১১০টি চট্টগ্রাম এসে পৌঁছায়।(২১)

এ সময় জাপান বাংলাদেশে ৯০ হাজার টন চাল রফতানি করবে বলে জানা যায়। ২৯ জুন টোকিও-তে উভয় দেশের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জাপান ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের কাছে ৫৭ হাজার টন চাল অত্যন্ত সহজ শর্তে বিক্রি করে।(২২)

১৯৭৩ সালের ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাত দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে টোকিও-র পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, তিনি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের শুভেচ্ছা নিয়ে জাপান যাচ্ছেন। বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এই সফরের ফলে দু'দেশের সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতাসহ সব ব্যাপারেই তিনি জাপান সরকারের সাথে আলাপ করবেন। জাপানি জনগণের শুভেচ্ছা নিয়েই তিনি স্বদেশে ফিরবেন। জাপান বেতার বঙ্গবন্ধুর জাপানে আগমন ও সেখানে তাঁর সাত-দিনব্যাপী সফরের কর্মসূচি প্রধান খবর হিসাবে পরিবেশন করে। বঙ্গবন্ধুর সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন– ড. কামাল হোসেন, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ড. নূরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ, প্রধান সচিব রুহুল কুদ্দুস, পররাষ্ট্র সচিব এনায়েত করিম এবং প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম।(২৩)

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ অক্টোবর টোকিও পৌছুলে বিমান বন্দরে তাঁকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশ বিমান থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জাপানি প্রধানমন্ত্রী মিঃ কাকুই তানাকা প্রথম সংবর্ধনা জানান। তিনি বিমান বন্দরে অপেক্ষমাণ সুধীবৃন্দের সাথে বঙ্গবন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর বঙ্গবন্ধু গার্ড অব অনার পরিদর্শন করেন। এ সময় দু'দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজতে থাকে।(২৪)

১৯ অক্টোবর উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে জাপানি প্রধানমন্ত্রী তানাকা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে বাংলাদেশকে ৯০০ কোটি জাপানি ইয়েন ঋণ দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। মিঃ তানাকা আরও ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে লোক বিনিময়ের ব্যাপারে জাতিসংঘ কার্যক্রমে জাপান সরকার ১০ লাখ ডলার দান করবে। জাপানি পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ অহিরা এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, জাপান বাংলাদেশকে যে ঋণ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সবচেয়ে সহজ শর্তে দেয়া হবে। তিনি বলেন যে, জাপান কর্তৃক কোনো দেশকে এ ধরনের সহজ শর্তে ঋণ দেবার ঘটনা এই প্রথম।

এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মিঃ তানাকার সরকারি বাসভবনে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকেই তিনি জাপানি প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। বৈঠকে উভয় নেতা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে বাংলাদেশের সাথে জাপানের সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নে জাপানি সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানান এবং জাপান বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত যে সাহায্য দিয়েছে সে জন্য তিনি মিঃ তানাকাকে ধন্যবাদ জানান। বঙ্গবন্ধু যমুনার উপর সেতু নির্মাণের ব্যাপারেও আলোচনা করেন।(২৫)

১৯ অক্টোবর তারিখেই জাপানের 'ফেডারেশন অব ইকনমিক অরগানাইজেশন', 'জাপান ফরেন ট্রেড কাউন্সিল' ও 'জাপান শিল্প বণিক সমিতি' বঙ্গবন্ধুর সম্মানে এক নৈশ ভোজের আয়োজন করে। ভোজ সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, সেচের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপক সম্প্রসারণ, যথেষ্ট পরিমাণ সার ও উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ এবং আমাদের জনগণকে উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে যদি আমরা সজাগ করতে পারি, তবে উর্বর ভূমি ও বিপুল জল সম্পদের সাহায্যে উক্ত লক্ষ্যে উপনীত না হতে পারার কোন কারণ নেই। তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জাপানের মূল্যবান সাহায্য কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে পেট্রোকেমিক্যাল ও সারের উৎপাদন, উপকূলীয় এলাকায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান আহরণ এবং যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সুসংহতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও জাপানের মূল্যবান সহযোগিতা ও সহায়তার আহ্বান জানান।(২৬)

এদিকে ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় 'জাপান-বাংলাদেশ সমিতি' বঙ্গবন্ধুর সম্মানে এক নৈশ ভোজের আয়োজন করে। ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মৌলিক সমস্যা সমাধানের আগ্রহ থাকে। তিনি আরো বলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গী একটি সুশৃঙ্খল আন্তর্জাতিক বিন্যাস ও বিশ্বশান্তির স্থায়ী কাঠামো তৈরিতে সাহায্য করবে।(২৭)

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জাপান সফরের তৃতীয় দিনে টোকিও নগরীর ২৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত পূর্ত গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। বঙ্গবন্ধু এদিন Chiba শিল্প প্রকল্পে সুমিটোমো কেমিক্যাল কোম্পানির একটি পেট্রোকেমিক্যাল কারখানাও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, কেমিক্যাল প্রকল্পের মতো শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও জাপান সহযোগিতা করতে পারে। পরদিন তিনি কিয়োটো ও ওসাকা যান এবং সেখানে দু'দিন অবস্থান করেন (২৮)

২৩ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে জাপানি প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ভোজসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিধি ক্রমবর্ধিত হারে সম্প্রসারিত হবে। তিনি জাপানি প্রধানমন্ত্রী মি: তানাকা অতীতে মানবিক সাহায্যের আকারে বাংলাদেশের খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব পূরণে এগিয়ে এসেছিলেন–তাও স্মরণ করেন।(২৯)

২৩ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে জাপান প্রেসক্লাবের দেওয়া এক ভোজসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমঝোতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে সাহায্য চাই। বঙ্গবন্ধু এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমরা দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়াকে শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হিসাবে চাই। আমরা ঘোষণা করেছি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে একটি মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হতে হবে। আমরা আমাদের এতদঞ্চলের দেশসমূহের উন্নয়নের জন্যই শান্তি চাই। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আমরা অবশ্যই অর্থ ব্যয় করবো না। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বরং বন্ধ করা দরকার।(৩০)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপ্তাহব্যাপী সরকারি সফর শেষে ঢাকা ও টোকিও থেকে একযোগে প্রকাশিত ইশতেহারে বলা হয় যে, বঙ্গবন্ধু ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ তানাকার মধ্যে খোলাখুলি ও ফলপ্রসূ আলাপ আলোচনার ফলে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয় দেশের সহযোগিতা সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। উভয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এশিয়ায় শান্তি বজায় রাখা এবং উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ব্যাপারে একমত হন।(৩১)

বঙ্গবন্ধুর সময়কাল অর্থাৎ ১৯৭২-১৯৭৫ কাল পরিসরে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এ কথা বলা যায় যে, জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও বন্ধুসুলভ। আন্তরিকতায় পূর্ণ এ সম্পর্ক উভয় দেশের সকল পর্যায়ের মানুষের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। এই সময়কালে উভয় দেশের মধ্যে অসংখ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। জাপানের সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের মানুষের দুর্যোগকালে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সহমর্মিতা জানিয়েছেন, দিয়েছেন সম্ভাব্য সকল প্রকারের সাহায্য। এই সময়কালেই যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের বিষয়টি জাপান সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বঙ্গোপসাগরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও আহরণ, কৃষিক্ষেত্রে পেট্রো কেমিক্যাল, বিদ্যুৎসহ অসংখ্য ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানে জাপানের জনগণ ও সরকার এগিয়ে এসেছেন। শিল্প-কারখানা, বিদ্যুৎ, ফাইভ স্টার হোটেল নির্মাণসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে জাপানের বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এই কাল পর্বে উভয় দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতর হয়। জাপান থেকে যখনই কোনো রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী,

বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশে এসেছেন–তখনই বাংলাদেশের মানুষ তাঁদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা আর আন্তরিক আতিথেয়তায় ভরিয়ে দিয়েছেন। আবার বাংলাদেশের সাংবাদিক, রাজনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা, সমাজকর্মী যখন জাপান সফরে গেছেন– জাপানের জনগণও একইভাবে আন্তরিক আতিথেয়তা আর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এই সময়কালে 'Japan Foundation', 'Institute of Developing Economics' বেশ কিছু সংগঠন উভয় দেশের বুদ্ধিজীবী, ছাত্র পর্যায়ে আদান প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পরবর্তীকালে 'শাপলা নীড়' যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের জন্য দিনরাত কাজ করেছে, সেবা দিয়েছে, আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। সুতরাং এ কথা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, এই কাল পর্বে জাপান বাংলাদেশ সম্পর্ক ছিলো পারস্পরিক সমঝোতা, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা আর আন্তরিকতায় পূর্ণ। আর এসব সম্ভব হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আন্তরিক গতিশীল নেতৃত্বের ফলেই।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, কতিপয় বিশ্বাসঘাতক বঙ্গবন্ধুকে বাঁচতে দিলো না, তাঁকে হত্যা করলো নির্মমভাবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। কিন্তু তারপর? আমরা কি ভালো আছি? আজকের বাংলাদেশ কি সে কথা বলে?

তথ্যসূত্র

১. Mainichi daily News. February 11, 1972
২. Mainichi daily News. February 11, 1972
৩. The Japan Times, February 11, 1972
৪. Morning News, Dhaka, February 11, 1972
৫. Morning News, Dhaka, February 11, 1972
৬. দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ৬, ১৯৭২
৭. সাক্ষাৎকার:
৮. দৈনিক বাংলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ মার্চ ১৯৭২
১০. দৈনিক বাংলা ১২ এপ্রিল ১৯৭২
১১. দৈনিক পূর্বদেশ, ২১ আগস্ট ১৯৭২
১২. দৈনিক বাংলা, ৩১ আগস্ট ১৯৭২
১৩. দৈনিক বাংলা, ৬ আগস্ট ১৯৭২
১৪. Nurul Momen, Bangladesh, The First four years,
16. December 1971. 15 December 1975, (Dhaka: Bangladesh Institute of Law & International Affairs 1980. P.46.
১৫. দৈনিক বাংলা, ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৩
১৬. দৈনিক বাংলা, ২৫ মার্চ ১৯৭৩
১৭. দৈনিক বাংলা, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩
১৮. দৈনিক বাংলা, ২৫ এপ্রিল ১৯৭৩
১৯. দৈনিক বাংলা, ১ মে ১৯৭৩
২০. দৈনিক বাংলা, ২৯ মে ১৯৭৩
২১. দৈনিক বাংলা, ১২ জুন ১৯৭৩
২২. দৈনিক বাংলা, ৩০ জুন ১৯৭৩
২৩. দৈনিক বাংলা, ১৮ অক্টোবর ১৯৭৩
২৪. দৈনিক বাংলা, ১৯ অক্টোবর ১৯৭৩
২৫. দৈনিক বাংলা, ২০ অক্টোবর ১৯৭৩
২৬. দৈনিক বাংলা, ২০ অক্টোবর ১৯৭৩
২৭. দৈনিক বাংলা, ২০ অক্টোবর ১৯৭৩
২৮. দৈনিক বাংলা, ২১ অক্টোবর ১৯৭৩
২৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৩
৩০. দৈনিক বাংলা, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৩
৩১. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ অক্টোবর ১৯৭৩

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের সিভিল সমাজ

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় অবদান কলোনির পূর্ব পাকিস্তানে সিভিল সমাজের বোধ তৈরি করা। এ বোধ থেকে তিনি, তার সহযোগীরা এবং সমগ্র জনসাধারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করেছেন। এ প্রতিরোধের একদিকে ছিল রাষ্ট্র সবকিছু নয় : এই মনোভাব, অন্যদিকে ছিল সিভিল সমাজের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা। পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি মুসলমানদের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি ছিল নৈতিক ব্যর্থতা। বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি পশ্চিম পাকিস্তানে সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে ছিল অগ্রসর। অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি সমাজ রাষ্ট্র গঠনের দিক থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছে নিজেদের করেছিলেন সমর্পণ। এই নৈতিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু বিকল্প তৈরি করেছেন সিভিল সামাজের শক্তি ব্যবহার করে, নৈতিক শক্তিকে শক্তিশালী করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন কৃষক-জনসাধারণ। এ কৃষকদের অংশ পাহাড়ি, অন্য অংশ সমতলভূমির, অপর অংশ আরণ্যক। তারা হাজং, সাঁওতাল, মুসলমান, হিন্দু কৃষক। তাদের হাজং বিদ্রোহ, নানকার বিদ্রোহ, জিরাজিয়া বিদ্রোহ, তেভাগা বিদ্রোহ নামে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছে। এসব বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে কৃষক-জনসাধারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে নিজেদের সম্পর্ক নতুন করে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। এই নির্ধারণের একটা দিক হচ্ছে জমির ওপর অধিকার, জীবিকার ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই নির্ধারণের অন্য একটা দিক হচ্ছে যে, ভাষার মধ্য দিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা। জমির অধিকারের সাথে ভাষার অধিকার, ভাষার অধিকারের সাথে শিক্ষার অধিকার যুক্ত হয় এবং বিভিন্ন আন্দোলন যুক্ত হয়ে জাতীয় গণআন্দোলনে পরিণত হয়। এই জাতীয় গণআন্দোলনের মধ্যে ধর্মান্ধতা ও রাজনীতি কাজ করেছে, সেক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে, বাংলাদেশ আন্দোলনের মধ্যে নৈতিকতা ও রাজনীতি কাজ করেছে।

এই নৈতিক রাজনীতির আদর্শ হচ্ছে : কলোনিয়াল পূর্ব পাকিস্তানের বিপরীতে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। সোনার বাংলা হচ্ছে এক ইউটোপিয়া, যার মধ্যে প্রকাশিত বাঙালি সমাজের সামষ্টিক ইচ্ছা। সোনার বাংলা হচ্ছে অর্থনীতির দিক

থেকে শোষণমুক্ত এক স্বদেশ, রাজনীতির দিক থেকে নির্যাতনমুক্ত এক আবাসভূমি, নৈতিকতার দিক থেকে শোষণমুক্ত এক আদর্শ মনুষ্য সমাজ। সোনার বাংলার প্রাকটিক্যাল ফর্ম হচ্ছে ছয় দফা উদ্ভূত দুই অর্থনীতি। দুই অর্থনীতি হচ্ছে কলোনিয়াল পাকিস্তানের শোষণ ও নির্যাতনের ক্রিটিক, সিভিল সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং সাগঠনিক মুক্তির উপায়। সিভিল সমাজের রাজনীতির নৈতিক দিক হচ্ছে সাধারণ মানুষ কর্তৃক শোষণ প্রতিহত করা এবং সমাজের মধ্যকার অসমতা ও বিভাজন দূর করা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, পাকিস্তানে সিভিল শাসন ধারাবাহিকতা লাভ করেনি। সামরিক শাসন দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করার দরুন ভোট ও নির্বাচনের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক ক্ষয় হয়ে যায়। গণতন্ত্রের বদলে 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র', সিভিল শাসনের বদলে সামরিক শাসন এবং পূর্ব পাকিস্তান এসবের সাথে কলোনিয়াল আরোপণ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে স্বৈরতান্ত্রিক করে ফেলে। এসব সমস্যার সমাধান জাতীয়তাবাদ : আন্দোলনের পর্যায়ে পর্যায়ে জাতীয়তাবাদ গণআন্দোলনে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদের বহু লক্ষ্যের অন্যতম হচ্ছে সিভিল সমাজ শক্তিশালী করে তোলা এবং সামরিক সমাজকে সিভিল সমাজের শক্তি দিয়ে কনফ্রন্ট করা। ভারতবর্ষে এ সমস্যা তৈরি হয়নি। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের সমস্যা ছিল সিভিল সমাজের মধ্যে গণতন্ত্র শক্তিশালী করার সমস্যা। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু তাঁর সহযোগী এবং সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর সমস্যা ছিল ত্রিবিধ। প্রথম হচ্ছে : সামরিক সমাজের বিরুদ্ধে সিভিল সমাজের বোধ প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় হচ্ছে : সিভিল সমাজের বোধের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বোধ প্রতিষ্ঠা করা এবং সম্প্রসারিত জাতীয়তাবাদের বোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর (বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীর ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর) অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায়কে শক্তিশালী করা। তৃতীয় হচ্ছে : জাতীয়তাবাদের আন্দোলন ও গণতন্ত্রের আন্দোলন সমান্তরাল করে তোলা।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক দল এবং সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর স্ট্র্যাটেজি ছিল জাতীয়তাবাদী বোধ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সীমাবদ্ধ অসহযোগিতা থেকে সর্বাত্মক অসহযোগিতার বোধ তৈরি করা। সীমাবদ্ধ অসহযোগিতার একদিক হচ্ছে ইস্যুভিত্তিক, অন্যদিক হচ্ছে ইস্যুভিত্তিক অসহযোগিতার মধ্য দিয়ে ধর্মজ ও সাম্প্রদায়িক বোধের বিপরীতে সেক্যুলার বোধ তৈরি করা। ইস্যুভিত্তিক, অসহযোগিতার উদাহরণ হচ্ছে : জমির ওপর অধিকার, জীবিকার ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ভাষার ওপর অধিকার, শিক্ষার ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ছয় দফা উদ্ভূত দুই অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, বুনিয়াদি গণতন্ত্র ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সেই অভ্যুত্থানে গ্রাম ও শহরের যুক্ত অবস্থান। এসব ইস্যুভিত্তিক সীমাবদ্ধ

অসহযোগিতার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইসলামিয়ানা মতাদর্শের ক্ষয় দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়, শক্তিশালী হয় এবং জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার মতাদর্শ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়, শক্তিশালী হয়। জাতীয়তাবাদের মধ্যে দুটি আন্দোলনে স্পষ্ট হয়। একটি দিক হচ্ছে : এই জাতীয়তাবাদে অন্তর্গত সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বাঙালি : মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান। অপরদিকে হচ্ছে : এই জাতীয়তাবাদের অন্তর্গত বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তা। প্রথম দিকটি শক্তিশালী হয়েছে কলোনিকালে এবং দ্বিতীয় দিকটি শক্তিশালী হয়েছে কলোনিত্তরকালে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে ইস্যুভিত্তিক অসহযোগিতা একদিকে জাতীয়তাবাদের মধ্যে সেক্যুলার বোধ তৈরি করেছে, অপরদিকে পর্যায়ে পর্যায়ে ইস্যুভিত্তিক অসহযোগিতা জাতীয়তাবাদের মধ্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বোধ তৈরি করে ১৯৭১ এর মার্চের সর্বাত্মক অসহযোগিতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক দল এবং সহযোগী রাজনৈতিক দল সীমাবদ্ধ অসহযোগ থেকে সর্বাত্মক অসহযোগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের মুক্তির সমস্যার জবাব খুঁজছেন। অসহযোগ হচ্ছে জাতি গঠনের সক্রিয় উপাদান, বিদেশী কলোনিয়াল রাষ্ট্রশক্তি প্রত্যাখ্যান এবং নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করার কৌশল ও সংগ্রামের স্ট্যাটেজির এবং টেকনিক্যাল নীতিমালা। অসহযোগের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রে মতাদর্শিক ভিত্তি তৈরি করে। একটি রাজনৈতিক জাতির মধ্যে সমগ্র জনসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ধারাবাহিক সীমাবদ্ধ অসহযোগিতার মধ্য দিয়ে একদিকে সম্প্রদায় বিভক্ত পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সেক্যুলার বোধ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বিদেশীদের রাষ্ট্র হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পূর্ববাংলা/বাংলাদেশের কেন্দ্র ভিত্তি মূল সেক্যুলার বিদেশীদের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। বিদেশীদের দেশ দখলের অর্থ পাকিস্তান আন্দোলনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং বাঙালি সমাজের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি হওয়ার নৈতিক ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়া। বিদেশীদের দখল থেকে দেশকে মুক্ত হওয়ার অর্থ ঔপনিবেশিকতা বিরোধ আন্দোলন শক্তিশালী করা এবং মুক্ত সমাজের দিকে অগ্রসর হওয়া। বিদেশীদের দখল থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ এক ধর্ম এক রাষ্ট্রের মতাদর্শ অস্বীকার করা এবং সিভিল সমাজকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকে অগ্রসর হওয়া। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক দল এবং সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলো এভাবেই বাংলাদেশ আন্দোলনের দিকে এবং বাংলাদেশকে উপনিবেশ থেকে স্বাধীন করার দিকে অগ্রসর হয়েছে; সামরিক শাসনের মতাদর্শ প্রত্যাখ্যান করে সিভিল শাসন প্রতিষ্ঠার দিকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্ট্র্যাটেজিকে ব্যবহার করছে।

বঙ্গবন্ধু প্রশাসন ও তৎকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

মাহবুব উদ্দিন আহমদ

সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে এক অসাধারণ মহামানব মুজিব বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু, টানা ছাপ্পান্ন বছর এ দেশের অগণিত মানুষের জীবনের টানাপড়েনের ক্যানভাস। বাঙালি জীবননামক চিত্রপটে তিনিই আক্ষরিক অর্থে সর্বগ্রাসী ছবি– আবার তিনিই সে ছবির প্রধানতম শিল্পীও বটে। এ আলোচনার মধ্যেই রয়েছে মানব মুজিবের মহামানব মুজিবে রূপান্তরের কাহিনী। আমি এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনায় যাবো না। আমি মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকে অনেক কাছে থেকে দেখেছি। মানুষ হিসেবে যেমন তাঁকে দেখেছি– প্রশাসক হিসেবে তাঁকে দেখেছি অত্যন্ত নিবিড়-ভুবনে। আমার দেখা পরিধি বহুধাবিস্তৃত ছিল– এ কথা কোনোক্রমেই বলা চলবে না। তবে অবশ্যই ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তিতে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সার্বিক বৃত্তের পরিসরে বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হওয়ার পর বহু অস্ত্র রয়ে যায় পাকিস্তানিদের সার্বক্ষণিক সহায়ক এবং জঘন্য হত্যাযজ্ঞের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদরদের হাতে। এহেন হাতিয়ারের সংখ্যা কম তো ছিলই না, এদের ফায়ার পাওয়ার ছিল সুসজ্জিত একটি সেনাবাহিনীর মতোই। ১৬ ডিসেম্বরের সূর্যস্নাত পবিত্র সকালে আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধারা সশস্ত্র অবস্থায় দেশে অবস্থান করছিলাম, তাদের সাথে রাজাকার আল-বদরদের অনেকেই রাতারাতি খোলস পাল্টে মুক্তিযোদ্ধা বনে যায়, আর এরা এদের হাতিয়ারগুলো লুকিয়ে রাখে ভবিষ্যতে সরকারকে আঘাত করার লক্ষ্যে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ তৎকালীন পাকিস্তান-সৌদি আরব-চীন অক্ষশক্তি আমাদের হাতে মার খেয়ে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে আমাদের এ মিত্রবাহিনীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেও তারা তাদের পরাজয় মেনে নেয়নি। এমনকি ভবিষ্যতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী সরকারকে ঘায়েল করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের নীলনকশা প্রণয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একই নীল নকশায় যোগ দেয় অতি বিপ্লবী বামপন্থী তথাকথিত সর্বহারা পার্টি

মুসলিম বাংলার প্রবক্তারা, হক, মতিন, তোয়াহা প্রমুখ গ্রুপ। অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুসলিম লীগের পাতিবুর্জোয়া বণিক শ্রেণীর হাত থেকে ফসকে নতূন আওয়ামী লীগ সরকার ও তাদের দলীয় ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাক, এটা ঐ পাতি বুর্জোয়ারা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য মনে করেনি। ফলে পাকিস্তানচ্যুত এ ব্যবসায়ীর দল আওয়ামী লীগ সরকারকে পর্যুদস্ত করার জন্য ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা সৃষ্টি করে। খাদ্য সংকট, বস্ত্র সংকট, শিক্ষা সংকট, বাসস্থান সংকট, তথা অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে এসব তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ডাকাত, চোর, লুটেরা, বদমাশ, কালোবাজারি, চোরাকারবারীদের মদদ দিতে শুরু করে। এর সাথে সর্বশেষে এসে যুক্ত হয় আওয়ামী লীগ/ ছাত্রলীগের একটি উচ্চাভিলাষী মহল। এদের মধ্যে একদল তরুণ নেতৃত্ব–যারা বিদেশে বসে বাংলাদেশের প্রবাসী নেতৃত্বকে নানাভাবে হয়রানি করে সুবিধা করতে পারেনি, তারা বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, তাঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ করার মতো ঔদ্ধত্য দেখায়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় মুকুট ধারণকারী এবং সবচেয়ে বেশি উচ্চশিক্ষিত ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্রদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দশ মাসের মাথায় আওয়ামী লীগকে পাশ কাটিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে জাসদ নামীয় এক ভ্রান্ত-বিভ্রান্ত রাজনৈতিক দল গঠন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধবাদীদের একটা প্লাটফরমে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এ দলের মোনাফেকির রাজনীতি, দেশকে রাতারাতি ধনসম্পদে ভাসিয়ে দেয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের আপামর জনসাধারণকে সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে উঠে পড়ে লেগে যায়।

বঙ্গবন্ধুর মতো অবিসংবাদিত নেতার বিরুদ্ধে তাঁরই এক সময়কার দলভুক্ত বিপথগামী সন্তানেরা যখন কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের হাতে লুকায়িত অস্ত্রসম্ভার দিয়ে রাতারাতি বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে, থানা লুট করে, অস্ত্র লুট, পাটের গুদামে আগুন, সার ফ্যাক্টরিতে স্যাবোটাজ করে ফ্যাক্টরি উড়িয়ে দেয়ার মতো ন্যক্কারজনক কাজ শুরু করে, তখন একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা তাদের টাকা-পয়সা, আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং সার্বিক সহযোগিতা দিতে দশগুণ উৎসাহে নেমে পড়ে। এতো কিছু ষড়যন্ত্র করেও কিন্তু স্বাধীনতার শত্রুরা বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা কমাতে পারেনি। শত বাধার পাহাড় অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু সঠিকভাবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে চলছিলেন।

১৯৭৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আমাকে ঢাকার পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োগ দান করতে সংস্থাপক বিভাগকে আদেশ দেন। ঐ দিনই আমি ঢাকায় পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করি। বলে রাখা ভালো যে, আমি ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করে পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তানের সদস্য

হিসেবে তৎকালীন পাকিস্তানি ব্যুরোক্রেসিতে যোগ দিই। (অনেকের মনে মিথ্যা ধারণা যে, বঙ্গবন্ধু আমাকে তাঁর স্নেহভাজন হিসেবে ঢাকার পুলিশ সুপারের মতো মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন)। ঢাকার পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদানের পূর্বে ১৯৭২ সালের জুন মাস থেকে আমি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সে সময়ে একদিন সন্ধ্যায় পশলা পশলা বৃষ্টির পর গোধূলি বেলার আলো-আঁধারিতে আমাকে সাথে করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় শহর পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন শহরের সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য। সেদিন সন্ধ্যা ৬টার সময়ে বর্তমান জিরো পয়েন্টটা ছিল জনমানবহীন। কোনো গাড়িঘোড়া নেই বললেই চলে। শহরের মধ্যে একটা থমথমে অবস্থা। এ অবস্থা দেখে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'দেশ কি এভাবেই চলবে মাহবুব?' এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি তৎকালীন সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথাই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর কয়েক মাস ঢাকা শহরে অস্ত্রের ঝনঝনানি এতো বেশি ছিল যে, জনজীবনে স্বস্তি বলতে কিছুই ছিল না। খুন, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং তখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমাজবিরোধী অস্ত্রধারী মাস্তানদের ভয়ে জনসাধারণ সন্ধ্যার পরে ঘর থেকে বের হয় না। বিকাল হতে না হতেই বাজার, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভ্রমহানির ভয়ে নারীরা একা ঘরের বাইরে যেতে সাহস পায় না। তখন হাইজ্যাকিং শব্দটি নতুন ব্যবহার হচ্ছে ঢাকার রাজপথে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে একটা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে হাজার হাজার মানুষের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আর কে বিপক্ষে তা বলার কোন উপায় নেই। এমনি পরিস্থিতিতে এটা অস্বাভাবিক ছিল না। এ অবস্থার বিপরীতে ১৯৭৪ সালের শীতকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিরাট কলেবরে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের জন্য শিল্পমেলা হয়। হাজার হাজার নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবণিতা প্রতিদিন উৎসাহে উপভোগ করেছে শিল্পমেলা। প্রতিদিন দুপুর থেকে মধ্যরাত অবধি নির্বিবাদে চলেছে এ শিল্প ও রপ্তানি মেলা। এ থেকে ১৯৭৪ সাল নাগাদ ঢাকা শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির কথা অনায়াসে অনুমান করা যায়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে দেশের হাল ধরেন। তারপর থেকে নিরন্তর তাঁকে এ দেশটাকে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অহর্নিশ প্রাণপাত করে অবিরাম পরিশ্রম করতে হয়েছে। এক কোটি গৃহহারা এবং বিধ্বস্ত বাড়িঘরওয়ালা মানুষের পুনর্বাসন থেকে শুরু করে শূন্য খাদ্যগুদামে খাদ্য জোগান দিতে হয়েছে। শত শত ভেঙে ফেলা পুল নির্মাণ করে দেশব্যাপী বিধ্বস্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে।

হাজার হাজার পরিত্যক্ত-শিল্প-কলকারখানাকে বেহাত হয়ে যাওয়া অবস্থা থেকে সংরক্ষিত করতে নতুন নতুন আইন তৈরি করতে হয়েছে। শূন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু করতে হয়েছে। বস্ত্রহীনের জন্য বস্ত্র জোগান দিতে হয়েছে। বন্ধ কল-কারখানা চালু করতে হয়েছে, লক্ষ লক্ষ বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান করে দিতে হয়েছে, গণশিক্ষার জন্য হাজার হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারিকরণ করতে হয়েছে, সর্বোপরি ১৯৭৪ সালের সর্বগ্রাসী বন্যা শেষে বৈরীভাবাপন্ন পরাশক্তির ষড়যন্ত্রে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করতে হয়েছে। বৈরী শক্তির চোখ রাঙানির পাশাপাশি তাদের অবিরাম ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও স্বাধীনতার শত্রুরা যখন বঙ্গবন্ধুর হিমালয় সমান জনপ্রিয়তায় কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি, তখনই তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে পাকিস্তানি কায়দায় এ দেশের ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা শুরু করে এবং বঙ্গবন্ধুর সরকারকে দেশ-বিদেশে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি ও তাদের এ দেশীয় এজেন্টরা সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে উঠে পড়ে লেগে যায়।

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এহেন অবস্থা অনুধাবন করেই বঙ্গবন্ধুর সরকার সঠিকভাবেই কঠোর হস্তে আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। তাঁর দলীয় কর্মী ও নেতাদের তিনি কঠোরভাবে অসামাজিক ও আইনশৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেন। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যসহ এমপিদের বেআইনি তদ্বির বন্ধ করার জন্য উপদেশ দেন এবং সরকারি কর্মচারী, কর্মকর্তাদের তাদের কর্তব্যে নিষ্ঠাবান হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

১৯৭২-৭৩ সালের গোড়ার দিকে এ দেশে পুলিশবাহিনীর সর্বসাকুল্যে সংখ্যা ছিল তেত্রিশ হাজারেরও কম। এদের হাতে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ছাড়া কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। বিপরীতে সমাজবিরোধীদের হাতে ছিল পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র। পুলিশবাহিনীর চলাচলের জন্য যানবাহন ছিল না বললেই চলে। বস্তুত বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম ভারত থেকে পাওয়া মাত্র ১০ খানা উইলি জিপ ঢাকা পুলিশকে প্রদান করেন। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনেও লাঠি হাতে লুঙ্গি-পরা পুলিশবাহিনী ট্রেনিংরত দেখা গেছে। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাশিয়া থেকে মাত্র কয়েক ডজন মস্কোভা জিপ বার্টার ট্রেড -এর মাধ্যমে সংগ্রহ কর হয়। ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে সর্বপ্রথম ঢাকায় ১০ খানা টয়োটা ফোর হুইল ডি:প সরবরাহ করা হয় ঢাকা পুলিশ চলাচলের জন্য। এ সময়ে পুলিশকে শক্তিশালী করার জন্য বঙ্গবন্ধু ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের আদলে গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ দেন। তাঁর তিরোধানের পর এ স্কিম কার্যকর করে ১৯৭৬ সালের গোঁড়ার দিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন

পুলিশের জন্ম হয়। এ বছর রমযান মাসের শেষ সপ্তাহে ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ২১ বছর পূর্তি উদযাপিত হলো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনকে তাদের আক্রমণের প্রথম ও প্রধানতম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। পুলিশবাহিনীও অমিত তেজে পাকিস্তানিদের প্রতিহত করেছিল।

রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণের ফলে সারা দেশের পুলিশবাহিনীতে জিঘাংসা ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো। সারা দেশের পুলিশবাহিনীর সদস্যরা স্ব স্ব স্থানে স্থানীয় জনগণ, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সাথে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। পুলিশবাহিনীকে সাথে পেয়ে জনগণের মনোবল, সাহস ও উদ্দীপনা বেড়ে যায় লাখো গুণে। যে জনগণ সারা জীবন পুলিশকে তাদের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে দেখেছে, সে জনগণই যখন পুলিশকে সাথে পেল সহযোদ্ধা হিসেবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে জনগণের আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যায় হাজার গুণ। এভাবেই ২৫ মার্চের কালরাতের পর পুলিশবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি সারা দেশে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস পুলিশবাহিনী শৃঙ্খলা, সর্বশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, সাহস আর বীরত্বের সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ফলে, নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে পুলিশের চারিত্র্যিক এবং বৈষয়িক অবকাঠামো ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ভেঙে যায়। যদিও মুজিবনগর সরকারের একজন পুলিশের আইজি ছিল– তাঁর পক্ষে সারা দেশে মুক্তিবাহিনীর সাথে মিলেমিশে যুদ্ধরত পুলিশবাহিনীর সদস্যদের কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে রাখা সম্ভব ছিল না। এছাড়া পুলিশবাহিনীর যেসব সদস্য মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি প্রশাসনকে মদদ দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের অনেকেই মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে অথবা কর্মস্থল ছেড়ে পালিয়েছে। আর যারা ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি সরকারের তাঁবেদারি করেছে, তারা ১৬ ডিসেম্বর হয় মুক্তিবাহিনীর হাতে মারা পড়েছে, না হয় স্ব-স্ব কর্মস্থল ছেড়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। সব মিলিয়ে ১৬ ডিসেম্বর পুলিশবাহিনীর ত্রিশঙ্কু অবস্থা। জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। অনেকেই যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেছেন কিংবা পঙ্গু হয়েছেন। মোটামুটি একটা অবিন্যস্ত অবস্থা পুলিশ বাহিনীর মাঝে বিরাজমান। সব মিলিয়ে পুলিশবাহিনী একটা বিধ্বস্ত অবস্থায় নিপতিত।

বিধ্বস্তপ্রায় পুলিশবাহিনীকে চাঙ্গা করার জন্য ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশবাহিনী সৃষ্টির জন্য বঙ্গবন্ধু সারদার পাশাপাশি আরও চারটি ট্রেনিং সেন্টার খোলার নির্দেশ দেন। এছাড়া দেশের সর্বত্র পুলিশ লাইনগুলোতে একই সাথে রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং শুরু হয়। এসব ট্রেনিং অবকাঠামো সৃষ্টিসহ প্রশিক্ষণ

ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য অতি জরুরি ভিত্তিতে টাঙ্গাইলের মহেড়া জমিদার বাড়িতে, খুলনার খালিশপুরে, রংপুরে এবং নোয়াখালীর মাইজদীতে নতুন ট্রেনিং স্কুল খোলার কাজ শুরু হয়। ঢাকার উত্তরা ও মিরপুরে এ উদ্দেশ্যে কয়েক শত একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। টাঙ্গাইলের মহেড়া জমিদার বাড়ি হুকুম-দখল করা হয় এবং পাশাপাশি খুলনা, রংপুর ও মাইজদীতে প্রচুর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু পুলিশের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম দাঙ্গা পুলিশের সৃষ্টি করেন। তাঁর নির্দেশিত পথেই পঁচাত্তরের অক্টোবর বর্তমান আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন তৈরি হয়। নদীতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি রোধকল্পে নৌ-পুলিশ সৃষ্টি করেন বঙ্গবন্ধু। চিরাচরিত সাব-ইন্সপেক্টরের পরিবর্তে ইন্সপেক্টরদের থানার ওসি নিয়োগের নির্দেশনামা জারি করেন বঙ্গবন্ধু এবং প্রতি সার্কেলে ইন্সপেক্টরের পরিবর্তে এএসপি/ডিএসপি নিয়োগ করার আদেশ দেন তিনি এবং দেশ বিভাগের পূর্বের ১৯ জেলাকে ভেঙে প্রতি মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করেন তিনি। ফলে প্রতিটি উন্নীত জেলায় একজন করে এসপি নিয়োগ লাভ করে। পাশাপাশি প্রতিটি উন্নীত জেলায় একজন করে জেলা প্রশাসক নিয়োগ করে তিনি সার্বিক প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলার ওপর জোর দেন। সর্বোপরি, পুলিশবাহিনীকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির সার্বিক সুফল লাভের উদ্দেশ্য ১৯৭৪ সালের ৪ জানুয়ারি রাজারবাগ পুলিশ লাইনে স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম পুলিশ সপ্তাহ উদ্বোধন করেন এবং একই বছর তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সারদাতে পুলিশ একাডেমীকে নতুনভাবে সংগঠিত এবং আধুনিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত অফিসারদের পাসিং-আউট প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালেই নির্ধারিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশে শাসনব্যবস্থা চালু করার অভিপ্রায়ে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গভর্নর নিয়োগ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রথম পদক্ষেপে জেলা গভর্নর নিয়োজিত করবেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সরাসরি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তাঁর জীবদ্দশায় এ প্রথা চালু হওয়ার কথা ছিল সারা দেশে একই দিনে। নির্ধারিত দিনটি ছিল ১৬ আগস্ট ১৯৭৫ সাল। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুরা তাঁর এ পদক্ষেপে ভীত হয়ে পড়ে। তারা বুঝেছিল যদি এ ব্যবস্থা চালু হয়ে এ দেশের মাটি ও মানুষের মনে মিশে যায়, তাহলে অসম্ভব জনপ্রিয় শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা এতো বৃদ্ধি পাবে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ভোটের মাধ্যমে তাঁকে কিছুতেই ক্ষমতা থেকে হটানো যাবে না এবং এমতাবস্থায়, পাকিস্তান-প্রেমিকরা এ দেশে কোনোদিনই ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে না। তাই ১৬ আগস্টের আগেই তারা বিদেশী শক্তির মদদপুষ্ট হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এবং ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট দেশের ক্ষমতা দখল করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, 'বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত পদক্ষেপগুলো সঠিক ছিল

না'–বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশদ্রোহীরা এ কথা বহুবার বহুভাবে প্রচার করে জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন পর্যন্ত তারা একের পর এক সরকার গঠন করেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পদক্ষেপের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে মৌলিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। প্রমাণস্বরূপ, তাঁর নির্দেশিত গভর্নর স্কিমের কথাই ধরা যাক। জিয়া, এরশাদ, খালেদা এঁরা সবাই এ স্কিমের বিরোধিতা করেছেন। একে 'স্বৈরচারী পদক্ষেপ' হিসেবে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন। কিন্তু কেউই এ স্কিমের বাইরে নতুন কোনো দিক-নির্দেশনা দিতে পারেননি। এরশাদের উপজেলা, জিয়ার যুব-কমপ্লেক্স এবং বিগত সরকারের আমলের উদ্যোগসমূহ উপজেলা ও গভর্নর স্কিমের নামান্তর মাত্র।

বঙ্গবন্ধুর-নির্দেশিত মেট্রোপলিটন পুলিশ স্কিম আজও বহাল তবিয়তে আছে–ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায়। পুলিশের ওসিকে কেউ আর পেছনে টানতে পারেনি। জেলা পর্যায়ে স্বাধীনতার পূর্বে এসপিদের এসিআর লিখতো ডিসি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ প্রথার পরিবর্তে এসপির এসিআর লেখার দায়িত্ব দেন ডিআইজিকে। ফলে, এসপি, ডিসির সাথে কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মারামারির একটা পর্যায় সমূলে উৎপাটিত হয় এবং পুলিশবাহিনীর মধ্যে প্রকৃতভাবেই শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এহেন বিভিন্ন বাস্তব পদক্ষেপের কারণে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে একেবারেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে গড়ে ওঠা পুলিশবাহিনী মাত্র তিন বছরের মাথায়, অত্যন্ত সীমিত সংখ্যায় হয়েও, চুয়াত্তরের গোঁড়ার দিক থেকে দেশের সর্বত্র আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়। পুলিশ যাতে সোৎসাহে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্য তিনি পুলিশের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন– এসপির র‍্যাঙ্ক ও স্ট্যাটাস আগের মেজরের অবস্থান থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের সমমানে উন্নীত করেন এবং একইভাবে ডিআইজির অবস্থান ও মর্যাদার উন্নতি সাধন করেন। আইজির অবস্থান লেফটেন্যান্ট জেনারেল সমতুল্য করে সরকারের সেক্রেটারির সমমর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানে উন্নীত করেন। রেশনের আওতা ও পরিমাণ বাড়িয়ে পুলিশবাহিনীর সদস্যদের কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দিতে সচেষ্ট হন। পুলিশসহ সার্বিক প্রশাসনিক অব্যবস্থাকে একই শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার কয়েক হাজার এলোমেলো বেতন স্কেলকে মাত্র ১০টি স্কেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ব্রিটিশ আমলের আমলাতান্ত্রিকতার হাত থেকে সরকারের বেতন কাঠামোকে বের করে আনেন এবং এ পর্যায়ে তাঁর প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটির কার্যক্রম শুরু করিয়ে সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই এ কমিটির দেয়া সুপরিশমালা কার্যকর করার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন।

বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করে এ দেশে ঘি আর মাখনের নহর বইয়ের দিতে চেয়েছিল, তারাই ১৯৭৬ সালের মাথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাঁচ লাখ উপজাতিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বিদ্রোহ দমনের নামে পুলিশের স্থলে

সরাসরি সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছিল। অথচ মুক্তিযুদ্ধ শেষে সারা দেশব্যাপী অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্রধারীদের দমন করে জনপদে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্যকল্পে বঙ্গবন্ধু সরকার যে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করেছিলেন, স্বাধীনতার বিপক্ষের শত্রুরা তাঁর সরকারের এ প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনী সৃষ্টিকে অত্যন্ত জঘন্য ও কঠোর ভাষায় কতই না সমালোচনা করেছে। কিন্তু আজকে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, যারা রক্ষীবাহিনীর বিরোধিতা করতে আনন্দ পায়, তারা রক্ষীবাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রধারী সেনাবাহিনী দিয়ে এবং মার্শাল ল-এর মতো বুনো আইন দিয়ে দীর্ঘ ১৯ বছর এ দেশ শাসন করেছে। এহেন শাসন তাদের কাছে একদিনও স্বেচ্ছাচারী মনে হয় না।

প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৭২-৭৩ সালের গোড়ার দিকে বামপন্থী, চীনপন্থী, সর্বহারাপন্থী, জাসদপন্থী, পাকিস্তানপন্থী, মুসলিম লীগপন্থী সশস্ত্র বেআইনি অস্ত্রধারীদের অপতৎপরতা রোধ করার জন্য রক্ষীবাহিনী নামক আধা-সামরিক বাহিনী সৃষ্টি করা ছিল একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং রক্ষীবাহিনীর আইনি তৎপরতার কারণেই এসব সমাজবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীসহ বেসামরিক প্রশাসনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সেদিন দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সফলতা লাভ করেছিল বলেই পরবর্তীকালের সরকারগুলো তার সুফল ভোগ করেছে।

একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, প্রশাসন ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু দেশ গড়ার শুভ সূচনা করেছিলেন। এ দেশের মানুষের মুখে দু'বেলা অন্ন জোগান দিয়ে তাদের সুখের নিদ্রায় রাত যাপন করতে দেয়া– এ চিন্তা তাঁর জনগণের মঙ্গল, তাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং আইনশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত অঙ্গীকার এবং আইনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ থেকেই উৎসারিত। আইনের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসবোধসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই সমাজের মঙ্গলের জন্য আইন যাতে সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে প্রয়োগ হয়, তজ্জন্য যথাযথ এবং প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আপন প্রজ্ঞা, জ্ঞান, সীমাহীন রাজনৈতিক উপলব্ধি এবং দেশজ মাটি-মানুষের সাথে সম্পৃক্ত রসগন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দিয়ে, এ দেশের মাটি ও মানুষের মঙ্গলের জন্য সে সংকটকালীন সময়েও যা সঠিক মনে করেছেন, তাই সরকারি প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নির্দেশ, আইন প্রণয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা তার সুফল পেয়েছি এবং দীর্ঘ বাইশ বছর বঙ্গবন্ধু নেই–এ সময়ে অনেক সরকার এসেছে– আর গেছে–কিন্তু তাঁর নির্ধারিত, সুচিন্তিত প্রশাসনিক পদক্ষেপের বাইরে মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টিকারী কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ আজও কেউ নিতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু যে কত বড় মাপের প্রশাসক ছিলেন, এ থেকেই তাঁর পরিচয় মেলে।

শেষ করার আগে দু-একটা ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিতে চাই। বঙ্গবন্ধুকে অনেক কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আমার প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম স্নেহ কিন্তু সরকারি দায়িত্ব দিয়ে তিনি আমার কর্তব্যনিষ্ঠাকে অপত্যস্নেহের ভারে দূরে ঠেলে দিতে কোনো সুযোগ দেননি। আমার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। সে বিশ্বাস ও কর্তব্যনিষ্ঠার বলে আমি অনেক দুরূহ কাজ অত্যন্ত সহজেই সম্পাদন করতে পেরেছি।

অনেকের ধারণা যে, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, এমপিরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সদাসর্বদা পুলিশকে নানারকম তদবির তদারকিতে ব্যস্ত রেখেছেন। ফলে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ইপ্সিত উন্নতি ঘটেনি। এ ধারণা আদৌ সত্যি নয়। আমি ২৯ মাস ঢাকার পুলিশ সুপার হিসেবে কাজ করেছি। এর মধ্যে প্রথম দিকে দু-একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমার কাছে দু-একবার তদবির করেছেন।

তবে, এ কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, আমার ঊনত্রিশ মাসের এসপি থাকাকালীন সময়ে কোনো আওয়ামী লীগের নেতা বা কর্মী আমার কাছে বেআইনি কোনো তদবির করেননি। বিশেষত, বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে এমন কোনো আদেশ আমার কাছে আসেনি, যে আদেশ পালন করতে আমাকে আইন লঙ্ঘন করতে হয়েছে। দেশের আইন-কানুনের প্রতি কত গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকলে, একজন মহান নেতা, যার অঙ্গুলি হেলনে সব কিছুই হতো– তাঁর পক্ষে সকল পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে থাকা সম্ভব ছিল– তা সহজেই অনুমেয়।

প্রশাসক মুজিব

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশাসন সম্পর্কে জানার আগ্রহ দীর্ঘ একুশ বছর পর নতুন করে দেখা দিয়েছে। তবে, একটি চিহ্নিত মহল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কৌশল হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনে নানা ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। আবার বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে অতি মানবের আসনে বসিয়ে দেয়ার যে প্রয়াস পাচ্ছে, তাও সবক্ষেত্রে যুক্তি ও তথ্যনির্ভর নয়। ফলে সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে শেখ মুজিব কতটুকু অর্জন করতে পেরেছিলেন তার সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধান অব্যাহতভাবে করে যেতে হবে। আমার পক্ষে কাজটি সহজ নয় এ কারণে যে, জাতির জনকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের যে দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়, তার ফলশ্রুতিতে আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে যুক্তিনির্ভর হওয়া আমার পক্ষে সকল সময়ে সম্ভব নাও হতে পারে। তবে আমার একটা বাড়তি সুবিধা এই যে, আমি একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি, কোনো দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত নই এবং ছিলামও না। তাছাড়া তথ্যনির্ভরতায় আমি গভীরভাবে বিশ্বাসী। সে কারণে এবং সঠিক চিত্র অনুসন্ধানে স্মৃতিনির্ভর না হয়ে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু প্রশাসন কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কেন করে, বর্তমান নিবন্ধনটিতে তা বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করা হবে। মূল্যায়নের ভারটি থাকবে পাঠকবর্গের বিচার-বিশ্লেষণের উপর।

স্বাধীনতার পটভূমি

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশটির অভ্যুদয় একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর তারিখে হঠাৎ করে ঘটে যায়নি। নিরলস সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়, বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে এবং অপমান, বঞ্চনা, অত্যাচার ও গণহত্যার প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতির প্রিয় স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিব নেতৃত্ব দেন। উনিশশ' চল্লিশ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের 'স্টেটস' বা স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ এবং বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিসনদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার মধ্যে একটি অভিন্ন সুর খুঁজে পাওয়া

যায়। ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কি, বাঙালি কৃষি ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা অর্জনে আটচল্লিশ সাল থেকে শেখ মুজিব ছিলেন সব আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যমণি। চুয়ান্নর প্রাদেশিক নির্বাচনের প্রতিক্রিয়াশীল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে অভিন্ন বাঙালি সত্তার ভিত্তি রচনায় যুক্তনির্বাচনের অঙ্গীকারে তিনি ছিরেন আপোষহীন। শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রণয়নে বাঙালির স্বার্থ বিপন্নতার বিরুদ্ধে ও ছাপ্পান্নর শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেয়ার পক্ষে তিনি ছিলেন সোচ্চার। সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে পাকিস্তানি নব্য ঔপনিবেশিক শক্তি প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানে। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনকালে যখন বাঙালি ছাত্রসমাজ তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য ধ্যান-ধারণাবিরোধী একটি ঔপনিবেশিক পশ্চাৎমুখী শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্বার ও রক্তক্ষয়ী আন্দোলন গড়ে তোলে, তখনও শেখ মুজিবকেই তাদের পাশে দেখা যায়। ছেষট্টির ছয় দফার প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবের উপর আরও ভয়ঙ্কর জুলুম নেমে আসে এবং তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার জন্য পাকিস্তানি খুনিচক্রটি ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা শুরু করে। বাঙালির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, গর্জে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। টলটলায়মান হয়ে গেল স্বৈরশাসকদের মসনদ। ছয় দফা ও এগারো দফার দুর্বার যৌথশক্তি এবং সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের চমৎকার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফসল উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। শেখ মুজিবকে নিয়ে এলো স্বাধীনতার আন্দোলনের শিরোমণি অবস্থানে। ডাকসুর সহ-সভাপতি তেজস্বী ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ সমগ্র বাঙালি জাতির মনের কথা প্রাণের দাবির প্রতিধ্বনি করলেন তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।

কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে স্বাধিকারের কথা বললেও মূলত স্বাধীনতার চূড়ান্ত লড়াই শুরু করার জন্য বঙ্গবন্ধু বাংলার স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে থাকে। সত্তরের নির্বাচন সুযোগ করে দিল, কারণ এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হলো। নভেম্বরে সত্তরের প্রলয়ঙ্করী ও সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে যখন কয়েক লাখ বাঙালি মৃত্যুবরণ করে, তখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিদেশ ভ্রমণে। আর্তপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়নি শাসককুল। এতোদিনে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে। তারা বুঝতে পারে যে, বাংলাদেশকে শোষণ করাটা পাকিস্তানিদের একমাত্র কাজ। ইসলামের ফাঁকা বুলি অসাড় প্রতিপন্ন হয়, কারণ পাকিস্তানিরা মোটেও ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস করেনি এবং বাঙালিদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করেনি। সত্তরের নির্বাচনের একটি সুবিধা এই ছিল যে, সরাসরি সেনাপতি শাসকের সমর্থনপুষ্ট কোনো দল এতে অবতীর্ণ হয়নি। অবাধ ও নিরপেক্ষ

নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের গণপরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৬৭টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সামরিক শাসককুলের হিসাব ভণ্ডুল হয়ে গেল। ইয়াহিয়া-ভূট্টোচক্র জনসাধারণের রায়কে নস্যাৎ করে দিয়ে ক্ষমতা পাকিস্তানিদের হাতে অবৈধভাবে কুক্ষিগত রাখার চক্রান্ত করে। ৩ মার্চে ঢাকায় প্রস্তাবিত গণপরিষদ অধিবেশন স্থগিত করা হয়। গর্জে ওঠে বাংলার দামাল ছেলেমেয়েরা। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে অসহযোগ আন্দোলনে পাকিস্তানের চাকা অচল করে দেয়া হলো। একাত্তরের ৩ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে পল্টনের জনসভায় ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। ৫ মার্চ তারিখে বাংলার ঘরে ঘরে উঠানো হলো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। ৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কুখ্যাত টিক্কা খানকে গভর্নরের শপথ পড়াতে অস্বীকার করলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী। তারপর এলো সেই বহু প্রত্যাশিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'– এ মর্মে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা। নতুন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সংলাপের নামে সময় ক্ষেপণের মাধ্যমে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৫ মার্চ ভয়াল রাতের অন্ধকারে নিরীহ বাঙালিদের উপর লেলিয়ে দেয়া হলো পাকিস্তানি হায়েনাদের। বঙ্গবন্ধুর ডাকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঙালিরা। শুরু হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র ও চূড়ান্ত অধ্যায়। ত্রিশ লাখ শহীদানের চরম আত্মত্যাগ ও দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের মূল্যে অর্জিত হলো রক্তাক্ত স্বাধীনতা। ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে পাকিস্তানের কারাগার থেকে বিজয়ীর বেশে বঙ্গবন্ধু ফিরলেন স্বাধীন বাংলাদেশে। স্বার্থক হলো 'পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা/জয়বাংলা' শ্লোগান। বঙ্গবন্ধু জাতির জনকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন।

সরকার গঠন ও নীতিমালা নির্ধারণ

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ওয়েস্টমিনস্টার ধরনের পদ্ধতিতে আস্থাশীল জাতির জনক ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেন একটি ব্রিটিশ প্লেনে করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয় তাঁরই নির্দেশে ও নেতৃত্বে যদিও তিনি পাকিস্তানি কারাগারে নয় মাস ধরে মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলেন। বঙ্গবন্ধু তখন পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। এই পদে কার্যভার গ্রহণ করে যে সিদ্ধান্তটি তিনি প্রথমেই নিলেন তা হলো, রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিয়ে সংসদ ও জনগণের কাছে অধিকতর জবাবদিহিতামূলক প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ।

সে অনুসারে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অকুতোভয় সৈনিক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে দেশের রাষ্ট্রপতি করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৎ,

যোগ্য, প্রবীণ, বিশ্বস্ত ও জনগণের সেবায় দীর্ঘদিন ধরে নিয়োজিত ২৩ সদস্যবিশিষ্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির জনকের হাতে থাকে ক্যাবিনেট ও প্রতিরক্ষা বিষয়। মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যবৃন্দ ছিলেন– সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম (শিল্প), তাজউদ্দিন আহমদ (অর্থ ও পরিকল্পনা), খোন্দকার মোশতাক আহমদ (বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদ), মনসুর আলী (যোগাযোগ), আবদুস সামাদ আজাদ (পররাষ্ট্র), এ এইচ এম কামরুজ্জামান (ত্রাণ ও পুনর্বাসন), শেখ আবদুল আজিজ (কৃষি), অধ্যাপক ইউসুফ আলী (শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া), জহুর আহমদ চৌধুরী (শ্রম ও সমাজকল্যাণ), ফণীভূষণ মজুমদার (খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ), ডা. কামাল হোসেন (আইন ও পরিষদ), এম আর সিদ্দিকী (বাণিজ্য), শামসুল হক (স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়), মতিউর রহমান (পূর্ত ও পৌর উন্নয়ন), আবদুল মালেক উকিল (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা), মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ (ডাক ও তার), সোহরাব হোসেন (বন, মৎস্য ও গবাদিপশু), মিজানুর রহমান চৌধুরী (তথ্য ও বেতার), আবদুল মান্নান (স্বরাষ্ট্র), আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (ভূমি শাসন, ভূমি সংস্কার ও ভূমি রাজস্ব), জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানী (জাহাজ, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ও বিমান চলাচল) এবং ডা. মফিজ চৌধুরী (বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও কারিগরি গবেষণা)।

বঙ্গবন্ধুর প্রশাসন যে কয়টি বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সংবিধান প্রণয়ন; বৈরী শক্তির অপপ্রচারের মুখে সদ্যস্বাধীন দেশের প্রতি বিশ্বের দেশসমূহের স্বীকৃতি আদায়; সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসন, পুনর্গঠন, সংস্কার ও দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তন; স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন; আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা; নৈরাজ্য ও নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্যাডার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পুনর্জাগরণ, ভূমি সংস্কারসহ একটি আধুনিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে এই নিবন্ধে আলোচনা করার আগে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে, সদ্যস্বাধীন দেশে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ঘরে ঘরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শান্তির আলোক পৌঁছে দেয়া। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আস্থা রেখে একের পর এক দেশ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে থাকে। দেশের মাটিতে পা ফেলার আগেই তিনি নিশ্চিত করেন যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে সহায়তাদানকারী ভারতীয় সেনাবাহিনী অবিলম্বে দেশে ফিরে যাবে এবং সে অনুসারে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকীর আগেই ভারতীয় বাহিনীর ফেরত-পর্ব সম্পন্ন করা হয়। পাকিস্তানের কাছে ভিন্নতর ঋণের কারণে এবং এ দেশীয় মিত্রদের ভুল ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও পরামর্শের ফলশ্রুতিতে গণচীন ২৬/৮/৭২ তারিখে জাতিসংঘে বাংলাদেশের

সদস্যপদ লাভে ভেটো প্রদান করলে এক্ষেত্রে দুই বছরের বিলম্ব ঘটে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ নেতৃত্বের ফলশ্রুতিতে ১৮/৪/৭২ তারিখে কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনকে সম্মুখে রেখে বঙ্গবন্ধু বেঁকে বসলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পাকিস্তানের শর্তহীন স্বীকৃতি ছাড়া বাংলাদেশ ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবে না। সমগ্র ইসলামী বিশ্বের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে ভূট্টো সরকার মেনে নিল স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতা। খুলে গেল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের পথ। জাতির জনক ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বশান্তি, ক্ষুধা, ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম এবং একটি শোষণমুক্ত সম্প্রীতিময় নিরাপদ বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে ভাষণ দিলেন। ২৪ মে ১৯৭২ তারিখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন বঙ্গবন্ধু। ২৬/৯/৭২ তারিখে ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানদের হজ্ব করার সুযোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু সৌদি বাদশাহ ফয়সালের নিকট জরুরি তার বার্তা পাঠান।

বাংলাদেশের সংবিধান : বাঙালির রক্ষাকবচ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গণপরিষদ গঠিত হয় তদানীন্তন পাকিস্তান গণপরিষদে নির্বাচিত বাঙালি সদস্যবৃন্দ এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সকল সদস্যকে নিয়ে। এর মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু গণপরিষদ সদস্য তাদের বিদেশী প্রভুদের খুশি করার জন্যই হোক অথবা নিজস্ব কোনো বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই হোক, দেশ ছেড়ে চলে যান। দুর্নীতির প্রতি আপোষহীন সংগ্রামী বঙ্গবন্ধু ৭/৪/৭২ তারিখে দুর্নীতি, স্বার্থপরতা ও দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কারণে ১৬ জন আওয়ামী লীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। উৎসাহী ও উদগ্রীব পাঠক সেই বহিষ্কৃত সদস্যবৃন্দের তালিকা পড়ে দেখতে পারেন (পরবর্তীকালে অবশ্য তিনজনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়)।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১০/৪/৭২ তারিখে। একই দিনে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম স্পিকার নির্বাচিত হন রংপুরের জনাব শাহ আব্দুল হামিদ আর ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হন নোয়াখালীর জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ। স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ কয়েক মাসের মধ্যে ইন্তেকাল করেন এবং জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ স্পিকার এবং নওগাঁর জনাব মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও পাঁচ সদস্যের একটি চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচিত হয়।

বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, একটি সুন্দর সংবিধান আশু প্রয়োজন, যার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তিনি এও বুঝেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ বা মন্ত্রিসভায় প্রবীণতার মাপকাঠিতে সংবিধান রচয়িতাদের তালিকা নির্ধারণ করা ভুল হবে। এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ড. কামাল হোসেনকে তাই তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচিত করেন, যা গণপরিষদে অনুমোদিত হয়। কমিটির অন্য যারা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন, তারা হলেন : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, আবদুর রহিম, আব্দুর রউফ, লুৎফর রহমান, আব্দুল মোমিন তালুকদার, আবু সাঈদ, বায়তুল্লাহ, আমিরুল ইসলাম, বাদল রশীদ, খোন্দকার আব্দুল হামিদ, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, শওকত আলী খান, হুমায়ুন খালিদ, আসাদুজ্জামান খান, মোশাররফ হোসেন আখন্দ, আব্দুল মমিন, শামসুদ্দিন মোল্লা, আবদুর রহমান, এম রহমান, ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ, আব্দুল মোস্তাকিম চৌধুরী, খোরশেদ আলম, সিরাজুল হক, দেওয়ান আবুল আব্বাস, হাফেজ হাবিবুর রহমান, আব্দুর রশীদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ খালেদ, রাজিয়া বানু ও ক্ষিতিশচন্দ্র মণ্ডল।

উক্ত সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমে গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, জনমত যাচাই, অন্য কয়েকটি দেশের সংবিধানের মূলনীতি পরীক্ষা এবং নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক দিক-নির্দেশনায় যে সংবিধানটি রচনা করে, গণপরিষদ ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে তা অনুমোদন করে। প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকীতে কার্যকর এই সংবিধান একটি গণতান্ত্রিক, আধুনিক, সুষম, প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ দলিল হিসেবে সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়। এই সংবিধানে মানুষের চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, জানমালের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলায় এর একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে একটি অনুমোদিত পাঠ রয়েছে। এখানে স্মর্তব্য যে, বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট অভিপ্রায় অনুসারে সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "তবে শর্ত যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।" বাংলাদেশের সংবিধানে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক গৃহীত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি–গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র সংজ্ঞায়িত ও যথাযোগ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। মুজিব প্রশাসনের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ মূলনীতি চতুষ্টয়ের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য প্রকাশ করেন। তবে সমাজতন্ত্রের রূপ ও পরিধি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হতো এরূপ : 'সমাজতন্ত্রে

উত্তরণের পথ গণতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত' (অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, টঙ্গী কলেজ ১৬/৮/৭২) এবং 'মৌলিক অধিকার খর্বকারী সমাজতন্ত্র চাই না।' (শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৮/৮/৭২)। সংবিধানে স্বীকৃত হয় জনগণের প্রাধান্য; বলা হয়, জনসাধারণই সকল ক্ষমতার উৎস।

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের কল্যাণ চিন্তা

একটি ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সরকার আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে পুনঃসংযোগ করতে থাকেন। বিশেষ করে পলায়নপর বর্বর পাকিস্তান বাহিনীর নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক নীতির কর্মকাণ্ডে ব্রিজ, রেলসেতু, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বন্দর ও অন্যান্য অর্থনৈতিক টার্গেটকে যেভাবে পঙ্গু করে যায় তা দ্রুতগতিতে মেরামত, পুনর্নির্মাণ ও ফের চালু করে স্বল্পতম সময়ে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। শূন্য রাজকোষের এবং ঋণাত্মক বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের প্রেক্ষিতে বন্ধুদেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে জরুরিভিত্তিতে সাহায্য নেয়া হয়। সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, যেন বৈদেশিক সাহায্য নব্যস্বাধীন দেশের মূলনীতিতে আপোষমূলক শর্তাধীনের বিনিময়ে না আনতে হয়। বৈদেশিক সম্পদ আহরণে যেন মঞ্জুরি এবং সহজ শর্ত ঋণের আধিক্য থাকে। স্বল্পমেয়াদি উচ্চ সুদের ঋণ যেন কম থাকে, সেদিকে মুজিব সরকারের প্রাথমিক নীতি অনুসরণের ফলে আজও বাংলাদেশের ঋণসেবা অনুপাত (Debt Service Ratio-DSR) দৃষ্টান্তমূলকভাবে কম। বিশ্বসভায় ঋণ ফেরতের সুবোধ ব্যবহারের যে খ্যাতি বাংলাদেশ আজও ধরে রেখেছে, তারও গোড়াপত্তন হয় সেই প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল, পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক আচরণের ফলে জনমানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি। তাই সদ্যস্বাধীন দেশে মুজিব প্রশাসনের কাছে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং এর সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা বড় হয়ে দেখা দেয়। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে। মুজিব সরকারের সুযোগ্য অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭২ - ৭৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ পল্লী এলাকায় ব্যয় করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত অনুরোধে কোনো নতুন কর আরোপ ছাড়াই প্রথম জাতীয় বাজেট ঘোষণা করা হয় ১ জুলাই ১৯৭২ তারিখে।

প্রশাসক মুজিব উপলব্ধি করেন যে, দেশে বিরাজমান হতাশা, অভাব-অনটন ও বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দেশের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদগণের সক্রিয় সহায়তা নেয়ার আশু প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন

শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত বলে মেনে নিয়ে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নূরুল ইসলামকে মন্ত্রীর পদমর্যাদাসহ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। কৃষি অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ প্রফেসর মোশাররফ হোসেন, একটি স্বাবলম্বী অর্থনীতির জোরদার প্রবক্তা রেহমান সোবহান এবং প্রফেসর আনিসুর রহমানকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা হয়। এখানে স্মর্তব্য যে, উপরিউক্ত নির্ধারণের প্রথম পর্যায়েই মুজিব প্রশাসনকে যে গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলো এই যে, বহুসংখ্যক শিল্প-কারখানার পাকিস্তানি মালিক তাদের ইউনিটগুলো পরিত্যাগ করে চলে যায়। বাধ্য হয়ে সরকারকে এসব শিল্প ইউনিটগুলো অধিগ্রহণ ও চালু করতে হয়। তাছাড়া ব্যাংক বীমাসেবা অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার বিবেচিত হওয়ায় সেগুলো রাষ্ট্রখাতের অধীনে আনা হয়। সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়। উপরে বর্ণিত নীতিমালার অধিকাংশই সরকারকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সুবিধা ও জনপ্রিয়তার বিবেচনা প্রাধান্য পায়।

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং তিনজন সদস্য ছাড়া দেশের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ও উচ্চশিক্ষিত আমলার কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮ প্রণয়ন সম্ভব হয়। জাতির জনক পরিকল্পনাটির মুখবন্ধে একে 'A plan for reconstruction and development of the economy taking into account the inescapable political, social and economic realities of Bangladesh' বলে অভিহিত করেন। দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী তথা পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান যেন বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ সুন্দর দলিলটির বাস্তবায়নে বাধা-বিপত্তি আসবে, তাই সতর্ক উচ্চারণ করলেন, 'No plan however well formulated, can be implemented unless there is a total commitment on the part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices.'

বিস্তারিত উল্লেখ বা আলোচনায় না গিয়ে অতি সংক্ষেপে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যগুলো (objectives) উল্লেখ করা হলো। কর্মহীন বেকার ও অর্ধবেকারদের কর্মসংস্থান তথা আয়-রোজগার নিশ্চিত করা; জাতীয় আয়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিবারণ; জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ অব্যাহত রাখা; বার্ষিক ন্যূনতম সাড়ে পাঁচ ভাগ হারে গ্রোস ডোমিস্টক প্রোডাক্ট বৃদ্ধি; জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলাতে সক্ষম এমনি হারে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বর্ধন; সাধারণভাবে

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল রাখা; ফি বছর ন্যূনতম ২.৫ ভাগ হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা; সমাজতান্ত্রিক বিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখা; বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কমানো; কৃষিক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি; শহরগামী স্রোত বন্ধ করা ও খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন; দ্রুত উন্নয়নের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ও পরিকল্পিত জনসংখ্যা নীতির প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন ও সামাজিক অঙ্গীকার আনা; অবহেলিত মানবসম্পদ ও মানবকল্যাণে উন্নয়ন ব্যয়ের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং শ্রমের যথোপযুক্ত ও দক্ষ বিনিয়োগ তথা শ্রমের চলমানতা নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুষম বণ্টন করা।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শোষণের দুই শতাব্দীরও অধিক সময় পরে নতুন স্বাধীন দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ সহজ হবে সে আশা কেউই করেননি। ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রফেসর নূরুল ইসলাম তার মুখবন্ধে যথার্থই বলেছিলেন, 'Development is a slow and painful process. It means present sacrifice for future gains. It is specially painful a country at a very low level of living such as Bangladesh where an increasing and significant reliance us to be placed, which is so essential for development, socially tolerable only if it is equitably shared by all. The room for flexibility is so small, the ability of the socio-economic system to withstand the effects of mistakes as well as in experimenting with new institutions, great caution and extreme care need to be exercised.'

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা সমসাময়িক উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি উৎকৃষ্ট উল্লেখযোগ্য দলিল, যা বাঙালির মুক্তিসনদ হতে পারতো। কিন্তু এর পেছনে রাজনৈতিক এমনকি প্রশাসনিক সমর্থন আদায়ের ব্যর্থতার ফলে এ সুন্দর দলিলটি কেবল তত্ত্বগত উৎকৃষ্টতার সাক্ষীই হয়ে রইলো। বঙ্গবন্ধুর আজীবনের বিশ্বাস ছিল, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে। যদি দুঃখী মানুষ পেট ভরে খেতে না পারে, কাপড় পরতে না পারে, বেকার সমস্যা দূর না হয়, তাহলে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসতে পারে না।' তাই সুদৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নে যে অসম্পূর্ণতা থেকে গেল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থার নিরিখে তা পুষিয়ে দেশকে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় নিয়ে এসে এর সুফল আপামর জনসাধারণের মাঝে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব বর্তমান সরকার ও জনগণের ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

জাতীয় বেতন কমিশন

স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন জাতির জনক। তাই গঠন করেছিলেন একটি প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি। কিন্তু সরকারি ও আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের উপর প্রথম অসহনীয় চাপের তীব্রতার কথা বিবেচনা করে ১৪/৭/৭২ তারিখে ১০ সদস্যবিশিষ্ট প্রথম জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করা হলো। দক্ষ প্রশাসক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাবেক পাকিস্তানের বাণিজ্য সচিব এম এ রবের নেতৃত্বে গঠিত এ কমিশনের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে সদস্য নিয়োগ করা হয়। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাবেক আইজি ও সমাজসেবক আলমগীর কবির, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনা কমিশনের ডিভিশন চিফ ডা. আজিজুর রহমান খান, শিল্পব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জহুরুল হক, তদানীন্তন আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডা. এম এ রশীদ, বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ অর্থায়ন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী আনোয়ারুল মামুন, সেনাবাহিনী থেকে কর্নেল জিয়াউর রহমান, বেসরকারি খাত থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সাইফুর রহমান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব কিউ এম এ রহীম ও সরকারের সচিব এ বি এম গোলাম মোস্তাফা। সত্যি কথা বলতে কি, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মেধার অনুসন্ধান করেই বঙ্গবন্ধু এ কমিশন গঠন করেছিলেন প্রশাসনের চলমান হতাশা দূর করে আমলাতন্ত্রকে একটি গতিময় সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে।

প্রথম জাতীয় বেতন কমিশনকে যেসব বিষয় বিবেচনায় আনতে বলা হয়, তার মধ্যে ছিল জীবনযাত্রার ব্যয়, সরকারের সামর্থ্য; সমাজে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়ের বৈষম্য-হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা; সরকারি খাতে অত্যন্ত মেধাবী এবং কারিগরি ও পেশাগত দিক থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করা ও ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা, দক্ষতা, সুবিচার এবং উৎসাহদান নিশ্চিত করে সুষ্ঠুভাবে সরকারি কর্মসম্পাদন এবং বিভিন্ন পেশা-চাকরির ক্ষেত্রে চাহিদা সরবরাহের প্রশ্নগুলো বিবেচনায় আনা। প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটির কাজের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রেখে জাতীয় বেতন কমিশনকে অগ্রসর হওয়ার সময়োপযোগী দিক-নির্দেশও দিয়েছিলেন জাতির জনক। জাতীয় বেতন কমিশন একটি দুরূহ সমস্যা সমাধানকল্পে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ, আলাপ-আলোচনা, মতবিনিময়, জনমত সংগ্রহ এবং সমসাময়িক বিশ্বের কয়েকটি দেশের বেতন কাঠামো সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে। কমিশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এমনকি যুগান্তকারী সুপারিশ ছিল– পাকিস্তান আমলের ২২৫০টি বেতন স্কেলকে সমন্বিত ও একীভূত করে মাত্র দশটি স্কেলের অধীনে নিয়ে আসা। এগুলো ছিল :

১. উচ্চতর প্রশাসনিক/উচ্চতর বিশেষজ্ঞ;
২. প্রশাসনিক/বিশেষজ্ঞ/ প্রধান নির্বাহী;
৩. প্রবীণ নির্বাহী/ উচ্চতর পেশাজীবী
৪. নির্বাহী/ পেশাজীবী;
৫. নবীন নির্বাহী;
৬. উচ্চতর মিনিস্টারিয়াল/ উচ্চতর টেকনিশিয়ান;
৭. মিনিস্টারিয়াল/ টেকনিশিয়ান;
৮. সহজ দক্ষতার কাজ;
৯. কাস্টোডিয়াল এবং
১০. বিবিধ/অন্যান্য।

এ কমিশন স্থাপিত না হলে চাকরি ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝি, অসহযোগ ও হতাশা আরও বেড়ে যেত। এর সুষ্ঠু ও সার্বিক বাস্তবায়ন যদি পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারসমূহ করে যেত তাহলে পরবর্তীকালে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা দেখা দেয়, তা হয়তো থাকতো না।

শিক্ষাই বল : কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন

মুজিব প্রশাসন জন্মলগ্নেই উপলব্ধি করে যে ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘায়িত ও পাকাপোক্ত করার তাগিদে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়, একটি স্বাধীন দেশের মানবসম্পদ সৃষ্টিতে তা উপযোগী হতে পারে না। সমসাময়িক শিক্ষা নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশদান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ-নির্দেশের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। দেশের কৃতী সন্তান প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডা. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত এ কমিশনের ১৮ জন সদস্যও ছিলেন বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক। শিক্ষা কমিশন উদ্বোধনকালে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব খুদা কমিশনকে বাংলাদেশের জনগণের বাঞ্ছিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য পুনর্গঠিত ও নতুন শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে সুচিন্তিত পরামর্শদানের আহ্বান জানান। এ উপলক্ষে তিনি আরও বলেন যে, আমাদের সীমিত সম্পদের কথ স্মরণ রেখে খুদা কমিশন শিক্ষার এমন এক দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা প্রণয়ন করবে, যা শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনে সাহায্য করবে। খুদা কমিশন প্রায় দুই বছর বিচার-বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহ, জনমত যাচাই ও অন্য কয়েকটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করে ১৯৭৪ সালের ২৪ মে এক যুগান্তকারী রিপোর্ট পেশ করে। খুদা কমিশনের

মতে, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে দেশপ্রেম ও সুনাগরিক গড়ে তোলা; জাতীয় চার নীতি সম্পর্কে জ্ঞান চেতনা বৃদ্ধি; মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্ববোধ সৃষ্টি; নৈতিক মূল্যবোধ জাগানো; সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার লাভ করা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে প্রয়োগমুখী অবদান রাখার মতো মানবসম্পদ সৃষ্টি একান্তভাবে কাম্য। তাছাড়া স্বাধীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলী এবং সৃজনশীলতা ও গবেষণার আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হতে হবে। সর্বতোভাবে শিক্ষানীতিকে গতিশীল করা একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির কারণে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণও সম্ভব হবে। খুদা কমিশন শিক্ষাব্যবস্থার সকল দিক সম্পর্কে যে প্রগতিশীল, বিজ্ঞানসম্মত, যুগোপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা পেশ করে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে খুদা কমিশন বলে, 'সমগ্র দেশে সরকারি ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচিভিত্তিক এক এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। একই মৌলিক কাঠামোর মধ্যে সমাজজীবনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গৌণ বিভিন্নতার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।'

শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে খুদা কমিশন চিহ্নিত করে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে অর্জিত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা, সুসমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবনযাপনের জন্য সচেতন, কর্তব্যনিষ্ঠ, সৎ ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা এবং মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুসারে উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে তোলা। এ স্তরে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং ধর্মশিক্ষাসহ অন্যান্য শাখায় বিভক্ত হয়ে নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বছরের শিক্ষাক্রম সুপারিশ করা হয়।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে খুদা কমিশন আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের সুপারিশ করে এবং বিশেষ করে দেশের মানবসম্পদের চাহিদা অনুসারে উচ্চশিক্ষা সীমিত সুযোগ সদ্ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

দীর্ঘ একুশ বছরের অবহেলা ও অযত্নের ফলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাজ করে চরম নৈরাজ্য, সংকট, বিশৃঙ্খলা, উদ্দেশ্যহীনতা ও নিম্নমুখী নৈতিকতা। মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সন্ত্রাস শিক্ষার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে। বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনায় প্রণীত কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা হলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে তাল রেখে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারতো।

প্রশাসক মুজিবের আরও কয়েকটি পদক্ষেপ

স্বৈরশাসনের যথেচ্ছাচার টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে জারিকৃত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৬০' বাতিল করে ছাত্র-শিক্ষকের দীর্ঘ দাবি অনুসারে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ ১৯৭৩' প্রচলন করা হয়।

উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অর্থপূর্ণ, গতিশীল, সুসমন্বিত এবং দেশ, জাতি ও কালের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম একটি শিক্ষাব্যবস্থা তদারকির জন্য রাষ্ট্রপতির ১০নং অধ্যাদেশ, ১৯৭৪-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্থাপন করা হয়। এর প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ (ডাকসু)-এর নির্বাচন সম্পন্ন করা হয় ১৯৭২ সালের মে মাসে। এতে দ্বিধাবিভক্ত ছাত্রলীগকে হারিয়ে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন ছাত্র ইউনিয়নের মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও মাহবুব জামান। তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিপক্ষ সংগঠনগুলোকে তাদের গণতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য অভিনন্দন জানান।

বঙ্গবন্ধু মুজিবের সরকারকে অকেজো, দেশকে অস্থিতিশীল এবং সমাজকে অস্থির করে তোলার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ সংবাদপত্র-রিপোর্টে মিলে। আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক ২০/৮/৭২ তারিখে এক বিবৃতিতে বলেন, "দুর্নীতিবাজ এমসিএ, আমলা ও রাজনৈতিক টাউটরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারকে হেয়প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।" ১/৪/৭২ তারিখে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী জনসাধারণের উদ্দেশে বলেন, "সমাজবিরোধীদের দমনে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।" ২/৪/৭২ তারিখে যশোরে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "শক্তি প্রয়োগ করিয়া হইলেও শান্তি বজায় রাখা হইবে।"

কৃষি বিপ্লব ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যতিক্রমধর্মী সংস্কার আইনের মাধ্যমে গ্রামবাংলার আপামর জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন প্রশাসক মুজিব। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আঘাত করতে চাই এই ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থাকে। নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি। গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। পাঁচ বছরের প্ল্যান–এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। এ কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। বেকার

কর্মক্ষম প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। পয়সা যাবে তাদের হাতে। টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে। ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের আওতাধীনে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে টাউটদের বিদায় দেয়া হবে– তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। আর মহকুমা থাকবে না। প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করা হবে। নতুন জেলায় একটি করে প্রশাসনিক কাউন্সিল থাকবে। তার একজন চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী এক সাথে তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে।"

সোনার বাংলা ও সোনার মানুষের সন্ধানে

আজীবন শয়নে, স্বপনে, চিন্তায়, সাধনায়, কর্মে এবং আচরণে শেখ মুজিব বাংলার মেহনতি মানুষের কল্যাণ চেয়েছেন। সোনার বাংলা গড়ে এর প্রতিটি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জীবনপণ সংগ্রাম তিনি করে গেছেন। সেজন্যই তিনি বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা। খুব বেশি যে কথাটি তাঁর মুখে শুনেছি তা হলো 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। জাতিকে স্বাধীন করে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও সম্মানের জন্য হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নিঃশেষে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে গেলেন। আমরা কীভাবে রক্তের ঋণ শোধ করবো। সোনার বাংলার স্বপ্ন যেদিন বাস্তবে রূপ নেবে শুধু সেদিনই হবে মুজিবের প্রতি জাতির সকৃতজ্ঞ ভালোবাসা প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। আমরা যেন সোনার মানুষ হওয়ার প্রত্যয় গ্রহণ করি এবং কর্মে, চিন্তায়, চরিত্রে ও আচরণে এ আদর্শ অনুসরণ করে চলি।

রাষ্ট্রধর্ম ও বঙ্গবন্ধু

সুলতান মাহমুদ শরীফ

নিজস্ব জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। শত শত বছর ধরে নানা রকম শোষণ ও শাসনের শিকার হয়েছে এই ভূখণ্ডের মানুষ। এদের একত্রিত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এর পূর্বেও হয়েছে। কিন্তু যারাই রাষ্ট্র-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছে, তারা এখানকার জনগণের উপর নির্যাতন চালিয়ে এদেশের সম্পদ লুট করেছে। বাঙালি রয়ে গেছে অভাবের তাড়নায় জর্জরিত– তাদের শাসকরা হয়েছে স্বল্পকালস্থায়ী– বাঙালি দেখেছে শাসকের পরিবর্তন, কোনো পরিবর্তন হয়নি জনগণের ভাগ্যের।

বিংশ শতকের শেষার্ধের প্রারম্ভে যখন বাংলা ভাষা ও বাঙালির সংস্কৃতির উপর আঘাত এলো, তখন বাংলার জনগণ একতাবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায় করে নিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে। ভাষার স্বীকৃতি পেলেও তারা পেল না রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার। অত্যাচার, অবহেলা, জেল, জুলুম, নির্যাতন হয়ে উঠলো বাংলার মানুষের নিত্যদিনের পাওনা। এ-সবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো তারা। এই সংগ্রাম একদিন রূপান্তরিত হলো স্বাধীনতা আন্দোলনে। এই আন্দোলনে যাঁর নেতৃত্ব এককভাবে বেরিয়ে আসে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নিরস্ত্র বাঙালি কোনো দিন সশস্ত্র যুদ্ধ করবে, তা হয়তো কেউ আগে কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু এবার তারা একতাবদ্ধ হয়ে এক সুরে আওয়াজ তুললো : "তোমার-আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা", "জেগেছে জেগেছে বাঙালি জেগেছে", "জেলের তালা ভেঙ্গেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি", "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো, "সব কথার শেষ কথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা।"

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে যে-ভূখন্ডটি পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল তার অধিবাসীরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উপজাতি, আদিবাসী, সাঁওতাল, চাকমা, মুরং নির্বিশেষে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো। কিন্তু এই 'স্বাধীনতা' ম্লান হয়ে গেল আরম্ভেই যখন তারা দেখলো ব্রিটিশ উপনিবেশের পরিবর্তে তারা পাকিস্তানের

একটি উপনিবেশের অধিবাসী। ক্ষোভ, দুঃখ, লজ্জা ও অপমান এ-নতুন দেশ তাদের নিত্যসঙ্গী হলো। তারা একত্রিত হওয়ার উদ্যোগ নিল এ-অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাতে।

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সম্পর্কে সদ্য অবমুক্ত আমেরিকার হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশান রুমে (White House Situation Room) ঐ দিন বিকাল ৩টা ৫৫ মিনিটে প্রাপ্ত একটি দলিল দিয়ে শুরু করছি। 'পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ' শিরোনামের এই দলিলে বলা হয় :

"Pakistan was thrust into civil war tody when Shaeikh Mujibur Rahman proclaimed the east wing of the two-part country to be the sovereign independent People's Republic of Bangla Desh." (Source : U. S. Defence Intelligence Agency, Operational Intelligence Division, dated 26 March, 1971.)

বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণায় নতুন দেশের নামকরণ করেছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এটা নিশ্চয় তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্নের বাংলাদেশের মানুষের জন্য তাঁরই বাছাই-করা নাম। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের নামকরণ একটি ধারাবাহিক সুস্থ চিন্তার ফল বলে আমার মনে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছাত্র ও যৌবনকালে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব ছিল দৈনিক ব্যাপার। ব্রিটিশ শাসকরা এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত জিইয়ে রেখেছিল। জমিদারী প্রথার মাধ্যমে ধনিক শ্রেণীর শোষণে নিষ্পেষিত ছিল হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে দরিদ্র প্রজাকূল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ-রোধ প্রক্রিয়ায় ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। কারণ, এই প্রক্রিয়া বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯১৩ সালে কবিগুরু তাই লিখেছিলেন : "যে-দেশে প্রধানতঃ ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ বড়ই হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে, সেটাই সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে-মূল্য সেইটিকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে-দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে, রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে-দেশে বাঁচতে পারে?"

বঙ্গভঙ্গ-রোধের পর পরই ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তর করা হয় দিল্লীতে। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যার মাঝামাঝি (১৯৪৩) বাংলায় নেমে এলো দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে খাদ্যাভাবে জীবন ত্যাগ করলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ইংরেজ ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল। মুসলিম

লীগ এবং কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারায় মেতে উঠলো। একটি অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন বাংলা গড়ার আশা নিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য শেরে-বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও শরৎ বোসের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি উঠলো বাঙলা থেকে। যুবক শেখ মুজিবুর রহমান তখন তাদের দাবির সমর্থনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ভারতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বের অপারগতার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারতের অন্যান্য স্থানের মতোই উভয় বাংলায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড সাময়িকভাবে প্রশমিত হলেও দীর্ঘমেয়াদী দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বীজটি পাকাপোক্তভাবে রোপণ করা হলো এই বিভাগের ফলে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর চাল ও ঢাকার নবাব বাড়ির হঠকারিতার ফলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতারা পাকিস্তানের মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে কোণঠাসা হলো।

পূর্ব বাংলার ছাত্র-যুবকরা, যারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, তারা প্রায় সকলে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় চলে এলেন। শেরে-বাংলা ফজলুল হক, আবুল হাশিম, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানীসহ জাতীয় নেতারাও শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। এঁদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটি মোর্চা। বঙ্গবন্ধু এ সময় ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ছাত্র-রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেন।

বাংলার মানুষ ও তাদের রাজনৈতিক নেতারা নব্য-স্বাধীন পাকিস্তানে দেখলো পাঞ্জাবী শাসকদের অত্যাচার, লুণ্ঠন আর নিষ্পেষণে পূর্ব বাংলার মানুষের নাভিশ্বাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। পাকিস্তান সৃষ্টির সাড়ে চার মাসের মাথায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি।

ছাত্র-যুবকদের আন্দোলন নতুন মাত্রা পেল যখন ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকায় এক জনসভায় ভাষণদানকালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন : "Let me make it very clear to you that the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other language." বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো পূর্ব বাংলা— অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি শিকড় নিলো মুসলিম পাকিস্তানে। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক

পরিষদের নির্বাচনে বাংলার জনগণ রায় দিলো সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে। উৎখাত হলো মুসলিম লীগের রাজনীতি এ-প্রদেশ থেকে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান চলে এলেন রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। নির্বাচিত হলেন প্রাদেশিক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য।

এরপর এলো পাকিস্তানকে একটি নতুন সংবিধান দেওয়ার দায়িত্ব। পাকিস্তানের কী নামকরণ হবে, এর উপর প্রস্তাব এলো : ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান। ১৯৫৬ সালের ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিব পাকিস্তান গণপরিষদে উল্লিখিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা ১৯৫৬ সালে গণপরিষদে গৃহীত সংবিধান বর্জন করে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারী করা হয়। এরও আগে যখন যুক্ত-নির্বাচন ও পৃথক-নির্বাচন নিয়ে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে আলোচনা হয়, তখনও বঙ্গবন্ধু তাঁর দল যুক্ত-নির্বাচনের পক্ষে মতামত দেন, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক-নির্বাচন মেনে নেওয়া হয়। মুসলিম লীগ ও মোল্লাগোষ্ঠী যুক্ত-নির্বাচনকে অনৈসলামিক বলে অভিহিত করে। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু বলেন : "In Egypt, Turkey, Lebanon, Indonesia, Iran, Chaina and also Russia in all these places there is Joint-Electorate and even in Morocco, Iraq and Sudan there is Joint-Electorate. So according to my Moulana friends of the Nizam-Islam Party, the people of these places are not Muslims." পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত এক গণভোটে এখানকার মানুষ যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে রায় দেয়।

১৯৫৮ সালে সামরিক-শাসন জারী হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের উপর নেমে এলো নির্যাতন, জেল ও জুলুম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে নিক্ষেপ করা হলো। পরের ১২ বছর তিনি অধিকাংশ সময়ই জেলের অভ্যন্তরে কাটান। ১৯৬৬ সালে তিনি পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবি ছ'-দফা পাকিস্তানের জনগণের কাছে পেশ করেন। পাকিস্তানের শাসকরা শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাজানো হয় তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। অভিযোগ আনা হয়— তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। প্রবল গণ-আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদের নিঃশর্তে মুক্তি দিতে তারা বাধ্য হয়। এরপর এলো ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। পূর্ব বাংলার মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, এলাকা, ভাষা ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে আওয়ামী লীগকে ভো

দিয়ে নির্বাচিত করলো পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে।

গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুযায়ী সামরিক চক্র ও তার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দায়িত্ব ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সেনা-ছাউনিতে ফিরে যাওয়া। কিন্তু তা' হলো না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রত্যক্ষ সমর্থন পেয়ে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা আরম্ভ করলেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত অধিবেশন বন্ধ ঘোষণা করে তিনি বাংলার মানুষের রায়কে প্রত্যাখ্যান করেন। বাংলাদেশে এর প্রতিক্রিয়া হলো ভয়াবহ। জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে এলো এবং অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানালো। ৭ মার্চ (১৯৭১) ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন : "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বাংলার মানুষ মুক্তি-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। আর পাকিস্তানী সামরিক-চক্রের অত্যাচার-নির্যাতন হাজার গুণ বেড়ে গেল। ১৯৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চ রাতের বেলায় ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে পালিয়ে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। যাবার আগে বাংলার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। ঐ রাতেই তারা বন্দী করলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি বাংলার জনগণকে শত্রু-সৈন্যদের প্রতিহত করার নির্দেশ দিলেন। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রমনার বটমূলে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ-বাহিনীর কাছে পরাজিত পাকিস্তান বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পা রেখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন : "আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। দেশে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। দেশের কৃষক, শ্রমিক, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।"

১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে গৃহীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার, (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।"

বঙ্গবন্ধু ধর্মকে কখনই রাষ্ট্র-পরিচালনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে রাজী হননি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এই বাংলায় তিনি প্রচার ও পালন করলেন কবি চন্ডী দাসের অমোঘ বাণী : "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি যে নীতিমালা গ্রহণ করলেন তাতে রয়েছে সকল নাগরিকের ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতার অঙ্গীকার। রাষ্ট্র সেখানে নিরপেক্ষ, অর্থাৎ ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। বঙ্গবন্ধু যে-জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করে বাঙালির স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলেন, তার মূলমন্ত্র ছিল: "ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধ একমাত্র জাতীয় চেতনা থেকে সৃষ্টি হয়।"

১৯৭১-এর পরাজিত পাকিস্তান, মৌলবাদ ও ভণ্ড মওদুদীর অনুসারী রাজাকার-আলবদরদের ষড়যন্ত্রে এবং দুর্বৃত্ত মোস্তাকের সহযোগিতায় জিয়া-রশীদ-ডালিমের হাতে বাঙালি জাতির জনক বিদায় নিলেন তাঁর প্রিয় মাটি ও মানুষের কাছ থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ইতিহাসের দ্বৈত খল-নায়ক মোস্তাক-জিয়ার মাধ্যমে শুরু হলো বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী দেশে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। সংবিধানকে বেআইনিভাবে পরিবর্তন করে নির্বাসন দিয়েছিল এরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট ডিভিশনের একটি রায় মোস্তাক, জিয়া ও এরশাদের আমলে আইন-বহির্ভূত ঘোষণা দিয়ে যে-সব ফরমান জারী করা হয়েছিল, তা' বেআইনি ঘোষণা করেছে।

বঙ্গবন্ধু-হত্যার পর দেশদ্রোহী ঘাতকরা বাংলাদেশকে মৌলবাদী খুনীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে। ধর্মদ্রোহী বেইমান মওদুদির অনুসারীদের পিঠে সওয়ার হয়ে জেনারেল জিয়ার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই খুনিদের লেলিয়ে দিয়েছেন সকল গণতান্ত্রিক ও ন্যায়পরায়ণ মানুষের উপর। ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে স্বৈরতন্ত্রী কায়দায় জঙ্গী মৌলবাদীদের সংঘবদ্ধ করেছেন তিনি। আজ এদের হাতে এবং খালেদা জিয়ার ছত্রছায়ায় প্রতিদিন নিহত হচ্ছে নিরীহ সাধারণ মানুষ। 'জেহাদ'–এর ডাক দিয়ে ভারত-ভাগের আগের কায়দায় এরা হত্যা করেছে বিরোধী রাজনীতিবিদদের– হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান শুধু নয়, যেখানেই যে বা যারা মওদুদীবাদের বিরুদ্ধে তাদেরকেই নিধন করছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আশঙ্কা করেছিলেন যে পাকিস্তানে থাকলে বাংলার মানুষকে ভাগ করা হবে গোত্র, ধর্ম, ভাষা ও অঞ্চল হিসেবে এবং সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলার মানুষের উপর লেলিয়ে দেওয়া হবে ধর্মান্ধ নর-পশুদের। তাই তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন সমগ্র বাঙালি জাতির কল্যাণে। তিনি বলতেন, বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত–শোষক আর শোষিত। আর গর্বভরে দাবি করতেন : "আমি শোষিতের পক্ষে।" বঙ্গবন্ধুর সেই আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে।

অন্নদাশঙ্কর রায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে লিখেছেন :

"যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা,
গৌরি যমুনা বহমান,
তত দিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।"

বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে নিজের রক্ত দিয়ে যে-স্বপ্ন বাস্তবায়নের অঙ্গীকারাবদ্ধ করে গেছেন, আজকে বাংলার মানুষ তাঁর যোগ্য কন্যা ও আদর্শের উত্তরসূরী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই স্বপ্ন পূরণের সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। বাংলার গণমানুষের আত্মদান বৃথা হবে না। কবির ভাষায় : "এক মুজিব লোকান্তরে, লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে।" নতুন প্রজন্ম ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের মতো জেগে উঠবে, দেশ-মাতৃকাকে খুনি ধর্ম-ব্যবসায়ীদের হাত থেকে মুক্ত করবে 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয় নিয়ে।

বঙ্গবন্ধু ও শিক্ষক সমাজ

ড. মোহাম্মদ শাহাদত আলী

বাঙালি জাতির জনক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার প্রখ্যাত শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসে বাঙালি জাতির অভ্যুদয়ের এই অবিসংবাদিত নেতা শিশুকাল থেকে একাধিক নিবেদিত-প্রাণ আদর্শবান শিক্ষকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। শিশু মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিব সর্বোপরি জাতির জনক মুজিবুর রহমান এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন শিক্ষকবৃন্দ তাঁকে নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। শিশুকালে গৃহ-শিক্ষক পণ্ডিত সাখাওয়াতুল্লাহ সাহেবের তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধুর লেখাপড়ায় হাতে-খড়ি শুরু হলো। পণ্ডিত সাখাওয়াতুল্লাহ ছিলেন নিতান্ত সাদাসিধে, মিষ্টভাষী, সত্যাশ্রয়ী, স্বাধীনচেতা, নিষ্ঠাবান শিক্ষক। তাঁর সহাচর্যে এসে শিশুকাল থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সত্যাশ্রয়ী, স্বাধীন-চেতা। নিজের মতামতে সর্বদা অবিচল থাকতেন শিশু মুজিব। শিশুকাল থেকেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন নির্ভয়, নির্ভীক।

১৯৩৪ সালে বঙ্গবন্ধু মাদারীপুর ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় তিনি চক্ষু রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকবৃন্দের পরামর্শে তিনি তিন বছর বিদ্যালয়ে লেখাপড়া স্থগিত করতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে গৃহ-শিক্ষক হিসাবে হামিদ মাস্টার বঙ্গবন্ধুর লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ শাসন-বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের একজন নিষ্ঠাবান বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। বেশ কয়েক বছর রাজবন্দী হিসেবে তিনি কারাবাস করেছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে কিশোর মুজিব তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের নতুন পথ খুঁজে পেলেন। হামিদ মাস্টারের কাছে বিপ্লবীদের ইংরেজ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে নানা রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ডের কথা কিশোর মুজিব মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। বোধ করি পরাধীনতার জিঞ্জির ভেঙ্গে স্বাধীনতার সোনালি প্রভাতকে ছিনিয়ে আনার স্বপ্ন কিশোরকাল থেকে দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বস্তুতঃ হামিদ মাস্টার ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দীক্ষা–গুরু।

দেশের অগণিত দারিদ্র্যপিষ্ট নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর জন্য কিশোরকাল থেকে বঙ্গবন্ধুর মনে জন্মেছিল অপরিসীম মমত্ববোধ। হামিদ মাস্টারের নেতৃত্বে কিশোর

মুজিব গড়ে তুললেন একটি সেবামূলক সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিদিন সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা হতো ধান ও চাল। সংগৃহীত ধান-চাল নিয়ে গড়া হলো সঞ্চয়ভাণ্ডার। সঞ্চয়ভাণ্ডারের নাম দেওয়া হলো ধর্মগোলা। ধর্মগোলা থেকে সঞ্চিত চাল বা অর্থ নিঃস্ব গরীব জনগোষ্ঠীকে দান করা হতো। তাদের জন্য কিশোর মুজিবের মন-প্রাণ সর্বদা কাঁদতো। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সর্বদা ব্যাকুল হয়ে উঠতেন কিশোর মুজিব। হামিদ মাস্টারের কাছে জনসেবার এই মহান শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাই সারাটি জীবন অসহায়, দারিদ্র্যপিষ্ট, নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর জন্য আত্ম উৎসর্গ করেছেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৩৭ সালে মুজিব গোপালগঞ্জ মিশন বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক গিরিশ বাবু তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য-বিষয়। ফুটবল ও ভলিবল খেলায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল লক্ষণীয়। সেসময় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য ছিল। তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকভাব লক্ষ্য করে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন এবং প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি প্রতিদিন বিদ্যালয়ের প্রথম বেঞ্চে বসার চেষ্টা করতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনে মিশন বিদ্যালয়ের শিক্ষক গিরিশ বাবু তাঁর সহায়ক হন। গোপালগঞ্জ মিশন বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় তিনি এক প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নিজেকে সংগঠিত করেন। ১৯৪২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং 'বেকার' ছাত্রাবাসে বাস করতেন। অধ্যাপক সাইদুর রহমান ছাত্রাবাসটির সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। অসাম্প্রদায়িক ও উদার রাজনৈতিক চিন্তার ধারক অধ্যাপক সাইদুর রহমান ছাত্র-মুজিবকে খুবই স্নেহ করতেন। অসাম্প্রদায়িক ও উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণে তিনি বঙ্গবন্ধুকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছেন।

শিক্ষক সমাজের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ। কয়েকটি ঘটনায় তাঁর চরিত্রের এই গুণাবলীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, ১৯ মার্চ, ১৯৬৬ সালে। আমি তখন জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতা করি। ৯, দীননাথ রোডে বাস করি। রাতে কলেজের ক্লাস শেষ করে বাসায় ফিরেছি। হঠাৎ প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান সাহেবের গাড়ি আমাদের দরজায় এসে ভিড়লো। আমার ডাক পড়েছে, কলেজের জরুরী কাজে। কলেজের প্রিন্সিপাল কক্ষে প্রবেশ করে হতবাক হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বসে থাকতে দেখে। প্রিন্সিপাল সাহেব বঙ্গবন্ধুকে বললেন, "ইনি হচ্ছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহাকারী অধ্যাপক, শাহাদত আলী।" বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রকালীন সময়, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়ার পর ৩২নং ধানমন্ডী

ভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছিল। অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি ছিল তাঁর। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন, "আরে তুই দেখছি প্রফেসর সাহেব হয়ে গেছিস। যাক, জহুর আহমদ চৌধুরী (প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী) তোর এবং তোর ছাত্রদের সাথে অশোভন আচরণ করেছে। এই ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত।" ঘটনার খেসারত হিসেবে আমার দেওয়া পাঁচ শত টাকা ফেরত দিয়ে বললেন, "টাকাটা আমার নয়, জহুর চৌধুরীর কাছ থেকে আদায় করেছি।" ঘটনাটা ঘটেছিল চট্টগ্রামের পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল সৈকতে। তখন পর্যটন কর্পোরেশন সৃষ্টি হয়নি। হোটেল সৈকত চট্টগ্রাম রেস্ট-হাউজ নামে পরিচিত। একদল ছাত্র নিয়ে আমি ও বন্ধুবর অধ্যাপক ওয়াকেফ হোসেন চৌধুরী (অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর-প্রাপ্ত) বেরিয়েছি শিক্ষা-সফরে। চট্টগ্রামে অবস্থান করছি ঐ হোটেলে। আমাদের দলের জনৈক ছাত্র, এক হোটেল বেয়ারারের সাথে ঝগড়া বাধায়। এক পর্যায়ে ছাত্রটি বেয়ারাকে চপেটাঘাত করে। আমি ও জনাব ওয়াকেফ হোটেল ম্যানেজারের মধ্যস্থতায় বেয়ারাকে এক শত টাকা দিয়ে মীমাংসা করে ফেলি। হোটেল ত্যাগ করার সময় হয়ে এসেছে। আমাদের বাস এসে গেছে। মালপত্র বাসে তোলা হয়েছে। হোটেল বিল পরিশোধ করে আমরা বাসে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় ঝড়ের গতিতে সেখানে উপস্থিত হলেন তখনকার দিনের শ্রমিক-নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরী। আমাদের স্বীকৃত মীমাংসা ভন্ডুল করে দিয়ে মারমুখী হয়ে বললেন, "কাউকে ফেরত যেতে দেব না, কর্ণফুলীর পানি এদের রক্তে রঞ্জিত করা হবে।" অনেক বাক-বিতণ্ডার পর ছাত্রের কুকর্মের মাশুল হিসেবে পাঁচ'শ টাকা দিয়ে সে যাত্রায় আমরা রক্ষা পেলাম। এই ঘটনার বেশ কিছু দিন পর ঢাকায় হোটেল ইডেনে চলছে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা। এই সভায় জগন্নাথ কলেজের তদানীন্তন ছাত্র সংসদ সহ-সভাপতি রাজিউদ্দীন আহমেদ রাজু (বর্তমান সাংসদ) ও অন্যান্য ছাত্র-নেতা বঙ্গবন্ধুকে ঘটনাটা জানালেন। এ ঘটনায় খুবই ব্যথিত হলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন চট্টগ্রামের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে। বঙ্গবন্ধুর মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব এসেছেন কলেজের একজন তরুণ, অখ্যাত শিক্ষকের কাছে তাঁর দলীয় নেতার আচরণের জন্য দুঃখ জানাতে। এটা কি একটা সাধারণ ঘটনা? শিশু-শ্রেণীতে পাঠ্য-পুস্তকে 'শিক্ষকের মর্যাদা' নামে একটা কবিতা পড়েছিলাম। মোঘল সম্রাট বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে সঠিক মর্যাদা দেয়নি বলে পুত্রকে র্ভৎসনা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শিক্ষককে কেমন মর্যাদা করতেন তা আজ নিজ চক্ষে অবলোকন করলাম। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে আমার দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা।

অপর একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭২ সালে। পাকিস্তানে বন্দীদশা থেকে দেশে ফিরে এসেছেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নির্দেশে তাঁর যোগ্য রাজনৈতিক সহকর্মীবৃন্দ অক্লান্ত

পরিশ্রমে দেশের অগণিত জনসাধারণের চরম ত্যাগের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের নানাবিধ পর্বত-সমান সমস্যা মোকাবেলায় বঙ্গবন্ধু রাতদিন পরিশ্রম করেছেন। এমনি সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ পরীক্ষা ছাড়াই ডিগ্রী প্রদানের জন্য আন্দোলন শুরু করলো। পরীক্ষা ছাড়া ডিগ্রী প্রদানের যুক্তি হিসেবে তারা বলতে লাগলো, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তারা লেখাপড়া করতে পারেনি, যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে তারা বই, খাতাপত্র কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না।

তাদের যুক্তি একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তবে পরীক্ষা ছাড়া ডিগ্রী প্রদান করলে দেশে ও বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হবে। সে কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের এ দাবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরাসরি নাকচ করেছিলেন। ছাত্ররাও তাদের দাবি আদায়ের প্রশ্নে অনড় ছিল। তাদের দাবি আদায়ের জন্য প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করলো। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী। তিনি ছাত্রদের দাবির কাছে কোনক্রমেই নতি স্বীকার করলেন না। তবে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ডাকলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভা হচ্ছে। প্রায় সকল সদস্যই পরীক্ষা ছাড়া ডিগ্রী প্রদানের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বক্তব্য রাখলেন। ছাত্ররা তাদের দাবি আদায়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। তারা একাডেমিক কাউন্সিলের সভাকক্ষ অবরোধ করলো। এখানেই শেষ নয়। ছাত্ররা সভাকক্ষের পানি ও বিজলী বাতি সংযোগ কেটে দিল। ক্রমে সভাকক্ষের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠলো। অধ্যাপক মোকাররম হোসেন খন্দকারসহ কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ শিক্ষক চৈতন্য হারালেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতরে (বর্তমান গণভবন) বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভার একটি জরুরি মিটিং করছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন– এ সংবাদ শুনে তিনি খুবই বিচলিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভা স্থগিত করে ছুটে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভাকক্ষে। দূর থেকে বঙ্গবন্ধুর গাড়ি আসছে দেখা মাত্র অবরোধকারী ছাত্ররা দ্রুত পালিয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু অবরুদ্ধ কাউন্সিল কক্ষে প্রবেশ করলেন। ছাত্রদের এই বাড়াবাড়ির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। শিক্ষকবৃন্দের সাথে কিছু কথা বলে ফিরে গেলেন তাঁর দপ্তরে।

বঙ্গবন্ধু, মানবাধিকার ও বাংলাদেশ

ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য

দেশ ও জাতির যুগ-সন্ধিক্ষণে কিছু সংখ্যক ক্ষণজন্মা ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে। দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সামাজিক অগ্রগতি তাঁদের জীবন ও জীবনাদর্শকে ঘিরে বিকশিত হয়। তাঁরা সংশ্লিষ্ট দেশের ইতিহাসের মহানায়ক। এদের চিন্তা-চেতনা পরাধীন জাতিকে স্বাধীন হতে উজ্জীবিত করে। কোন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম রাতারাতি সফলতা লাভ করে না। স্বাধীনতা হারানো যত সহজ, স্বাধীনতা অর্জন তত সহজ নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট রচিত না হলে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয় না। স্বাধীনতা সংগ্রাম বহুবিধ বিষয়ের উপর নির্ভর করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সফলতা গণআন্দোলন ও গণবিক্ষোভ বা সশস্ত্র-বিপ্লব ছাড়া কোথাও অর্জন সম্ভব হয়নি। সশস্ত্র-বিপ্লব, গণসচেতনা ও গণঅঙ্গীকারের উপর নির্ভরশীল। গণসচেতনতা এক বা দু' বা পাঁচ বছরে তৈরি হয় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও অকুতোভয় বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। এ জাতীয় নেতৃত্ব সব যুগে সব দেশে সব সময় উদ্ভূত হয় না। বাংলাদেশ হাজারো বছরের মধ্যে স্বভাষী, স্বদেশী ও স্বজাতির দ্বারা কখনো শাসিত হয়নি। ১৯৭১ সালের পূর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাছাড়া বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ভাষাভিত্তিক, ভূখণ্ডভিত্তিক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে গণসচেতনতার ভিত তৈরি হয় এবং পর্যায়ক্রমে তা স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়, তার মহানায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস তথা বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও জীবনাদর্শের সঙ্গে একীভূত। এ কারণেই বঙ্গবন্ধু সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থের দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের কল্পকাহিনী রচনা করা সম্ভব।

১৯৭৫ সালের পর থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের কল্পকাহিনী রচনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এর দ্বারা চরমভাবে ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। বর্তমানে

বাংলাদেশের সরকারি প্রচার-মাধ্যমগুলো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের চরম বিকৃতি ঘটিয়ে চলেছে। সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করার প্রবহমান প্রয়াস আত্মহনন ও আত্মপ্রতারণার নামান্তর। সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু এ দেশের অহংকার, বাঙালি জাতির গৌরব। স্বাধীনতা যুদ্ধ ও সংগ্রামের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন বা যারা স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের স্মৃতিপটে 'জয় বাংলা' এবং 'বজ্রকণ্ঠ' আজও অম্লান রয়েছে। 'বজ্রকণ্ঠ' (বঙ্গবন্ধুর বাণী) মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনগণকে উজ্জীবিত করত, মরণপণ যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগাত। বঙ্গবন্ধুর মুখনিঃসৃত বাণী ছিল সেই সময় মুক্তিসংগ্রামীদের প্রধান প্রেরণার উৎস।

জনগণের অধিকার আন্দোলনে যুগ যুগ ধরে বহু নেতা আত্মত্যাগ করেছেন। তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমধারায় নিঃসন্দেহে অবদান রেখেছেন। কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী তাদের স্ব স্ব বলয়ে মানবাধিকার ও জাতীয় চেতনাবোধকে জাগ্রত করে মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জীবনানন্দ দাশ ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তারা সকলেই মানবাধিকার, দেশপ্রেম, স্বাজাত্মবোধ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। মাস্টারদা সূর্যসেন ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে এদেশের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁরা আন্দোলন করেছিলেন অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলাভাষাভিত্তিক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ কেন্দ্রানুগ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কোন সুসংগঠিত আন্দোলন সৃষ্টি হয়নি। ১৯৫২ সালের মাতৃভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি ধর্মান্ধ মৌলবাদী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। সে সময়ে সাম্প্রদায়িক অগণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অন্যতম প্রধান নেতা। বঙ্গবন্ধুর কর্মজীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে লক্ষ্য করা যায় যে, ছাত্রজীবন থেকে অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চরম আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন। বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর ছ'দফা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ ছ'দফাকে ঘিরে বাংলাদেশে গণআন্দোলন সৃষ্টি হয়। এর প্রেক্ষিতে পাকিস্তানী সরকার গণতান্ত্রিক ধারায় স্বাধিকার আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার

জন্য বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা দায়ের করা হয়। মামলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিচার প্রহসনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতায় রূপান্তরিত হওয়ার কারণে তাঁর মুক্তির দাবিতে গণরোষ গণবিক্ষোভে রূপ নেয়। গণবিক্ষোভের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও তাঁর কাছে পাকিস্তানের শাসনভার অর্পণ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও তিনি হিংসার পথ পরিহার করে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জনগণই ক্ষমতার উৎস। জনগণের উপর তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। একইভাবে তাঁর উপর জনগণের অপরিমিত আস্থা ছিল। সে সময় বঙ্গবন্ধুর হাতে পুলিশ বা সামরিক বাহিনী ছিল না। কিন্তু অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময় তার একক নির্দেশে বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়েছে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারাও যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জিত বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট সরকারকে অচল করে দেয়া যায় তা বঙ্গবন্ধু প্রমাণ করে প্রথমবারের মতো বিশ্বে নজির সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অহিংস আন্দোলনের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ ঘটনা।

গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী বঙ্গবন্ধুর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় জনমত গণবিক্ষোভে রূপ নিতে থাকে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান সরকার ও তার বাহিনীসমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালায়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের ৭ মার্চ সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি দ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন "এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।" এটা ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘোষণা। তিনি আরো ঘোষণা করেছিলেন যে, "আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআল্লা। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" পঁচিশে মার্চ রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান বাহিনী বাঙালি জনগণের উপর আক্রমণ চালালে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের অঙ্গীকারের ক্রমধারায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সে সময় স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া ছাড়া তাঁর কোন বিকল্প ছিল না। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২টা নাগাদ বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত স্বাধীনতার প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা টি এন্ড

টি/ ইপিআর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সারা দেশে প্রচারিত হয়। জনগণের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে জনগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার বঙ্গবন্ধুর ছিল। যারা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ষাটের দশকে বা তার পূর্বে যারা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে শেখ মুজিব কোন এক মুহূর্তে বা পদাধিকার বলে রাতারাতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতায় রূপান্তরিত হননি। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন গণমুখী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল তৈরি করেছেন, বহুবার কারাবরণ করেছেন, ষড়যন্ত্রমূলক মামলার আসামি হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে জনগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার অর্জন করেছেন। নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন বলেই দেশে ও বিদেশে তা গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক কে তা হৃদয়সঙ্গম করার জন্য পাকিস্তানী সামরিক-শাসক ইয়াহিয়া খানের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল ছাড়া অন্য কারো বিরুদ্ধে হুশিয়ারি ছিল না। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে লাহোর থেকে আশি মাইল দূরে লায়ালপুরের সার্কিট হাউজে এক সামরিক আদালতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার অপরাধে যাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তিনি হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুক্তিযোদ্ধা, মিত্রদেশ ও আন্তর্জাতিক জনমতের চাপের মুখে পাকিস্তানী সরকার বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টিকে পাকিস্তানী মৌলবাদ ও তার আন্তর্জাতিক বন্ধু-রাষ্ট্রসমূহ সহজে মেনে নিতে পারেনি। সে সময় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদকে সাম্যবাদী আন্দোলন, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হত বিধায় তদানিন্তন মার্কিন প্রশাসনের নিকট মৌলবাদী পাকিস্তান সরকারের বিশেষ একটি অবস্থান ছিল। তদানিন্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও বাঙালি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। বঙ্গবন্ধুকে জীবিত রেখে বাঙালি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মৌলচেতনাকে ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দাঁড় করানোর মতো কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে ছিল না। সম্ভবত এ কারণেই খন্দকার মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে দেশী ও বিদেশী মৌলবাদ-চক্র কতিপয় সামরিক কর্মকর্তার দ্বারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে। মূলতঃ তারা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সামরিক-শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ফরমান বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

তারই ক্রমধারায় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক চার নেতাকে জেলের অভ্যন্তরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পাঁচদিন পর খন্দকার মোস্তাক আহমেদ *"ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৫" জারি করে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত* খুনীদের বিরুদ্ধে শাস্তি-বিধানের পথ রুদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের সরকার তাদের বিদেশী দূতাবাসে চাকুরীর ব্যবস্থা করে সন্ত্রাসীদের পুরস্কৃত করেন। এভাবেই অপরাধকে রাজনীতিকরণ করা হয় এবং রাজনীতিতে অপরাধের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করা হলে পরবর্তী সময়ে এ জাতীয় অপরাধ করার প্রবণতা সৃষ্টি হতো না। পরবর্তী সময়ে একের পর এক সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে যে ধর্মান্ধ মৌলবাদী রাজনীতির প্রবর্তন করা হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্ম দেয়। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক মৌলবাদী শক্তির মদদপুষ্ট দেশজ মৌলবাদী সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর আক্রমণের শিকার হয়েছে। অধিকাংশ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের হোতাদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাদের কোন বিচার হয়নি। এদের আক্রমণের লক্ষ্য হলো বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিকর্মী ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী নাগরিকবৃন্দ। ইতোমধ্যে প্রশাসনের সর্বস্তরে এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক শাখায় মৌলবাদী শক্তি তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। এরা রাজনৈতিকভাবে ধর্মীয়-উন্মাদনাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে। তাদের রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত উপায়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে।

এ উপমহাদেশে বহু রাজনীতিবিদের জন্ম হয়েছে। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশ শাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে যুদ্ধের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রকে পরাজিত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন জাতিতে রূপান্তরের কৃতিত্ব হাজারো বছরের মধ্যে অন্য কোন বাঙালির নেই। বঙ্গবন্ধুর মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব পাশ কাটিয়ে যারা বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করার প্রয়াস নিয়েছে, তারা মূলতঃ বাংলাদেশের গৌরবদীপ্ত মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বিশ্বাস করে না। সমসাময়িক ইতিহাসে তার ন্যায় অন্য কোন নেতা নির্বাচনে এত বিপুল জনসমর্থন লাভে সক্ষম হননি। সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বা সংকটে বিদেশী সৈন্যের সহায়তা নেয়ার নজির বহু দেশে রয়েছে। বিদেশী সৈন্যের সহযোগিতায় স্বাধীনতা লাভের পর মাত্র তিন মাসের মধ্যে বিদেশী সৈন্যের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার নজির বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। মাত্র এক বছর সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন মানবাধিকার সম্বলিত একটি আধুনিকতম রাষ্ট্রের সংবিধান। গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির আলোকে ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে দেয়া হয়েছিল মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের

নিশ্চয়তা। সংবিধানে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার সুস্পষ্ট ধারা বিধৃত করা হয়েছিল। দ্বি-জাতিতত্ত্বভিত্তিক ধর্মান্ধ মৌলবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের মানসপট সৃষ্টি করা খুব সহজ ছিল না। বিশ্বায়নের দৃষ্টিকোণে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করা হয়েছিল। আজ থেকে তিন দশক পূর্বে বিশ্ব-রাজনীতিতে কি জাতীয় পরিবর্তন হতে যাচ্ছে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে তার কি প্রভাব পড়তে পারে, তা তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। উন্নত বিশ্বের ন্যায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরের নীতি ছিল তার জীবন-দর্শনের অন্যতম প্রধান উপাদান।

বর্তমান প্রবহমান বিশ্বরাজনীতির সংকটের ধারা পূর্বানুমান করে তিনি মানবাধিকারভিত্তিক একটি সংবিধান রচনা করেছিলেন। ধর্মান্ধতাভিত্তিক রাজনীতির দ্বারা কী মাত্রায় দেশের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয় তা তিনি অনুধাবন করেছিলেন। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও নীতি প্রণয়নে ধর্মান্ধতার প্রয়োগ জাতীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক পরিসরে কি ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করে তা সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে স্পষ্ট। বর্তমান বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে : ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তি ও মানবাধিকার ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শক্তি। বঙ্গবন্ধু তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানবাধিকারভিত্তিক গণতান্ত্রিক শক্তির সপক্ষে সংগ্রাম করেছেন। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি অপশক্তির সঙ্গে আপোষ করেননি। ৭ জুন ১৯৭২ সালে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতার মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে।" মানবতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অনড় ছিলেন। গণতন্ত্র ও ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পরস্পর বিপরীতমুখী।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোন অন্যায় ও অযৌক্তক চাপের কাছে তিনি কখনও নতি স্বীকার করেননি। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী। একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়। তিনি কখনও ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের সপক্ষে ছিলেন না। ধর্মান্ধ মৌলবাদী আন্তর্জাতিক শক্তিকে তিনি যে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। ১৯৭৩ সালে লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি গাদ্দাফী বঙ্গবন্ধুকে লিবিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের বিনিময়ে বাংলাদেশের নাম বদলিয়ে "ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ" রাখার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন : "বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তথা স্বাধীনতার যুদ্ধে মুসলমান, হিন্দু,

ক্রিস্টান, বৌদ্ধ সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তা' ছাড়া সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের একটি ভিন্নধর্মী চিন্তা-চেতনা, মানসিকতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ অমুসলিম। সর্বোপরি আল্লাহতায়ালা তো শুধু মুসলমানদের আল্লাহ নন, তিনি রাব্বুল আলামীন; সব কিছুরই স্রষ্টা, মহান। সুতরাং আপনার প্রস্তাব কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।" একইভাবে সৌদি আরবের বাদশা ফয়সল বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একই শর্ত জুড়ে দেন। তাঁর প্রস্তাবের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন : "আমার তো মনে হয় না, বাংলাদেশ মিসকিনের মতো আপনাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য চেয়েছে। বাংলাদেশের পরহেজগার মুসলমানরা পবিত্র কা'বাশরীফে নামায আদায়ের অধিকার চাচ্ছে। পবিত্র কা'বাশরীফে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের নামায আদায়ের হক রয়েছে। এ ব্যাপারে আবার শর্ত কেন? আমরা আপনাদের কাছ থেকে ভ্রাতৃসুলভ সমান ব্যবহার প্রত্যাশা করি।" সৌদী আরব থেকে স্বীকৃতির শর্ত হিসাবে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে "ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ" রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তার জবাবে বঙ্গবন্ধু অকপটে প্রশ্ন করেছিলেন : "আপনাদের দেশটার নামও তো 'ইসলামিক রিপাবলিক অব সৌদী এরাবিয়া' নয়। কই আমরা কেউই তো এ নামে আপত্তি করিনি।" একইভাবে সৌদী আরব বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেয়ার প্রস্তাব করে। বঙ্গবন্ধু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শের অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল মানবতা, ধর্মান্ধতা নয়। ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবরে পিজি হাসপাতালে তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন "আপনাদের মানবতাবোধ থাকা দরকার, মনুষ্যত্ব থাকা দরকার, সততা থাকা দরকার–না হলে জাতি কোন দিন বড় হতে পারে না।" তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সাধারণ মানবতাবাদ ও খেটে খাওয়া মানুষ। তিনি কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় একীভূত করতে না পারলে প্রাগ্রসর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের জনগণকে উন্নয়নের ধারায় অঙ্গীকারবদ্ধ করা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টিকোণে জাতিকে উন্নয়নের ধারায় ঐক্যবদ্ধ করার অন্যতম প্রধান উপায় ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল ও গোষ্ঠী চেতনার পরিবর্তে ভাষা ও অভিন্ন সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। বাংলা ভাষার আন্দোলন আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি সমগ্র বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এর কৃতিত্ব বহুলাংশে জননেত্রী শেখ

হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের। তবে বাঙালি হিসেবে ও বাংলাদেশের গণমানুষের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথমবারের মত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলা ভাষাকে সমুন্নত করার বঙ্গবন্ধুর এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর যে কত শ্রদ্ধাবোধ ছিল এ থেকে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। সরকারি কর্মকাণ্ডের সর্বস্তরে তিনিই বাংলাভাষার প্রচলন করেন। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও অবিভাজ্য বাঙালি জাতিসত্তা সৃষ্টিতে অনবদ্য অবদানের জন্য সমগ্র বিশ্বে তিনি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। মহাসংকটময় মহূর্তে তিনি কখনও নিজের দেশ, ভাষা ও জাতীয়তাকে ত্যাগ করেননি। এ বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্যের কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি একটি সভায় বলেছিলেন "... ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।" আমৃত্যু তিনি এ অঙ্গীকার ধারণ করেছেন। তাঁর হত্যার পর থেকে একটির পর একটি আঘাত এসেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির উপর। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তিত হয়েছে। ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক প্রাগ্রসর দেশসমূহের কাতার থেকে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী রাষ্ট্রসমূহের কাতারে যুক্ত হয়েছে। সংবিধানে মানবাধিকার বিবর্জিত পরিবর্তন বাংলাদেশে মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টিতে প্রণোদনা জুগিয়েছে। প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ আজও পৃথক হয়নি। সরকারের বিশেষ বাহিনীর দ্বারা বিনা বিচারে হত্যা নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রবহমান রাজনৈতিক ধারায় রাজনীতি অর্থ ও সন্ত্রাসের কাছে বন্দী। দুর্বৃত্তায়ন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান উৎস। এ অবস্থার নিরিখে বর্তমানে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর চারণভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। প্রগতিশীল গণতন্ত্রমনা মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীচক্রের প্রাধান্যের কারণে বহির্বিশ্ব থেকে বাংলাদেশ দূরে সরে যাচ্ছে। বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর মধ্যে বৈরীভাব সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ রাজনীতিতে চিন্তনমননের দারিদ্র্য। বন্ধুবন্ধুর আদর্শভিত্তিক মানবিক মূল্যবোধসঞ্জাত গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির বাস্তবায়ন ছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। বহির্বিশ্বে সম্মানজনক সহাবস্থান ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

বঙ্গবন্ধুর কৃষি ও সমবায় চিন্তা

ড. সেলিম জাহান

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি যে শুধু আমাদের অর্থনীতির প্রধান খাত, তাই নয়, বরং আমাদের রাজনৈতিক বিবর্তন ও সমাজব্যবস্থাতেও কৃষি অনাদিকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। আমাদের গ্রামীণ তথা সামগ্রিক জীবনে কৃষির এই বিস্তৃত ভূমিকা সম্পর্কে এ মাটির সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এটাও জানতেন যে, এ দেশের কৃষক ও গ্রামীণ গোষ্ঠী কৃষি ও মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের কাছে ভূমি সন্তানের মতো। সুতরাং বাংলাদেশের পটভূমিতে কৃষির যে ভূমিকাই চিহ্নিত করা হোক না কেন, সে ভূমিকায় কৃষক ও ভূমির এ সম্পর্ক যেন নষ্ট না হয়। সে ক্ষেত্রে কৃষি উন্নয়নের মূল নীতি হবে সমবায়, যেখানে ভূমির মালিকানা অক্ষুণ্ন রেখে যৌথ চাষাবাদের ব্যবস্থা থাকবে। কৃষি ও গ্রামীণ জীবনের এ দুটো মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্গবন্ধু প্রণয়ন করেছিলেন তাঁর বিশেষ গ্রাম-সমবায় প্রকল্প। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশে কৃষি বিপ্লব, সেইসঙ্গে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব।

বিশেষ গ্রাম প্রকল্পে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সামগ্রিক গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক বিধৃত হয়েছে। এতে একদিকে যেমন গ্রাম-সমবায়ের লক্ষ্য, এর সংগঠন, জমির চাষাবাদের ব্যবস্থাপনা ও ফসলের বন্টন ব্যবস্থা আলোচিত হয়েছে, অন্যদিকে ঠিক তেমনি এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রশাসনিক কাঠামো, এর অর্থায়ন, এ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, কর্মী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রশিক্ষণ ও আদর্শোদ্বুদ্ধকরণ এবং এর কার্যাবলির মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। এ দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ-কাঠামোয় এই বিশেষ গ্রাম প্রকল্পের সরাসরি ও সুদূরপ্রসারী কি কি প্রভাব পড়তে পারে, সে জাতীয় একটি প্রাক্কলনও আমরা বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনা থেকে খুঁজে পাই।

উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষম বণ্টন, কর্মসংস্থান ও গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন–এ চারটি মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশেষ গ্রাম-প্রকল্প প্রণয়ন করেছিলেন। উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে হবে। সুষম বণ্টন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য একদিকে যেমন উৎপাদন

উপকরণসমূহ সমবায় সমিতির আওতায় এনে সম্পদ ও উৎপাদন-উপকরণে সবার সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, তেমনি অন্যদিকে ফলাফলের বণ্টনেও সমানুপাতিকতা বহাল রাখা। গ্রামে চাষাবাদের মাত্রা বাড়িয়ে, অকৃষি ক্ষেত্রে নানান কার্যক্রম গ্রহণ করে ও ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবার জন্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে। বঙ্গবন্ধুর মতে, বিশেষ গ্রাম সমবায় প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য হবে বাস্তবানুগ পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে গ্রাম ও গ্রামবাসীকে স্বাবলম্বী ও স্বয়ম্ভর করে তোলা, গ্রাম উন্নয়নমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং গ্রামের ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তুলে গ্রামোন্নয়নের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করা এবং গ্রামীণ সমাজের যাবতীয় দিককে এই প্রকল্পের আওতায় এনে গ্রামের সার্বিক ও সর্বাত্মক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

সমবায় পদ্ধতিকে বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশেষ গ্রাম-প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং গ্রাম সমবায় সংগঠনের বিস্তৃত রূপরেখাও তাঁর চিন্তাচেতনায় স্থান পেয়েছিল। অর্থকরী ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ২৯৯ একর থেকে ৫০০ একর পর্যন্ত এক একটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, ফলে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য, জনবসতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা অনুযায়ী প্রতিটি সমিতির পরিসীমা পরিবর্তিত হতে পারে। সমিতির একটি ব্যবস্থাপনা পর্ষদ থাকবে এবং এতে চাষযোগ্য জমির মালিকদের ১২জন প্রতিনিধি (দশ একরের বেশি জমির ৩জন, তিন থেকে দশ একর জমির ৪জন ও তিন একরের কম জমির ৫জন), ভূমিহীন খেতমজুরদের ৬জন ও ৩জন মনোনীত/নিযুক্ত সদস্য থাকবেন। মনোনীত/নিযুক্ত সদস্যবৃন্দ ব্যতীত অন্য সকল সদস্য তাদের স্ব-স্ব গোষ্ঠী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। লক্ষণীয় যে, এ পর্ষদে ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র চাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে সমবায় সমিতিতে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। প্রতিটি ব্যবস্থাপনা পর্ষদের অধীনে চারটি উপ-পর্ষদ থাকবে। এগুলো হচ্ছে পরিকল্পনা কার্যকর উপ-পর্ষদ এবং পেশাভিত্তিক কার্যকর উপ-পর্ষদ। ব্যবস্থাপনা পর্ষদের বিভিন্ন সদস্যকে নিয়ে এসব উপ-পর্ষদ গঠিত হবে। তৃতীয় উপ-পর্ষদের মূল কাজ হবে গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা এবং বিভিন্ন ছোটখাটো অপরাধের (যা যথাযথভাবে তফসিলভুক্ত করা হবে) বিচার। গ্রামে কৃষি ভিন্ন অন্য যেসব মূল পেশায় নিয়োজিত সদস্যসংখ্যা ১০জনের বেশি, সেসব ক্ষেত্রে পেশাভিত্তিক কার্যকর উপ-পর্ষদ থাকবে এবং এ উপ-পর্ষদ ব্যবস্থাপনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন পেশাগত উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাবে। চারটি উপ-পর্ষদ ভিন্নও ব্যবস্থাপনা পর্ষদের আওতায় কর্মক্ষেত্রভিত্তিক কর্মী সংঘসমূহ গড়ে তুলতে হবে, যার সদস্য হবে গ্রামের প্রতিটি কর্মক্ষম লোক এবং যারা বিশেষ গ্রাম প্রকল্পের কার্যসূচি তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য কর্মীদল হিসেবে কাজ করবে। উপরোক্ত

ব্যবস্থাপনা কাঠামো সম্পর্কে তিনটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : **এক.** বঙ্গবন্ধুর সমবায় কাঠামোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমবায় চিন্তার এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়; **দুই.** বর্তমান সময়ে উন্নয়ন চিন্তার নতুন ধ্যান-ধারণা অর্থাৎ মানব উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের যে কথা বলা হয়, বঙ্গবন্ধু বহু আগেই সে তত্ত্বটি তাঁর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং **তিন.** কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত যে-কোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একটি কর্মীদলের প্রাক্-উপস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু পরিপূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভূমিকাতেও অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এ জাতীয় একটি বিশেষ গ্রাম প্রকল্পাধীন চাষ-ব্যবস্থা, মূলত জমির মালিকানা, উত্তরাধিকার ও হস্তান্তরের অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে এবং বন্টন ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট ভাগের বিনিময় নিশ্চিত সরাসরি চাষ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সমবায় সমিতিসমূহের ওপরই ন্যস্ত রাখার কথা বলেন। উৎপাদন ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য ও কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমিতিভুক্ত এলাকার জন্য একটি ব্যবস্থাপনাক্রম ও একটি ফসল-পঞ্জি তৈরি করতে হবে। জমির প্রাকৃতিক গঠন সাপেক্ষে যৌথ চাষাবাদের সুবিধার্থে সমিতিভুক্ত সকল চাষের জমি সম্ভাব্যসংখ্যক ব্লকে বিভক্ত করতে হবে এবং প্রতি ব্লকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন আইল তৈরি করা হবে। প্রত্যেক ব্লকে প্রান্তিক জমিগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে। সমিতির জমি চাষের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যদের লাঙল-গরু প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নির্ধারিত মজুরির বিনিময়ে নিয়োগ করা হবে। চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় মজুর/শ্রমিক যথাসম্ভব সমিতির এলাকাভুক্ত পরিবারগুলো থেকেই সংশ্লিষ্ট কর্মী সংঘের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে এবং তাদেরকে বর্তমানে প্রচলিত শ্রমের সময়সীমা ও হার অনুযায়ী সমিতি নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেয়া হবে। চাষাবাদ ব্যবস্থাপনায় সরকার নিম্নবর্ণিত সাধারণ সুবিধাদি প্রদান করবেন : **এক.** সমিতির খামারবাড়ির জন্য গুদাম, গোলাঘর ও মাড়াই-উঠান ইত্যাদির জন্য অর্থ অনুদান প্রদান; **দুই.** সমিতির প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের সরবরাহ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও প্রয়োজনবোধে ঋণের ব্যবস্থা করা এবং **তিন.** দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী সমিতির প্রয়োজনানুপাতে নিয়োজন।

ফসল কাটার সময়ে মাঠে কিংবা তার অব্যবহিত পরে উৎপাদিত ফসলের ৩৩ শতাংশ জমির মালিকদের ও ৬৭ শতাংশ সমিতির অংশ বলে বিবেচিত হবে। সমিতির অংশের মধ্যে ৭০ শতাংশ চাষাবাদ, উপকরণ সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য, ৭ শতাংশ সমিতির ব্যবস্থাপনা ও প্রাতিষ্ঠানিক খরচ, ১০ শতাংশ সমিতির মূলধন তহবিল, ১ শতাংশ কর ও খাজনা বাবদ সরকারের অংশ, ৫ শতাংশ কৃষি মজুরদের মজুরি, ২ শতাংশ সংরক্ষিত শস্য ভাণ্ডারের জন্য ও বাকি ৫ শতাংশ সমিতির কল্যাণ তহবিলের জন্য। মূলধন তহবিলের ৫০ শতাংশ গ্রামের

স্থায়ী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের ক্ষেত্রে, ২৫ শতাংশ সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে এবং বাকি ২৫ শতাংশ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক ও কর্মীদলের কাজের জন্য মেধা ভিত্তিতে বিতরিত হবে। এখানে উল্লেখ্য, এ বণ্টন ব্যবস্থার একাধিক বৈশিষ্ট্য প্রশংসার দাবিদার। **প্রথমত**, এ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের স্বার্থ, বিশেষত দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে; **দ্বিতীয়ত**, এই বণ্টন কাঠামোয় মেধা পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখে কর্মীদের উৎসাহিত করার সুযোগ আছে এবং **তৃতীয়ত**, কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে যারা দুস্থ, জীবিকাহীন ও অক্ষম, তাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থাও এখানে সংরক্ষিত।

বিশেষ-গ্রাম প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ভূমিকাকে বঙ্গবন্ধু কখনোই খাটো করে দেখেন নি। বরং একটি গঠনমূলক প্রশাসনিক কাঠামোকে এই প্রকল্পের পূর্বশর্ত হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে এবং এ কাঠামোকে গণমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত সংগঠনের দুটো মূল ভূমিকা চিশ্চিত করা হয়েছিল– একটি নীতি ও সমন্বয়ের এবং অন্যটি নির্বাহি প্রকৃতির। এই প্রকল্পের নীতি-নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতিকে সভাপতি করে নীতি-নির্ধারণ ও সমন্বয় পরিষদ নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে নির্বাহী প্রকৃতির কাজগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশেষ-গ্রাম সমবায় ব্যুরো নামক একটি সাংগঠনিক-কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত ব্যুরো নীতি-নির্ধারণ ও সমন্বয় পর্ষদের অধীনস্থ একটি দপ্তর হিসেবে গণ্য হবে। ব্যুরোর প্রধান মহাপরিচালক হিসেবে আখ্যায়িত হবেন এবং তাঁর অধীনে ৪জন পরিচালক, ৪জন উপ-পরিচালক ও ১৪জন সহকারী পরিচালক থাকবেন। জাতীয় পর্যায়ের সঙ্গে গ্রাম পর্যায়ের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনের জন্য গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম সমবায়েও একটি স্থায়ী সমন্বয় পর্ষদের প্রস্তাব করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। শেষোক্ত পর্ষদে গ্রাম সমবায়ের সকল পরিচালকসহ অন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাও থাকবেন। পুরো কাঠামোর সার্থক বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের তদারকির প্রয়োজনীয়তার কথা বঙ্গবন্ধু বারংবার উল্লেখ করেছেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই বিশেষ-গ্রাম সমবায় প্রকল্পকে বঙ্গবন্ধু একটি আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য একাধিক পূর্বশর্তের কথাও তিনি বলেছেন। এসব পূর্বশর্তের অন্যতমটি হচ্ছে গোষ্ঠী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাওয়া। এ ব্যাপারে আদর্শোদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সুতরাং এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে সমবায় পদ্ধতি, সামষ্টিক চেতনা, সার্বিক গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রাম সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য এক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ এবং কর্মী সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ,

মালিক-চাষী, কৃষি-শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তির জন্য অন্য প্রকৃতির প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ প্রশিক্ষণ হবে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজনভিত্তিক। গ্রাম, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণকে বিভাজনের প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে।

বিশেষ-গ্রাম সমবায় প্রকল্পের প্রাথমিক অর্থায়নের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ করা হয়েছিল। সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রচার ইত্যাদির জন্য ৭৫ লাখ টাকা, জাতীয় সমবায় ব্যুরোর সংগঠন, স্থায়ী সুবিধাদি, কর্মকর্তাদের বেতন ইত্যাদির জন্য ৩০ লাখ টাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও লোকসানগ্রস্ত সমিতিগুলোকে অতিরিক্ত সাহায্যদান ও প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের জন্য গ্রাম সমিতিসমূহের সংরক্ষিত তহবিল নামে ১ কোটি টাকার বিধান রাখার কথা বলা হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় বঙ্গবন্ধু পরীক্ষামূলকভাবে ৭৫টি গ্রামে এই প্রকল্প চালুর পক্ষপাতী ছিলেন এবং ১০.৬ লাখ টাকা হারে এর জন্য খরচ হতো ৭. ৯৫ কোটি টাকা। এত বড় একটি মহৎ প্রকল্পের জন্য সরকারি অর্থায়ন ছিল ১০ কোটি টাকার কম। আজকের দিনে যখন শত শত কোটি টাকার অনুৎপাদনশীল ও অগণমুখী প্রকল্প চারধারে নেয়া হচ্ছে, তখন অত অল্প অংকের প্রকল্পের কথায় আমরা চমৎকৃত হই। অত অল্প অংকের প্রকল্পের অন্যতম কারণ হচ্ছে অর্থখাতে জবাবদিহিতায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এর প্রতিফলন দেখা যায় যখন তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রতিটি সমিতির অর্থ তহবিলের অতি সুনির্দিষ্ট বিভাজনের রূপরেখা তিনি প্রণয়ন করেছিলেন।

জবাবদিহিতায় তাঁর সামগ্রিক আস্থার কারণেই বঙ্গবন্ধু বিশেষ-গ্রাম সমবায় সমিতিসমূহের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন ও তাদের লেনদেন নিরীক্ষণের জন্য বিস্তারিত বিধি ও নির্দেশমালা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, সব কর্মকাণ্ড ও আর্থিক লেনদেনের চুলচেরা মূল্যায়ন হতে হবে; প্রতিটি মূল্যায়ন হবে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ; অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উভয় প্রকারের মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং এই মূল্যায়ন ফলাফল জনসমক্ষে প্রচার করতে হবে। মূল্যায়নের ভিত্তিতেই কোনো পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল যে আনুমানিক দশ বছরের মধ্যেই বাস্তবানুগ পরিকল্পনার মাধ্যমে সারা গ্রামবাংলায় বিশেষ গ্রাম সমবায় গড়ে উঠবে এবং সারাদেশে সর্বমোট পঞ্চাশ হাজার সমিতি জন্ম লাভ করবে। তবে কালক্রমে একত্রীকরণের মাধ্যমে এর সংখ্যা বার/তের হাজারে নেমে আসবে। এসব সমিতির সংগঠনে ও এর পূর্ণ বাস্তবায়নে সরকারি ঋণ ও অনুদানে মোট খরচ হবে পাঁচ থেকে সাত হাজার কোটি টাকা, কিন্তু এ থেকে পাওয়া যাবে সরাসরি ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল।

অর্থনৈতিক খাতে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ চাহিদা মিটিয়েও প্রায় ১০০ লাখ টন বাড়তি চাল থাকবে, যার তৎকালীন বাজার মূল্য ৩৬.০০ কোটি

টাকা। এর ফলে জাতীয় আয়ও সমানুপাতে বেড়ে যাবে, জাতীয় আয়ে ও বৈদেশিক মুদ্রায় সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪,১০০ কোটি টাকা। বাড়তি ফসল উৎপাদনের ফলে দেশের স্থায়ী খাদ্য-ঘাটতি মিটে যাবে, যার ফলে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও বৈদেশিক নীতিতে বিদ্যমান অসুবিধাগুলোও দূর হবে। তা ছাড়াও সরকারি বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ ও খাদ্য বিতরণে ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাস পাবে। সারা দেশে গ্রাম সমবায়সমূহের দশ লক্ষ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোক নিয়োজিত হবে ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও সক্রিয় কর্মতৎপরতায়। এছাড়া উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থায় শুধু কৃষিকর্মে নিয়োজিত শ্রমিক-সংস্থাপনের সাংবাৎসরিক পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৪০০ কোটি শ্রম-দিনে। কর হিসেবে গ্রাম সমবায় ব্যবস্থা থেকে সরকারের আয়ের সর্বমোট পরিমাণ হবে ২০০ কোটি টাকা। সমবায় ব্যবস্থায় গ্রামীণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, যোগাযোগ, গৃহস্থালিভিত্তিক পেশা, আইন-শৃঙ্খলা ও গ্রাম প্রশাসন ক্ষেত্রেও সর্বাত্মক অগ্রগতি সাধিত হবে।

এ আন্দোলনের ফলে সারাদেশে এক অভাবিতপূর্ব উৎপাদনমুখী রাজনৈতিক তৎপরতা ও সৃজনশীল রাজনৈতিক সমন্বয় ও সংহতি জন্মলাভ করবে। এ ব্যবস্থায় নেতা-কর্মী ও জনগণের মধ্যে অচ্ছেদ্য এক একাত্মতার সৃষ্টি হবে, যার ফলে সংগৃহীত হবে গোষ্ঠী চেতনায় অনুপ্রাণিত অসংখ্য কর্মীদল। ফলত সারাদেশে গড়ে উঠবে গণমুখী ও উৎপাদনমুখী এক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং কালক্রমে দেশের ৫০ হাজার গ্রাম সমবায়ে তৈরি হবে অন্যূন ২৫ লাখ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, আদর্শোদ্বুদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও আত্মনির্ভরশীল কর্মী।

বাংলাদেশের সমাজজীবনেও এ সমবায় ব্যবস্থা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন। এতে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের পার্থক্য কমে যাবে, সবল কর্তৃক দুর্বলের ওপর অত্যাচারের সুযোগ হ্রাস পাবে, দুস্থ ও পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীসমূহের কল্যাণ নিশ্চিত হবে এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যসহ গ্রামীণ সেবা কাঠামো গড়ে উঠবে। বিশেষ করে জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপরেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য।

বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবিত ব্যবস্থা প্রশাসনিক বিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো। এর ফলে প্রশাসনিক জটিলতা কমে যেত, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন হতো পরিপূরক, সর্বোপরি প্রশাসনের গণমুখিতা বৃদ্ধি পেত।

এ প্রবন্ধে যে বিস্তৃত ব্যবস্থার কথা আলোচিত হয়েছে, তা ছিল বঙ্গবন্ধুর বহুদিনের চিন্তাচেতনা, উপলব্ধি ও বোধের ফসল। তার চেয়েও বড় কথা এটা ছিল তাঁর স্বপ্ন। বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁকে হত্যার কারণে তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। কিন্তু যে কথাটি আজ আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, বর্তমান সময়ে বঙ্গবন্ধুর কৃষি ও সমবায় চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা বেড়েছে বই কমে নি। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের সমস্যা নিরসনের মূল চাবিকাঠি বঙ্গবন্ধুর ঐ স্বপ্নের মধ্যেই নিহিত।

বঙ্গবন্ধুর আর্থ-সামাজিক ভাবনা

খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ

বঙ্গবন্ধু সর্বাংশে রাজনীতিক ছিলেন, একথা সত্য। কিন্তু তাঁর রাজনীতির প্রেরণা এসেছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণকামনা থেকে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চিন্তাচেতনা থেকে। রাজনীতি যেহেতু মানুষের জন্য, সে কারণে কল্যাণচিন্তাই রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে–এরকম ধারণা হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু রাজনীতি অঙ্গনের অনেক বড়-ছোট নেতা বা অভিনেতার মধ্যে আদৌ এই প্রবণতা সবসময় লক্ষ্য করা যায় না। অন্তত সাধারণ মানুষ তেমনটি ভাবতে পারছে না। রাজনীতিক 'শৃগালের মতো ধূর্ত হবে'–এমন ধারণার প্রতিচ্ছবি অনেকের মধ্যেই পাওয়া যায়। কল্যাণচিন্তা দূরের কথা–প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানোর চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা রাজনীতিকের আছে কি না– এমন সন্দেহ অনেক সময় জনমনে আসন করে নেয়। বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, সব রাজনীতিককে এক কাতারে দাঁড় করানো ঠিক নয়। অনেক রাজনীতিকের মধ্যে যেমন জনগণের কল্যাণচিন্তার প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অনেক রাজনীতিকের স্বার্থচিন্তা মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। জনস্বার্থে আত্মবিসর্জন এবং আত্মস্বার্থে জনস্বার্থ বিসর্জন– এই দুই বিপরীত অবস্থানের মাঝামাঝি অধিকাংশ রাজনীতিকের অবস্থান। কেউ প্রথম বিন্দুর কাছাকাছি, কেউ আবার দ্বিতীয় বিন্দুর কাছে। এই বিপরীত প্রবাহে প্রথম বিন্দুর কাছাকাছি অবস্থান নিয়েছেন– এমন রাজনীতিকের সংখ্যা অবশ্যই সীমিত। বঙ্গবন্ধু এঁদেরই পুরোভাগে। 'সিংহের মতো সাহস' তাঁর ছিল, কিন্তু 'শৃগালের মতো ধূর্ত' হবার প্রবণতা তাঁর ছিল না। কারণ তাঁর মধ্যে ছিল নিবিড়তম ভালোবাসার উদ্বেলিত আবেগ। ভালোবাসা আর ধূর্ততা কখনোই সহঅবস্থান করে না। ভালোবাসা পবিত্র, ধূর্ততা মলিন।

বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের দু'টি প্রবলতম প্রকাশ ছিল ভালোবাসা এবং সাহস। ভালোবাসার মঙ্গলময় সিঁড়ি বেয়ে তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল জনগণের মঙ্গলচিন্তা। আর অসীম সাহস তাঁকে বসিয়েছিল নেতৃত্বের শীর্ষবিন্দুতে। মানবিক দোষগুণের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই মানুষটির সকল বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে যায় তাঁর দুরন্ত সাহস আর উদ্বেলিত ভালোবাসার আড়ালে। রাজনীতির অঙ্গনে তাঁকে সাহস আর ভালোবাসার প্রতীক বললে অত্যুক্তি হবে না।

ভালোবাসার আবেগ বঙ্গবন্ধুকে উদ্বিগ্ন করেছিল সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট দর্শনে, তাড়িত করেছিল তাঁকে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, প্রেরণা জুগিয়েছিল জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করতে এবং প্রত্যয়দীপ্ত করেছিল তাঁকে গণমানুষের ভালোবাসার বিনিময়ে নিজের জীবনকে বিসর্জন দিতে। ছাত্রাবস্থায় জেল জুলুমের শুরু। জীবনের বিরাট অংশ কাটিয়েছেন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় উপভোগের সম্ভাবনাগুলো বিনিময় করেছেন নিপীড়ন ভোগের সাথে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন ধূর্ত অত্যাচারীর কৃপাণে। আরাম-আয়েশ ভোগবিলাস সবই বিসর্জন দিয়েছেন। বিসর্জন দিতে পারেননি অমোঘ ভালোবাসা। ভালোবাসার ছন্দে রচিত হয়েছিল তাঁর রাজনীতির কবিতা। তিনি প্রেমিক রাজনীতিক— রাজনীতির মহাকবি।

মানুষকে নিয়েই সমাজ। একজন প্রেমিক রাজনীতিকের সমাজবোধ যে প্রখর হবে সেটাই স্বাভাবিক। সমাজবোধ মানেই সমাজের দুঃখ-বেদনার সাথে নিজেকে সমব্যথী করে নেয়া, সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করা, সমাজের ভাষা-সংস্কৃতির সাথে নিজেকে সম্পূর্ণ একাত্ম করা। নিজেকে সমাজের সাথে সম্পৃক্তকরণ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ছোট ছোট ঘটনা এবং ছোট বড় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে। এ প্রক্রিয়ার শেষ প্রান্তে এসে সমাজের নেতা আর জনতা একে অপরের মাঝে বিলীন হয়ে যায়–নেতা হয়ে ওঠেন ঐ সমাজের প্রতিচ্ছবি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের আপামর জনতা এবং তাদের নেতা বঙ্গবন্ধুর মধ্যে এরকম একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই আমরা দেখতে পাই।

বঙ্গবন্ধুর মানব প্রেমের উপাখ্যান অবলোকনের কিছু স্মৃতি মনের চোখে ভেসে উঠছে। উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের সময়। তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু হননি। এমনকি শেখ মুজিবও নন। গোপালগঞ্জের বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে তিনি স্নেহাস্পদ মজিবর— নবীনদের সবার কাছে মজিব ভাই। নির্বাচনে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন মুসলিম লীগের একজন ধনাঢ্য প্রার্থী। তখনকার দিনে নির্বাচন করতে আজকের মতো অর্থের প্রয়োজন হত না ঠিকই, তবু কিছু অর্থ তো প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যখন বিত্তশালী। এরকম পরিস্থিতিতে একটি তুচ্ছ ঘটনা স্মৃতিতে জেগে উঠছে। কলসিভর্তি দুধ মাথায় ফেরি করত এবং বাড়িতে বাড়িতে সরবরাহ করত এক ফেরিওয়ালা— নাম ধলা মিঞা। আমাদের বাড়িতেও সে প্রতিদিন দুধ দিয়ে যেত। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকে সে উধাও। আর একদম নির্বাচনের পর দুধ নিয়ে হাজির। তার এতদিন না আসার কারণ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, "শক্ত অসুখবিসুখ হয় নাই তো?" চল্লিশোর্ধ ধলা মিঞা হো হো করে হেসে উঠল। বলল, "অসুখের জন্য কোনোদিন কামাই গেছে? গরিবের আবার অসুখ-বিসুখ আছে নাকি?" বলতে বলতে পুঁটলি থেকে একটা বাতাসা বের করে

আমাদের খেতে দিল। আমি ইতস্তত করতে সে সোৎসাহে বলতে লাগল "মিষ্টি খাও–আমাগো মজিবর ইলেকশনে জিতছে।" যে আনন্দ ও আহ্লাদের সাথে সে কথাগুলো বলল তা আমি এখনও অনুভব করতে পারছি। প্রায় ৫/৬ দিন অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে ধলা মিঞা যা বলেছিল তা সংক্ষেপে এই– "ওরা বড়লোক, আমাদের পয়সা নাই। তাই দুয়ারে দুয়ারে মুষ্টিভিক্ষা তুলেছি। গ্রামে গ্রামে ছোট গ্রুপ করে দিয়েছি। তাদের দেখাশুনা করার জন্য এতদিন দুধ ফেরি করতে পারি নাই।" উল্লেখ্য, উক্ত ধলা মিঞা আওয়ামী লীগের সদস্য নয়— নির্বাচন প্রার্থীর আত্মীয়ও নয়। এমনকি রাজনীতিও বোঝে না। একজন সাধারণ দুধওয়ালা। শেখ মুজিব একদিন নাকি পাশের গ্রামে সভা করে ফেরার পথে ধলা মিঞাদের বাড়িতে পাঁচ মিনিট বসেছিলেন। তাদের বাসনে তৃপ্তির সাথে গুড়মুড়ি খেয়েছিলেন এবং বাড়ির মুরব্বিদের মন জয় করেছিলেন। এরপর থেকে আমি খেয়াল করে দেখেছি, শেখ মুজিব জেলে গেলেই ধলা মিঞার মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। হাস্যোজ্জ্বল লোকটির হাসি মিলিয়ে যেত। আমাদের মতো কিশোরদের সাথে প্রায় কথাই বলত না। তবে মুরব্বিদের কারো সামনে পড়লে, দুধের কলসি নামিয়ে রেখে মুখটা কাছে নিয়ে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করত, "ভাইজান, কোনো খবর আছে?" তার এই অনুচ্চস্বরে কথা বলাটাই আমাদের অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়ে দিত। আমাদের দেখে দূর থেকে দাঁত বের করে মুখটাকে দ্বিতীয়ার চাঁদ বানিয়ে যেদিন ধলা মিঞা দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসত সেদিন আমরা বুঝতাম শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এমনি ধলা মিঞার সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক— যাদের সাথে বঙ্গবন্ধুর রক্তের সম্পর্ক ছিল না, রাজনীতির সম্পর্কও ছিল না– ছিল প্রাণের সম্পর্ক। এই যে নির্ভেজাল ভালোবাসা— এটা শুধু কথা দিয়ে অর্জন করা যায় না–এর পেছনে প্রয়োজন একটি ভালোবাসার মন। এ ধরনের আরেকটি ঘটনা শুনেছি। এক অতিদরিদ্র দিনমজুরকে বঙ্গবন্ধু একদিন দশ টাকার একটি নোট দিয়েছিলেন কিছু কিনে খাবার জন্য–কারণ ঐদিন কাজ না পেয়ে সে অভুক্ত ছিল। দরিদ্র ব্যক্তিটি অভুক্তই রয়ে গেল–কারণ নোটটি সে হাতছাড়া করবে না। লোকটি নাকি আমৃত্যু নোটটি আগলে রেখেছিল–কোনো অবস্থাতেই টাকাটি খরচ করতে রাজি হয়নি।

ব্যক্তি থেকেই সমাজ। তাই ব্যক্তিক সম্পর্কই নির্ণয় করে সমাজের সাথে সম্পর্ক। মুক্ত জনগোষ্ঠী বা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে বঙ্গবন্ধুর আত্মার সম্পর্ক কেমন ছিল তা বিশ্লেষণ করা যায়। ষাটের দশকের প্রথম দিক। কুচক্রী মহলের প্ররোচনায় ঢাকাসহ দেশের কোনো কোনো স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হবার উপক্রম। ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করা হচ্ছে। ধর্ম কখনো উন্মাদনার সৃষ্টি করে না। উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ বৈষয়িক। সন্ত্রাস করে কিছু সংখ্যালঘু লোকজন তাড়িয়ে দিতে পারলেই তাদের সম্পত্তি

জবরদখল করা যাবে। প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবৃন্দ তখন ব্যক্তি পর্যায়ে এসব কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতেন। কিন্তু সন্ত্রাসীদের জঘন্য আচরণের বিরুদ্ধে সামনে আসতে অনেকেই সাহস পাচ্ছিলেন না। ঐ সময় বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে প্রকাশ্যে এগিয়ে এলেন— সন্ত্রাসীদের বাধা দিলেন। ভীতসন্ত্রস্ত আক্রান্তদের আশ্রয় দিলেন। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। তাঁর এই সাহসী কর্মকাণ্ডের পেছনে রাজনীতির চেয়ে মানবিক মূল্যবোধের প্রাধান্যই লক্ষণীয়। তাঁর আন্তরিক সাহসিকতার জন্যেই সেদিন বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারেনি। এ ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি ব্যক্তিহৃদয় থেকে সামাজিক হৃদয়ে প্রবেশ করলেন। মজলুমদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিলেন।

ভিন্নরূপে বঙ্গবন্ধুকে দেখা যেত যখন বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, মহামারি এসব দুর্যোগের কবলে পড়ত দেশের মানুষ। যিনি মাথা থেকে পা পর্যন্ত রাজনীতিক, তাঁর রাজনীতি থেমে যেত। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আক্রান্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। আর্থিক সাহায্য কতটুকু করতে পারতেন জানি না। তবে হৃদয়ের ছোঁয়া দিয়ে মানুষকে ভরসা জোগাতে পারতেন। মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ যে সামাজিক শক্তির উল্লেখ করেছেন, বঙ্গবন্ধু সেই সামাজিক শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারতেন, সংহত করতে পারতেন। সামাজিক শক্তি প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে পারতেন। এই মোহনীয় ক্ষমতার মূলে যে জাদু কাজ করেছে সেই জাদুর নাম ভালোবাসা– মানুষের প্রতি অনাবিল ভালোবাসা, অকৃত্রিম ভালোবাসা। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আর তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা–এ দুয়ের অপূর্ব সম্মিলন আমরা প্রত্যক্ষ করি উনসত্তরের গণআন্দোলনে এবং তারপর একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে। দুর্জয় জনতার প্রচণ্ড আঘাতে সেদিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ষড়যন্ত্র বিফল হয়ে গিয়েছিল, আদালত ভেঙে গিয়েছিল। জেল ভেঙে নেতাকে বের করে নিয়ে এসেছিল জনতা। সন্ত্রাস ছিল না। অস্ত্র ছিল না। দুঃসাধ্য কাজটি সাধন করেছিল যে-শক্তি, সে-শক্তিকেই বলা হয় সামাজিক শক্তি। এ-শক্তির বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে একমাত্র ভালোবাসা। হৃদয় যখন হৃদয়কে উজ্জীবিত করে, তখনই সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটে। পৃথিবীর এই অংশে সামাজিক শক্তির প্রচণ্ডতম প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি একাত্তর সনে। একটিমাত্র অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র জাতি পরিচালিত হয়েছিল। ১ মার্চের পর থেকে বঙ্গবন্ধুর মৌখিক নির্দেশে দেশ চলেছে–রাষ্ট্রীয় আইন হয়ে পড়েছিল অচল। ক্ষমতার মসনদ নাই, আইনগত ক্ষমতা নাই, সেনাবাহিনী নাই, পুলিশ-পেয়াদা নাই তবু বঙ্গবন্ধু অবিসংবাদিত নেতা। বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে সমগ্র দেশবাসী তাঁর নির্দেশ পালন করছে। এ আস্থা গভীরতম। এ আস্থা পারস্পরিক। তারপর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে গেলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি— অনেক নারী পুরুষ তখন রোযা রেখে নামাযের পর আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছেন বঙ্গবন্ধুর

হেফাজতের জন্য। এঁরা বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় নন— আওয়ামী লীগও করেন না— এমনকি অনেকে বঙ্গবন্ধুকে জীবনে দেখেন নাই। কিন্তু তাঁদের হৃদয়ের গভীরতম স্থানে বঙ্গবন্ধু স্থান করে নিয়েছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁদের স্বার্থের জন্যই বঙ্গবন্ধু জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। তরুণ আর যুবকেরা তাই নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিল। প্রবীণেরা মনপ্রাণ দিয়ে দোয়া করতে লাগল। সৃষ্টি হল নেতা-জনতার এক অভূতপূর্ব ভালোবাসার কাহিনী।

বঙ্গবন্ধুর জীবনবোধ ও সমাজবোধের পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৭২ সাল ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর বক্তৃতা থেকে। তিনি বললেন, "আমি বাঙালি, আমি মুসলমান, আমি মানুষ।" এ তিনের মধ্যে সংঘাত তিনি দেখেননি– খুঁজে পেয়েছেন মিলন। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। ভালো মানুষ না হলে কেউ ভালো মুসলমান হতে পারে না। একজন ভালো মানুষ দেশপ্রেমিক হবে– তাই বাঙালি পরিচয় দিতে বুক ভরে যায়। তাঁর এই আত্মপরিচয়ের ঘোষণা সকল সংকীর্ণতা পেরিয়ে তাঁকে পৌঁছে দেয় উদারতা ও মানবতার শিখরে।

এখন আমরা তাঁর অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করব। তিনি অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। কিন্তু সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁকে আলোড়িত করেনি– একথা বলা যাবে না। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তিকালে ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যেমন মুখ্য হয়ে উঠেছিল, অর্থনৈতিক চিন্তাচেতনা তেমন লক্ষ্য করা যায় না। ১৯৭১ সালের পাকিস্তান-বিভক্তিকালে বা তৎপূর্বে স্বাধীনতার পটভূমি রচনাকালে, অর্থনৈতিক চিন্তাচেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যার সাথে যুক্ত হয়েছিল নতুন জাতিসত্তা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণা। উল্লেখ করা যেতে পারে, সত্তর সালের নির্বাচনী প্রচারণায় বহুল প্রচারিত পোস্টারগুলোর মূল প্রতিপাদ্যই ছিল অর্থনৈতিক। 'পূর্ববাংলা শ্মশান কেন' শীর্ষক প্রচারপত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য চিহ্নিত করা হয়েছিল। বাঙালির মুক্তির আবেগকে সংযত করা হয়েছিল অর্থনৈতিক তথ্যসম্ভার দিয়ে।

অর্থনৈতিক উপলব্ধি একদিনে আসেনি। এই উপলব্ধির জাগরণ লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন ধারাবাহিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানের গণপরিষদে ধনী ও দরিদ্রের ঘিরাট বৈষম্যের আলোচনায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের বিপুল অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। বাইশ পরিবার পাকিস্তানের অর্থসম্পদ কুক্ষিগত করে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে– এ বক্তব্য পূর্ববাংলার পার্লামেন্টারিয়ানদের মুখেই উচ্চারিত হয়েছিল। এ উচ্চারণ ছিল তৎকালীন পূর্ববাংলার সচেতন মানুষের ধারণাসম্ভূত। তবে এই ধারণা ঠিক তখনই কোনো আন্দোলনের বিষয়বস্তু ছিল না। ধারণা বীজটি অঙ্কুরিত হতে কিছু সময় লেগেছিল। আমরা দেখতে পাই, পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি ধীরে ধীরে সংযোজিত হচ্ছে।

স্বাধীনতা-পূর্ব আন্দোলনগুলোর মধ্যে পটপরিবর্তনের মতো একটি আন্দোলন ছিল ছয়-দফা আন্দোলন। এটি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঘটেছিল। তবে তৎকালীন পূর্ববাংলার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও প্রশাসকদের মধ্যে অনেকের এই আন্দোলনে সম্পৃক্ততা ছিল বলে জানা যায়। ছয়-দফা ছিল ভবিষ্যৎ রাজনীতির অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। 'দুই অর্থনীতি' তত্ত্বের পূর্ণ রূপায়ণ দেখা যায় ছয়-দফার মধ্যে। ছয়-দফার মতো জটিল একটি অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম কীভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন সূচনা করবে— এ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরোধীরা তখন অনেক কথা বলেছেন। কেউ-কেউ সিআইএ-র দলিল বলেও আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ছয়-দফার ভিত্তিতে আন্দোলন এগিয়ে নিতে লাগলেন। আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। আমার বিশ্লেষণে, ছয়-দফার কঠিন অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর জন্য আন্দোলনে হাওয়া লেগেছিল একথা বাস্তবসম্মত নয়। আন্দোলন বেগবান হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বগুণে। তবে ছয়-দফা প্রচারের ফলে ভাববাদী বাঙালির মধ্যে অর্থনৈতিক প্রশ্ন জেগেছিল। তারা অর্থনীতি সচেতন হতে লাগল। ছয়-দফাকে আমি বাঙালি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বলে মনে করি। এর প্রমাণ, পরবর্তীকালে ছাত্রদের প্রণীত এগারো-দফার মধ্যে ছয়-দফার সুস্পষ্ট প্রভাব।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক চিন্তাচেতনায় বিশেষ কোনো তত্ত্ব বা তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। বঞ্চিত মানুষের বঞ্চনা কমিয়ে আনার জন্য তাঁর উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় তিনি কোনো বিশেষ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা বঞ্চনার শিকার হয়েছিল বলে তিনি আঞ্চলিক সমতার কথা বলেছেন। ছয়-দফাতে 'আঞ্চলিক অর্থনীতি' স্থান পেয়েছে— ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের কোনো তত্ত্ব স্থান পায়নি। এই ধনী দরিদ্রের বৈষম্য তাঁকে পীড়া দিয়েছে– কিন্তু সেখানেও স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের উচ্চারণ তাঁর মুখে শোনা যায়নি। বরং দরিদ্রের ভাগ্য উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচির কথাই তাঁর কাছে আমরা শুনেছি।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে ব্যাংক-বীমা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের যে অঙ্গীকার আমরা দেখতে পাই– তাও সমাজতন্ত্রের চিন্তাসম্ভূত বলে মনে হয় না। ব্যাংক বীমা যেহেতু 'বাইশ পরিবার'–এর কুক্ষিগত ছিল এবং সাধারণ মানুষের উপকারে আসছিল না, এজন্যে বাইশ পরিবারের কাছ থেকে এসব আর্থিক সেবাপ্রতিষ্ঠানকে ছিনিয়ে আনার কৌশল হিসাবেই রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। বিষয়টি তত্ত্বভিত্তিক নয়– বরং পরিস্থিতিভিত্তিক (Situational)। তাঁর ধারণা ছিল, রাষ্ট্র যেহেতু জনগণের কল্যাণের জন্য, সেহেতু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে ব্যাংক-বীমাকে জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা যাবে। এর চাইতে অধিক তাত্ত্বিক চিন্তার প্রকাশ বা বিকাশ ঐ সময়ে লক্ষ্য করা যায়নি।

বিষয়টি অধিক বিশ্লেষণ করার প্রয়াসও আমরা তখন লক্ষ্য করিনি। তবে জনগণের মনোভাব এ বিষয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক ছিল।

যতদূর মনে পড়ে বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র বিষয়টি প্রথম অবতারণা করলেন সত্তরের নির্বাচনের পর একাত্তরের জানুয়ারি মাসে নির্বাচনোত্তর এক বিশাল সমাবেশে। তিনি মোটামুটি এভাবে বিষয়টি অবতারণা করেন, "আজ আমি আপনাদের একটা বড় কথা বলব। সেটা হল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের কথা অনেকেই অনেকদিন থেকে বলেছেন–কিন্তু কিছুই করতে পারেন নাই। আমি জানি কোন কথাটি কখন বলতে হয়।" যতদূর মনে পড়ে, এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু এ প্রসঙ্গে তিনি বলেননি। সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা বা তত্ত্ব কিছুই বলেননি। এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রসঙ্গও টানেননি। আমার মনে হয়েছিল, তিনি যতটা না তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন, তার চাইতে বেশি 'শোষণহীন সমাজ' প্রতিষ্ঠার অর্থে সমাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সমাজতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার রাজনৈতিক কৌশল হিসাবেও হয়ে থাকতে পারে। তবে বঙ্গবন্ধুর মুখে সমাজতন্ত্রের চেয়ে 'শোষণহীন সমাজ' 'বৈষম্য দূরীকরণ' 'ভাগ্যহীনদের ভাগ্য উন্নয়ন' 'দরিদ্রদের অবস্থা পরিবর্তন' এবং এ ধরনের কথা অনেক বেশি উচ্চারিত হয়েছে। অনেক সমাজতন্ত্রী সমাজতন্ত্রের জন্য সমাজতন্ত্রকে পছন্দ করেছিলেন এবং এর ওপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র-ধারণা ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে উৎসারিত। সমাজতন্ত্রীদের সাথে বঙ্গবন্ধুর মন-মানসের পার্থক্য এখানেই।

স্বাধীনতার পর ধারণাসমূহ আরও পরিষ্কার হতে শুরু করে। রাজনীতিতে গণতন্ত্র এবং অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের সহ-অবস্থান প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষণীয়। এখানে সমাজতন্ত্র অর্থসম্পদের সুষম বণ্টন অর্থেই ব্যবহৃত— যা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ঘটানোর প্রয়াস ছিল। এটি অগ্রসর চিন্তা, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি দেশে। গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সম্পদের অনেকটা সুষম বণ্টন ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। এই উপমহাদেশে শ্রীলংকাতেও এ ধরনের প্রয়াসের সাফল্য লক্ষণীয়। শ্রীলংকাতে অবশ্য শিক্ষিতের হার নব্বই ভাগের ওপর। মানবাধিকার বজায় রেখে সম্পদের সুষম বণ্টন আমাদের মতো দেশে শুধু অগ্রসর চিন্তাই নয়, সাহসী প্রয়াসও বটে। এই সাহসী কল্যাণচিন্তার উদ্ভব ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর চেতনায়। তাঁর এ চেতনার পেছনে রয়েছে মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা, আর এ ভালোবাসা বাস্তবায়নে দুরন্ত সাহস। বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনা, সমাজবোধ, অর্থনৈতিক ভাবনা— এ সবকিছুরই পটভূমি হিসাবে উদ্ভাসিত ছিল নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং অসীম সাহস। তাঁর সাফল্যের মূলে যেমন ভালোবাসা ও সাহস, তেমনি তাঁর মর্মান্তিক পরিণতির জন্যও তাঁর নিঃশর্ত ভালোবাসা ও বেহিসাবি সাহস।

গণমুখী শিক্ষা ও বঙ্গবন্ধু

এ কে আজাদ চৌধুরী

সুদূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতে শিক্ষাই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে এবং জীবনের মান উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। শিক্ষাই শক্তি (Knowledge Power), শিক্ষাই আলো, শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার অপর নাম আত্মসচেতনতা ও উন্নয়ন। শিক্ষিত জাতি মাত্রই উন্নত জাতি। অপরদিকে, অশিক্ষিত জাতি যে অনুন্নত, পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন– বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

শিক্ষা যখন আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে এতোই গুরুত্বপূর্ণ, সেই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী হবে, শিক্ষা কাঠামো বা স্তরবিন্যাস কীরূপ হবে, শিক্ষার বিষয় বা উপাদান কী হবে, শিক্ষার্থীর আগ্রহ বা উৎসাহ, সমাজ চাহিদা এবং জাতীয় প্রয়োজন বা উন্নতি-সমৃদ্ধির সাথে শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে সম্পর্কিত হবে, তার প্রতিফলন ঘটে শিক্ষানীতিতে। তাই একটি স্বাধীন ও উন্নয়নকামী জাতির একটি জাতীয় শিক্ষানীতি আবশ্যক। চিরাচরিত শিক্ষানীতির পাশাপাশি আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সামনে রেখে আরো একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, যা হলো গণমুখী শিক্ষা।

গণমুখী শিক্ষা বলতে সাধারণভাবে জনগণের জন্য, জনগণের প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে বোঝায়। এর প্রধান লক্ষ্য, দেশের শিক্ষাদানযোগ্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে ন্যূনতমপক্ষে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা বা সাক্ষর করে তোলা এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। উপরন্তু, লব্ধ শিক্ষা যেন ব্যক্তি ও সমাজ-চাহিদা, জনকল্যাণ, দেশ ও জাতির উন্নতি-সমৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ সাধনে নির্দেশিত হয়, সে বিষয়ে সমান গুরুত্ব আরোপ করা। তাই, ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, সমাজ চাহিদা ও জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত বা 'এলিট' সৃষ্টি এ শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী— যেমনটি ছিল ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে ভারতে Macaulay কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৯৭১ সালের 'বাংলাদেশ বিপ্লবের' লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু জাতীয় মুক্তি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই ছিল না, তা ছিল বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে নির্দেশিত। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র হবে জনগণের রাষ্ট্র এবং এর সমুদয় নীতি বা কর্মকাণ্ড জনস্বার্থে বা জনকল্যাণে পরিচালিত হবে। পাকিস্তান পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এ দেশের জনগণের মনে এ আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয় এবং ক্রমশ তা তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সে আকাঙ্ক্ষাকে গণচেতনায় পরিণত করে। তাই আমাদের নতুন রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নামে 'গণ' শব্দের প্রয়োগ। রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ) একই চেতনার স্বাক্ষরবাহী। এ রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি অবশ্যই গণমুখী হওয়ার কথা। বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে এর সর্বোচ্চ স্বীকৃতি আমরা দেখতে পাই। এ সম্বন্ধে সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

গণমুখী শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। 'সবার জন্য শিক্ষা' ব্যতীত আমাদের উন্নতি-অগ্রগতির যে উপায় নেই তা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। শিক্ষা তাঁর কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি একে 'উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ' হিসেবে দেখেছেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু যে কথা বলেন, তা খুবই প্রণিধানযোগ্য :

সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতি বছর ১০ লাখেরও বেশি নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের

সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল কলেজ ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

[মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (ঢাকা : নভেল পাবলিকেশন, ১৮৮৯) পৃ. ২৮]

স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধু সরকার গণমুখী শিক্ষার বিষয়কে শুধু সাংবাদিক স্বীকৃতি দিয়েই থেমে থাকেনি, বরং নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ, ১৯৭১ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ- খুদাকে চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি শিক্ষা কমিশন গঠন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৯৭৪ সালের ৩০ মে ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪৩০ পৃষ্ঠা নিয়ে 'খুদা কমিশন' রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রায় দুই যুগ পরেও এটি একটি চমৎকার রিপোর্ট হিসেবে সর্বমহলে বিবেচিত (যদিও পরিবর্তিত অবস্থায় কোথাও কোথাও এর পরিবর্তন/পরিমার্জন আবশ্যক)। কমিশনের উল্লিখিত রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্বন্ধে বলা হয় :

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহ, উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে কমিশনের পক্ষে এ দুরূহ কাজ সম্পন্ন হতো না। আমরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। *['ভূমিকা', কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪]*

জাতির দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল এক চক্রের নির্মম ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হন জাতির জনক। এরপর এ চক্রের পৃষ্ঠপোষক শক্তি দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে। তাই কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আর আলোর মুখ দেখেনি। দীর্ঘ এ সময়ে জাতি শিক্ষানীতিহীন অবস্থায় চলেছে। শুধু তাই নয়, এ সময়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গণমুখী চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে একে জনগণের বিপরীতে বা মুখোমুখি দাঁড় করানোর অপচেষ্টা হয়েছে।

জাতির জন্য একটি গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা যে কত আবশ্যক তা বর্ণনাতীত। আমাদের জন্য শিক্ষাই উন্নতি-অগ্রগতির একমাত্র সোপান। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে না পারলে কোনো ভবিষ্যৎ নেই। একবিংশ শতাব্দী সমাগত। 'গ্লোবাল ভিলেজ কনসেপ্ট'-এ জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ছাড়া বিশ্ব প্রতিযোগিতায় আমাদের টিকে থাকার অন্য কোনো উপায় থাকবে না। আশার কথা, বর্তমান সরকার ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য স্থির করেছে। পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থার আলোকে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টভিত্তিক একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নে ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতির বহু মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয়েছে। জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এখন আমাদের দ্রুত অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। জাতির জনকের নির্দেশিত পথেই তা সম্ভব।

বঙ্গবন্ধুর বাকশাল :
পটভূমি, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি

ড. অজিত কুমার দাস

ভূমিকা

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একটি 'জাতীয় দল' গঠনের বিধান করেন। চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে দেশে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। উক্ত সংশোধনীর দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে এক 'জাতীয় দল' গঠন করেন। ফলে সেদিন থেকে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য সকল দল আইনতঃ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আজীবন এই সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। শুধু তাই না, স্বাধীনতার পর দেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপরও তিনি দেশের মেহনতী মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রের কথাও ভাবতেন। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কয়েক বছর যেতে না যেতেই ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে তিনি বহুদলীয় ব্যবস্থা রহিত করে দেশে একদলীয় শাসন 'বাকশাল' কায়েম করেন। বঙ্গবন্ধু বাকশালকে একটি 'গণতান্ত্রিক সিস্টেম' বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্যই তিনি 'বাকশাল' কায়েম করেছেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারের হত্যা করা হলে 'বাকশাল' কর্মসূচির বিলুপ্তি ঘটে।

বাকশাল গঠনের পটভূমি

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১১ জানুয়ারি 'বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান

আদেশ' জারি করেন। সেখানে বিধান করা হয় যে, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভা থাকবে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর সকল কার্য সম্পাদন করবেন। অস্থায়ী সংবিধান অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর জায়গায় হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও ইউরোপ ও আমেরিকায় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। ক্ষমতা গ্রহণের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলে প্রথমেই তিনি বিরোধী দলগুলোর বিরোধিতার সম্মুখীন হন। নবগঠিত সংবিধান(১) প্রশ্নে বিরোধী দলগুলো, বিশেষ করে পিকিংপন্থী দলগুলো, আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নামে। পিকিংপন্থী দলগুলো যেমন– ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) প্রভৃতির সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ছিল না। এই দলগুলো সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিল। এই দলগুলো নতুন সংবিধানের তীব্র সমালোচনা করে এমনকি গণপরিষদের বৈধতাও চ্যালেঞ্জ করে। ন্যাপ নেতা মওলানা ভাসানী যুক্তি দেখিয়ে বলেন, গণপরিষদের সদস্যগণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামোর (১৯৭০) অধীনে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁরা অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য ৬-দফা ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ম্যান্ডেট লাভ করেন। অতএব সকল রাজনৈতিক দলের যৌথ সংগ্রামের মাধ্যমে যে সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে সেই বাংলাদেশের সংবিধান রচনার অধিকার তাঁদের নেই।(২) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী) এবং বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করে। এই দল দু'টি দাবি করে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন ও গণভোটের মাধ্যমে তা গ্রহণ করতে হবে।(৩) নতুন সংবিধান সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) বলে, "জারিকৃত এই শাসনতন্ত্র ঔপনিবেশিক দাসত্বের এক স্বাক্ষর। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী বীভৎস মুখকে যেমন সমাজতন্ত্রের ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইছে, ঠিক তেমনি তার এই সামাজিক উপনিবেশকে সে তথাকথিত সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে আচ্ছাদিত করে রাখতে চাইছে।... জাতীয়করণকেই বলা হচ্ছে সমাজতন্ত্র। কিন্তু জাতীয়করণ করলেই সমাজতন্ত্র হয় না।(৪)

পিকিংপন্থী এই দলগুলো অভিযোগ করে যে, সংবিধানটি না সমাজতান্ত্রিক না গণতান্ত্রিক। কিছু ভাল কথা ও সাধু ইচ্ছা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ

করা হলেও সেখানে নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের কোন নিশ্চয়তা নেই এবং সংসদে কৃষক-শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বেরও কোন ব্যবস্থা নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্তি করা হয়নি, এমনকি তার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণও করা হয়নি। এই সংবিধানের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয়।(৫) তাই তারা সংবিধানটি প্রত্যাখ্যান করে।

নবগঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ও তার ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল(৬) যারা নিজেদের রুশপন্থী বা চীনপন্থী বলে পরিচিত হতে অস্বীকার করতো, তারাও নতুন সংবিধানের সমালোচনা করে। জাসদ নেতা আ. স. ম. আব্দুর রব বলেন, সংবিধানটি একটি 'বাজে সংবিধান', তবে একেবারে না থাকার চেয়ে একটি বাজে সংবিধানও ভাল। তিনি অভিযোগ করেন যে, মৌলিক অধিকারসমূহের উপর বাধানিষেধ আরোপ করে গণতন্ত্রকে 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রে' পরিণত করা হয়েছে। সংবিধানে শ্রেণীদ্বন্দ্ব স্বীকার করা হয়নি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার যথাযথ নির্দেশ নেই। ফলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় কাগুজে বুলিতে পরিণত হয়েছে।(৭) শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল সংবিধানে পরিকাল্পত সমাজতন্ত্রকে 'পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমাজতন্ত্র' বলে সমালোচনা করে। এই দলের নেতা বলেন যে, সরকার সমাজতন্ত্রের নামে কেবল পাকিস্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য, যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা সংবিধানে করা হয়নি।(৮)

কিন্তু মস্কোপন্থী সিপিবি, ন্যাপ (মোজাফফর) যারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিল এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে আসছিল, তারা একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সংবিধানটির প্রতি নমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত সংবিধানটি গ্রহণও করে। সিপিবি নেতৃবৃন্দ বলেন, সংবিধানটি সমাজতান্ত্রিক নয় এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি সমাজতান্ত্রিক সংবিধান আশা করাও যায় না। অবশ্য সংবিধানকে গণতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্র অভিমুখী করার লক্ষ্যে তাঁরা ১২-দফা কর্মসূচি পেশ করে। সেসব কর্মসূচির মধ্যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে জাতীয় অর্থনীতির মূল খাত হিসেবে গড়ে তোলা, সমাবেশ, মিছিল ও ধর্মমতের অবাধ অধিকার, সংসদের আস্থা হারালে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের বিধান ইত্যাদি।(৯) অনুরূপভাবে ন্যাপ (মোজাফফর) সংসদীয় সরকার, মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদির জন্য সংবিধানের প্রশংসা করে, কিন্তু একই সঙ্গে মৌলিক অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপের সমালোচনাও করে। এই দলের নেতৃবৃন্দ বলেন যে, অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান

সংবিধানে নেই। কর্ম ও জীবিকার ন্যূনতম উপকরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। ন্যাপ (মোজাফফর) সংবিধানের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে যেসব দাবি উত্থাপন করে সেগুলোর মধ্যে ছিল : জীবনধারণের মৌলিক চাহিদা ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের সুস্পষ্ট বিধান, উপজাতীয়দের জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি।(১০)

এভাবে পিকিংপন্থী দলগুলো, সাথে সাথে জাসদ, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল আওয়ামী লীগ প্রণীত সংবিধানকে অগণতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক বলে তীব্র সমালোচনা করে কিন্তু তারা গঠনমূলক কোন সুপারিশ পেশ করেনি।(১১) কিন্তু মস্কোপন্থী দলগুলো সংবিধানটির ভাল-মন্দ উভয় দিক নিয়েই কথা বলে এবং সংবিধানটির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কিছু সুপারিশ পেশ করে।

এদিকে ডানপন্থী ইসলামী দলগুলো যাদেরকে স্বাধীনতার পরপরই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং যারা সংসদীয় গণতন্ত্রে মোটামুটি বিশ্বাস করলেও সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কট্টর বিরোধী ছিল, তারাও নতুন সংবিধানের বিরোধিতা শুরু করে এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে বানচালের জন্য উগ্র বামপন্থীদের সাথে হাত মেলায়।(১২)

উল্লেখ্য যে, পিকিংপন্থী উগ্র-বাম দলগুলো বিশেষ করে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি(১৩) এবং আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পাটি (মা-লে) শুধু নতুন সংবিধান প্রশ্নেই নয়, তাদের জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে। এই দলগুলো আওয়ামী লীগ পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুরের লড়াই' বলে অভিহিত করে এবং কোথাও কোথাও মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যর্থ লড়াই করে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সর্বহারা পার্টি ঘোষণা করে, "বাংলাদেশ ভারতের অধীন।" তাই দলটি 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের' জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানায়। আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে), মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল (মা-লে), দেবেন সিকদারের নেতৃত্বাধীন বাংলার কমিউনিস্ট পাটি,(১৪) অমল সেনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী) প্রভৃতি দলও প্রায় একই ধরনের আহ্বান জানায়। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে)-এর নেতা আবদুল হক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে My dear Prime Minister বলে সম্বোধন করে ১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক পত্র লেখেন। এতে তিনি 'ক্রীড়নক মুজিব সরকারকে' উৎখাত এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ, অস্ত্র এবং বেতারযন্ত্র চান। প্রাক্তন বামপন্থী এবং স্বাধীনতার

পর পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী মাহমুদ আলীর মাধ্যমে এই পত্র ভুট্টোর কাছে পৌঁছে। ভুট্টো এই পত্র যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন।(১৫) জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পিডিপি প্রভৃতি ডানপন্থী দলগুলো গোপনে ভুট্টোর সমর্থন লাভ করে এবং তারা 'মুসলিম বাংলা' স্থাপনের জন্য কার্যক্রম শুরু করে।(১৬) এ প্রেক্ষিতে ন্যাপ নেতা মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন "মুসলিম বাংলার জন্য যারা কাজ করছে তাদের আমি দোয়া করি। আল্লাহর রহমতে তারা জয়যুক্ত হবে।"(১৭) শুধু মুসলিম বাংলা গঠন নয়, উগ্র পিকিংপন্থীদের 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' গঠনের দাবির সাথেও তিনি সংহতি ঘোষণা করেন। বস্তুত দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মওলানা ভাসানীর সাথে পিকিংপন্থীদের গড়ে উঠে এক গোপন আঁতাত। এ প্রসঙ্গে মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায় লিখেছেন(১৮) : "রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে ভাসানী যুক্ত ছিলেন প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে এবং নিপীড়িত হয়েছেন কর্তৃপক্ষের দ্বারা। কিন্তু, রাজনৈতিক জীবনের শেষ দিকে যেন তিনি ক্রীড়নক হয়ে গেলেন চরম-ডান ও বামপন্থীদের। এ ধরনের মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে ইন্ধন যুগিয়েছে সামরিক ষড়যন্ত্রের এবং সংসদীয় গণতন্ত্র বিনাশের।"

শুধু বিরোধী দলগুলোর সরকার-বিরোধী তৎপরতাই নয়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর খোদ শাসক দলের অভ্যন্তরে মতাদর্শিক প্রশ্নে সংকট দেখা দেয়। সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগের অপেক্ষাকৃত উদার গ্রুপটি 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা কররে অপর রেডিক্যাল গ্রুপটি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। এই দুই গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত আ.স.ম. আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বাধীন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী গ্রুপটি ছাত্রলীগ থেকে বের হয়ে গিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠন করে এবং মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নামে।

ইতোমধ্যে পিকিংপন্থী দলগুলো তাদের 'সশস্ত্র সংগ্রাম'–এর মাত্রা জোরদার করে। মাওবাদীরা ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের দিনকে বেছে নেয় এবং বিজয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচি বানচাল ও জনগণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে দেশব্যাপী একটা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাঁরা ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসকে 'কালো দিবস', 'পরাধীনতার দিবস' বলে আখ্যায়িত করে।(১৯) সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ঐ দিন ঢাকায় 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ' এবং 'তাঁদের বিশ্বাসঘাতক আওয়ামী লীগের পুতুল সরকারকে উৎখাতের' দাবিতে হরতাল আহ্বান ও প্রচারপত্র বিলি করে। ন্যাপ নেতা মওলানা ভাসানী উক্ত হরতাল সমর্থন করেন এবং ১৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করেন "দেশে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হয়ে

গেছে, সশস্ত্র বিপ্লব হল একমাত্র পথ।"(২০) উক্ত জনসভায় মওলানা ভাসানী মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি তাঁর সংহতি প্রকাশ করেন এবং বলেন, তাঁর বয়স বেশি না হলে নিজেই অস্ত্র ধারণ করতেন।(২১) মওলানা ভাসানীর জনসভার পর পরই সন্ধ্যায় মাওবাদীরা ঢাকাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের সাংস্কৃতিক ভবন, ভারতের একটি বিমান কোম্পানী অফিস, একটি দৈনিক পত্রিকা অফিসের কার্যালয় প্রভৃতি স্থানে হাতবোমা ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। তাছাড়া ঢাকার সন্নিকটে শাহজাহানপুরের নিকটে ডিনামাইট দিয়ে রেল লাইন উড়িয়ে দেয় এবং ভৈরবের নিকটে রেললাইন খুলে ফেলে।(২২)

পরবর্তীকালে (১৯৭৪ সালে) মাওবাদী গ্রুপগুলোর সাথে জাসদের গণবাহিনী যুক্ত হয়(২৩) এবং তাদের 'বিপ্লবী অভিযানে' ১৫০টি ছোট-বড় হাটবাজার, প্রায় ৫০টি ব্যাংক, ৪০টি থানা বা ফাঁড়ি লুঠ হয়। ১৯৭৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর উগ্রপন্থীরা ঘোড়াশাল সার কারখানাটিতে কন্ট্রোল-রুম উড়িয়ে দেয়। সোভিয়েত রাশিয়ার অনুদানে নির্মিত এই সারকারখানাটিতে ক্ষতি হয় বৈদেশিক মুদ্রায় ১৫০ মিলিয়ন টাকা।(২৪) এছাড়া ১৯৭২-৭৪ সাল নাগাদ দেশে কয়েক হাজার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগেরই চারজন সংসদ সদস্যসহ প্রায় তিন হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়।

এভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ডানপন্থী ও উগ্র বামপন্থীদের কার্যকলাপ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক বিরোধীদের মিথ্যা অপপ্রচার এসব কিছু মিলে দেশ এক মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গৃহীত এক প্রস্তাবে বলে যে, যে-সব ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দল স্বাধীনতা ও প্রগতির বিরোধী বলে বিবেচিত হবে, গণতন্ত্রের স্বার্থেই তাদের দমন করা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের নামে দেশে বর্তমানে প্রচলিত বুর্জোয়া গণতন্ত্র চলতে দেয়া যায় না। শুধু তাই নয়, সিপিবি নেতা মণি সিংহ ১৯৭৪ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকার বায়তুল মোকাররমের এক জনসভায় ঘোষণা দেন যে, "কৃষক শ্রমিকের গণতন্ত্রের জন্য পার্টি সংগ্রাম করবে এবং আওয়ামী লীগ সরকার কোন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন আনলে তাতে সাহায্য করবে।"(২৫) এসময় আওয়ামী লীগের একটি অংশ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করতে থাকে এবং শেখ মুজিবের উপর দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রয়াসে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনার জন্য চাপ দিতে থাকে।(২৬) শেখ মুজিবও দেখেন যে, বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে তিনি 'জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির' অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হচ্ছেন।(২৭) তাই তিনি এক নতুন সাংবিধানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবতে শুরু করেন। আর এই পটভূমিতেই ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতি বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রপতিশাসিত

সরকার প্রবর্তন করেন এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের সকল দল বিলুপ্ত করে এক জাতীয় দল হিসেবে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, সংক্ষেপে বাকশাল কায়েম করেন।

বাকশাল গঠনের উদ্দেশ্য

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত হয়ে বা মস্কোর পরামর্শ নির্দেশ-উপদেশ মেনে নিয়ে নয়, আবার সিপিবি-ন্যাপ (মোজাফফর)-এর পরামর্শেও নয়, বরং মূলতঃ উগ্র পিকিংপন্থী দলগুলোর 'সশস্ত্র বিপ্লবের' নামে ব্যাংক লুট, থানা লুট, ফাঁড়ি লুট, রাতের অন্ধকারে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যা প্রভৃতি কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করলে বঙ্গবন্ধু বাধ্য হয়েই একদলীয় শাসন বাকশাল কায়েম করেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু নিজের মুখেই বলেছেন : "স্বাধীনতার পর আমাদের কি দশা হল? ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা পেলাম, এবং রক্তের বিনিময়ে পেলাম। সাড়ে সাত কোটি লোক, ৫৪ হাজার স্কোয়ার মাইল। সম্পদ বলতে কোন পদার্থ আমাদের ছিল না। সমস্ত কিছু ধ্বংস, আমরা কিন্তু চেষ্টা করলাম। ঠিক আছে, আমরা একদম যাকে বলে ফ্রি-হ্যান্ড দিয়ে দিলাম। আচ্ছা বলো, আচ্ছা করো, আচ্ছা দল গড়ো, আচ্ছা লেখো, আচ্ছা বক্তৃতা করো, বাধা নাই, ফ্রি-হ্যান্ড।... কিন্তু দেখতে পেলাম কী? আমরা যখন এই পন্থায় এগুতে শুরু করলাম, বিদেশী চক্র এদেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং তারা এদেশের স্বাধীনতা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করল এবং ফ্রি-স্টাইল শুরু হয়ে গেল। হুড়হুড় করে বাংলাদেশে অস্ত্র আসতে আরম্ভ করল। দেশের মধ্যে ধ্বংস, একটা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। এছাড়া আরও দেখা গেল : যাদের আমরা এ সমস্ত ভোগ করতে দিলাম তারা রাতের অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করলো। কখন আমরা বলেছি যে, বাবা ঠিক আছে, পাঁচ বছর পরে ইলেকশন হবে। ইলেকশন কর। ইলেকশনে যদি ডিফিট খাই, আর একজন এসে বসবে।... তা না করে রাতের অন্ধকারে ইলেকটেড মেম্বার অব পার্লামেন্ট, তাঁদের হত্যা করা হল। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যুদ্ধ করেছেন, দেশ ত্যাগ করেছেন, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যাদের সম্পত্তি, তাদের রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হল। মোট কয়েক হাজার কর্মীকে হত্যা করা হল। যাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবেযুদ্ধ করেছে, মুক্তিবাহিনীর ছেলে, তাদের হত্যা করা হল। চরম ষড়যন্ত্র। এত অস্ত্র উদ্ধার করি, তবু অস্ত্র শেষ হয় না। এই রাজনীতির নামে হাইজ্যাক, এই রাজনীতির নামে ডাকাতি।... রাজনীতির নামে একটা ফ্রি-স্টাইল শুরু হয়ে গেল। নব্য, কিছুদিন আগে, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটা দেশে এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না।"(২৮)

বঙ্গবন্ধু কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁর রাজনৈতিক মানস। প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীয় ভাষায়, পাকিস্তানী রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল মুজিবের রাজনৈতিক দৃষ্টি, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা।(২৯)

তিনি উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন(৩০) বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গরীব-দুঃখী ও খেটে-খাওয়া মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথাও ভাবতেন। তবে তাঁর দৃষ্টিতে এই সমাজতন্ত্র মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বা শ্রেণী সংগ্রামভিত্তিক সমাজতন্ত্র ছিল না বরং এটা ছিল অনেকটা বৃটেনের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মত। প্রফেসর জিল্লুর রহমান খান-এর ভাষায : The socialist element of Mujibism is more closely associated with the democratic socialism of Great Britain and India rather than the Marxist socialism of the former Soviet Union or the People's Republic of China,"(৩১) তাই স্বাধীনতার পর সংসদীয় গণতন্ত্র দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল সাধনে ব্যর্থ হলে তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেন এবং শুধু দেশের কল্যাণের কথা ভেবেই বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে দেশে একদলীয় শাসন তথা বাকশাল কায়েম করেন। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বঙ্গবন্ধুর 'একদলীয় শাসন'–এর ধারণাটির মধ্যে ছিল বেশ নতুনত্ব। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির মত সুশৃঙ্খল ও দৃঢ় আদর্শিক চেতনার ভিত্তিতে বাকশাল গঠন না করে বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন মতের মানুষকে এর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন যাতে সবাই এক জায়গায় সমবেত হয়ে সম্মিলিতভাবে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন :... এক গ্রুপ আমরা পলিটিশিয়ান হয়ে গেলাম। এক গ্রুপ আমরা বুদ্ধিজীবী। এক গ্রুপ স্কুল-টিচার, যারা এই ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে আসতে চাই না। এক গ্রুপ সরকারি কর্মচারী হয়ে গেলাম, কেউ অমুক হয়ে গেলাম। আর কিছু সংখ্যক থেকে গেলাম রাজনীতিবিদ। কিন্তু 'একচুয়াল' যেটা 'পিপল', সমস্ত একতাবদ্ধ করতে না পারলে সমাজের দুর্দিনে দেশের মঙ্গল হতে পারে না। সেজন্য আমরা চিন্তা করলাম সমাজের যে যেখানে আছেন, বুদ্ধিজীবী হন, ইঞ্জিনিয়ার হন, সরকারি কর্মচারী হন, রাজনীতিবিদ হন, ল-ইয়ার হন–কারণ আমার সমাজে তো শতকরা ২০ জনের বেশি শিক্ষিত নন, এর মধ্যে সমস্ত লোককে একতাবদ্ধ করে দেশের মঙ্গলের জন্য যদি এগিয়ে যেতে না পারি, তবে দেশের মঙ্গল করা কষ্টকর হবে। সেজন্য নতুন সিস্টেমের কথা বহুদিন ধরে চিন্তা করেছি।... আর একটা জিনিস আমি 'মার্ক' করলাম। সেটা হল এই যে, একদল বলে আমরা পলিটিশিয়ান,

একদল বলে আমরা 'ব্যুরোক্রেট'। তাদের এ্যাটিচ্যুড হলো : টু হার্ট টু ডিসক্রেডিট দি পলিটিশিয়ান। 'পলিটিশিয়ানরা' তাদের 'স্ট্রেংথ' দেখবার জন্য বলতো যে, 'অল রাইট' গেট আউট। এই নিয়ে সমস্ত দেশ একটা ভাগ ভাগ অবস্থার মধ্যে থাকত। এই সন্দেহটা দূর করা দরকার। দূর করে সকলেই যে এক এবং সকলেই যে দেশকে ভালবাসে এবং মঙ্গল চায়, আমার সমাজে যে সমস্ত জ্ঞানী-গুণী লোক আছেন তাদের নিয়ে আমার একটা 'পুল' করা দরকার। এই পুল আমি করতে পারি, যদি আমি নতুন একটা 'সিস্টেম' চালু করি, একটা নতুন দল সৃষ্টি করি— জাতীয় দল, যার মধ্যে একমত, একপথ, একভাব, এক হয়ে দেশকে ভালবাসা যায়। যারা বাংলাদেশ ভালোবাসে তারা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে পারো। এজন্য আজকে এটা করতে হয়েছে।" (৩২)

তবে বঙ্গবন্ধুর এই বাকশাল কর্মসূচি কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। তিনি এটা গ্রহণ করেছিলেন অল্প সময়ের জন্য এবং আবার তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফিরে যেতেন।(৩৩)

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন :... দেশের অবস্থা যে পর্যায়ে গেছে, তাতে আগামী নির্বাচন আওয়ামী লীগের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে। ২৫ থেকে ৩০টির বেশি আসন আমরা পাব না। তখন জামায়াত অন্যান্য স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির সঙ্গে জোট বেঁধে আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে কচু-কাটা করবে। এ অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষার জন্য আমি এই পথ নিয়েছি এবং এটা অত্যন্ত সাময়িক। ১৯৮০ সালের মধ্যে বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও তেল আমরা আহরণ করতে পারবো। এতে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে উন্নয়ন কর্মকান্ড জোরদার করা সম্ভব হবে। ১৯৮০ সালের মধ্যেই আমি বাকশাল থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনবো। সংবিধানকে আবার সংশোধন করবো। যদিও বাকশাল করেছি সংসদে আইনের মাধ্যমে এবং একই আইনের মধ্যে বিধান রেখেছি আমি আমার একক সিদ্ধান্তে বাকশাল থেকে ফিরে এসে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করতে পারবো।"(৩৪)

বস্তুত, বাকশাল কর্মসূচি ছিল বঙ্গবন্ধুর কাছে একটি পরীক্ষামূলক বিষয়, কোন স্থায়ী বিষয় নয়। তিনি এই দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের সংকট নিরসনের জন্য এটা সাময়িকভাবে প্রয়ে গ করেছিলেন মাত্র। তাই তিনি বলেছেন : "আমি ফেরেস্তা নই। শয়তানও নই। আমি মানুষ, আমি ভুল করবোই। আমি ভুল করলে আমার মনে রাখতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি রেকটিফাই করতে পারি, সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গো ধরে বসে থাকি যে, না, আমি যেটা করেছি সেটাই ভালো–দ্যাট কানট বি হিউম্যান বিইং। ফেরেস্তা হইনি

যে সবকিছু ভালো হবে। এই সিস্টেম ইনট্রোডিউস করে যদি দেখা যায় যে, খারাপ হচ্ছে, অল রাইট রেকটিই ইট। কেননা আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে।"(৩৫)

এভাবে দেখা যাচ্ছে, বাকশাল কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর উপর সোভিয়েত সরকার ও তার সমর্থনপুষ্ট সিপিবি, ন্যাপ (মোজাফফর) ও আওয়ামী লীগের একটি অংশের চাপ কিছুটা থাকলেও মূলতঃ দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। আর এই সংকট থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বাধ্য হয়ে তিনি বহুদলীয় ব্যবস্থা বিলোপের সিদ্ধান্ত নেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে একদলীয় ব্যবস্থা বাকশাল কায়েম করেন। বাকশাল কায়েমের লক্ষ্যে সংসদে চতুর্থ সংশোধনীর উপর ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি তাই বলেন : "আজকের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই।... যে নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি তাও গণতন্ত্র। এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই... এক নম্বর কাজ হবে, দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করা...সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য।... এই সংসদের ৪ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে, হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাকে। যাদেরকে অধিকার দিয়েছিলাম তারা কখনও তার নিন্দা করেনি। তারা অস্ত্র দিয়ে মোকাবেলা করতে চায়। অধিকার যদি ভোগ করতে হয় তাহলে তোমার দায়িত্বও আছে। সে কথা ভুললে চলবে না।"(৩৬)

বঙ্গবন্ধু আরও বলেন : "বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চক্রান্তের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। যে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি সেই রক্ত দিয়েই তা রক্ষা করবো। আমাদের রক্ত থাকতে এই স্বাধীনতাকে নস্যাৎ হতে দিব না।... বিদেশ হতে সাহায্য-অর্থ এনেছি কিন্তু তারা (দুর্নীতিবাজরা) চুরি করে খেয়েছে। যারা এসব করে তাদেরকে উৎখাত করতে হবে।"(৩৭)

বাকশাল কর্মসূচি গ্রহণের পর দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটতে থাকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও কমতে থাকে।(৩৮) কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলে বাকশাল কর্মসূচির বিলুপ্তি ঘটে।

বাকশাল কর্মসূচি

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একদলীয় ব্যবস্থা তথা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল : (১) উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, (২) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, (৩) দুর্নীতি, ঘুষ, কালোবাজারী, চোরাচালান প্রভৃতি

সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমন করা এবং (৪) ঐক্যবদ্ধভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য কাজ করা। আর এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য তিনি কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে ক. একটি একক 'জাতীয় দল' গঠন; খ. জেলা প্রশাসন পুনর্গঠন এবং গ. গ্রাম সমবায় প্রবর্তন।(৩৯)

ক. জাতীয় দল (বাকশাল)

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হবার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং স্বীয় ক্ষমতাবলে ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একক জাতীয় দল গঠন করেন। ফলে সেদিন থেকে দেশে আওয়ামী লীগসহ অপরাপর সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটে। রাষ্ট্রপতি মুজিব স্বয়ং বাকশালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং বাকশাল পরিচালনার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতি, স্পীকার, মন্ত্রীবর্গ এবং পূর্বতন আওয়ামী লীগের সকল সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ 'বাকশাল' এর সদস্য নিযুক্ত হন।

অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়া অন্যান্য সকল কমিটিকে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে 'বাকশাল'-এর কমিটিরূপে কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হয়।(৪০) আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, 'বাকশাল'-এর অস্থায়ী কার্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এই ব্যবস্থা ১৯৭৫ সালের ৬ জুন পর্যন্ত বহাল থাকে। ১৯৭৫ সালের ৭ জুন বঙ্গবন্ধু 'বাকশাল-এর গঠনতন্ত্র জারি করেন এবং ঐদিন বাকশালের অন্যান্য কমিটিও ঘোষিত হয়।

বাকশাল-এর সাংগঠনিক কাঠামো

দলের গঠনতন্ত্র অনুসারে বাকশাল ছিল একটি সোপানভিত্তিক সংগঠন। সাত-স্তরবিশিষ্ট কমিটি/কাউন্সিল নিয়ে দল গঠিত হয়। দলের চেয়ারম্যান ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

দলের সাত-স্তর ছিল নিম্নরূপ : ১. নির্বাহী কমিটি, ২. কেন্দ্রীয় কমিটি, ৩. দলীয় কাউন্সিল, ৪. জেলা কমিটি, ৫. জেলা কাউন্সিল, ৬. থানা/ আঞ্চলিক কমিটি, ৭. ইউনিয়ন/ প্রাথমিক কমিটি।(৪১)

চেয়ারম্যানসহ অনুর্ধ্ব ১৫জন সদস্য নিয়ে বাকশালের নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। সদস্যগণ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্য দিয়ে চেয়ারম্যান কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্য দিয়ে চেয়ারম্যান দলের সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সম্পাদক মনোনীত করতেন। নির্বাহী কমিটি ছিল দলের 'সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতার' অধিকারী।

বাকশালের সংসদীয় দল কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকত। নির্বাহী কমিটি সাধারণত প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে মিলিত হত।

নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হত। মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ দলীয় কাউন্সিল কর্তৃক ৫ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হতেন। তবে ১৯৭৫ সালের ৭ জুন তারিখে গঠিত প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১১৫ এবং সকল সদস্যই চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি একাধারে দলীয় কাউন্সিল এবং দলের চেয়ারম্যানের নিকট দায়ী ছিল। সাধারণত কেন্দ্রীয় কমিটি বছরে দু'বার বৈঠকে মিলিত হত এবং নির্বাহী কমিটির কার্যকলাপ ও দলের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত রিপোর্ট শ্রবণ করতো। দলীয় কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস ও জনস্বার্থ সম্পর্কিত অন্যান্য সংগঠনের কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করাই ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্ব।

দলীয় কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যাও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হত। কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন : ক. নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য, খ. কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য, গ. নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোটা অনুসারে জেলা কমিটি, অঙ্গ সংগঠন ও প্রাথমিক কমিটিসমূহ কর্তৃক এবং ঘ. চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দলের অনূর্ধ্ব ৫০ জন 'পূর্ণসদস্য'। দলীয় কাউন্সিল পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হত এবং পাঁচ বছরের মধ্যে সাধারণতঃ দু'বার বৈঠকে মিলিত হত। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও অন্যান্য রিপোর্ট বিবেচনা ও দলের মৌলনীতি, কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত এই দলীয় কাউন্সিল। প্রয়োজনে দলের গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচি পরিবর্তনের ক্ষমতাও দলীয় কাউন্সিলের হাতে ছিল।

উপরোক্ত তিনটি কমিটি ছাড়াও প্রত্যেক জেলায় একটি করে জেলা কমিটি ও জেলা কাউন্সিল এবং প্রত্যেক থানা অথবা অঞ্চলে একটি করে থানা কমিটি বা আঞ্চলিক কমিটি এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে ইউনিয়ন কমিটির বিধান ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে, সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সামরিক/বেসামরিক বাহিনীর আঞ্চলিক ইউনিটে 'প্রাথমিক কমিটি' গঠন করা যেত।

জেলা কাউন্সিল জেলার অন্তর্গত থানা কমিটিসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হত। জেলা কাউন্সিল ছিল জেলার সর্বোচ্চ দলীয় সংস্থা। কাউন্সিল পাঁচ বছর মেয়াদকালে মাত্র একবার সভায় মিলিত হত। জেলা কাউন্সিল জেলা কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত রিপোর্টের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো এবং দলীয় কাউন্সিল প্রেরণের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতো। জেলা কমিটি জেলার অন্তর্গত নিম্নতন

কমিটি ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতো। জেলা কমিটি তার কাজের জন্য জেলা কাউন্সিলের কাছে দায়ী থাকতো।

থানা ও আঞ্চলিক কমিটিসমূহ অধীনস্থ ইউনিয়ন ও প্রাথমিক কমিটির দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হত। তারা যেমন নিজেদের কার্যকলাপের জন্য জেলা কমিটির নিকট দায়ী থাকতো, তেমনি তাদের অধীনস্থ ইউনিয়ন ও প্রাথমিক কমিটিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু সরকারি বা আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে বা বেসামরিক বা সামরিক বাহিনীর মধ্যে গঠিত প্রাথমিক কমিটিসমূহ সরাসরি নির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকত।

খ. জেলা প্রশাসন পুনর্গঠন

১৯৭৫ সালের ২২ জুন প্রশাসন পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে সরকার বিদ্যমান মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করে। ফলে জেলার সংখ্যা ১৯ থেকে বেড়ে ৬১-তে দাঁড়ায়। এরপর ৯ জুলাই সংসদে গৃহীত জেলা প্রশাসন আইনে বিধান করা হয় যে, প্রতি জেলায় একজন গভর্নর থাকবেন। গভর্নর বাকশালের সদস্যদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। গভর্নর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী স্বপদে বহাল থাকবেন। তিনি হবেন জেলার সাধারণ ও রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান এবং আদালত ব্যতীত সকল অফিসের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করবেন। বিচারকগণ ছাড়া জেলার সকল কর্মচারী গভর্নরের অধীনস্থ থাকবেন।

গ. গ্রাম সমবায়

১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে সরকার প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠনের কথা ঘোষণা করে। তাতে বলা হয় গ্রামে গ্রাম সমবায় সমিতিগুলো ভূমি-মালিক, ভূমিহীন কৃষক এবং গ্রামের অন্যান্য কর্মক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে। জমির মালিকানা অক্ষুণ্ন থাকবে কিন্তু ভূমি মালিকদের বাধ্যতামূলকভাবে সমবায়ে যোগ দিতে হবে। সমিতির উৎপাদিত পণ্য ভূমি-মালিক, কৃষক ও সরকারের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বণ্টন করা হবে। সরকার ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বছরে ৬০ থেকে ১০০টি গ্রামকে সমবায় পদ্ধতির অধীনে আনয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সে জন্য সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে বাজেটে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।(৪২)

গ্রাম সমবায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বলেন, "শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমবায় সমিতিসমূহের উৎপন্ন সামগ্রী ভূমি-মালিক, কৃষক, সরকার ও সমবায়ের সঙ্গে জড়িত অন্যদের মধ্যে কেবল তাদের উৎপাদনী ক্ষমতার ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে বণ্টন করা হবে।"(৪৩)

মনে করা হয় যে, গ্রাম সমবায়ের ফলে ভূমিহীন কৃষকদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটতো। তাদের কর্মসংস্থান হতো এবং তাদের আর ভূমি-মালিকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হতো না। কারণ সমিতির সদস্য হিসেবে তারা কাজ পেত এবং কাজের ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিকও পেত।

উপসংহার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে একদলীয় শাসন বাকশাল কায়েম করেননি। স্বাধীনতার পর মূলতঃ পিকিংপন্থী দলগুলোর সশস্ত্র কার্যকলাপ বৃদ্ধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, আওয়ামী লীগ নেতাদের একাংশের অযোগ্যতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক বিরোধীদের মিথ্যে অপপ্রচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে দেশ মারাত্মক সঙ্কটের সম্মুখীন হলে বঙ্গবন্ধু বাধ্য হয়েই সংসদীয় ব্যবস্থা রহিত করে একদলীয় শাসন বাকশাল কায়েম করেন। বাকশাল কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি যদিও সোভিয়েত সরকার ও তার সমর্থনপুষ্ট সিপিবি, ন্যাপ (মোজাফফর) ও আওয়ামী লীগের একটি অংশের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তাদের চাপে পড়েই বাকশাল কায়েম করেছিলেন; বরং বলা যেতে পারে দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট দিন দিন জটিল আকার ধারণ করলে সেই সঙ্কট থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বাধ্য হয়েই তিনি বহুদলীয় ব্যবস্থা বিলোপের সিদ্ধান্ত নেন এবং সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। যদিও বাকশাল কর্মসূচি জনচেতনায় বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কাছে এটা ছিল একটি পরীক্ষামূলক বিষয়। দেশের সঙ্কট নিরসনের জন্য এটা তিনি সাময়িকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন মাত্র এবং দেশের অবস্থা একটু স্বাভাবিক হয়ে এলে তিনি আবার বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফিরে যেতেন।

টীকা ও তথ্যসূত্র :

১. ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করেন। এতে বিধান করা হয় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হবে। সেই মোতাবেক ৪৩০ সদস্যবিশিষ্ট একটি গণপরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ 'খসড়া সংবিধান' রচনার জন্য ৩৪–সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি নির্বাচন করে। বিরোধী দল ন্যাপ (মোজাফফর)-এর একজন সদস্য ছাড়া সবাই ছিলেন .আওয়ামী লীগ দলীয়। এই গণপরিষদ এক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশকে একটি সংবিধান উপহার দেয়। নবগঠিত সংবিধানের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিস্তারিত দেখুন, The Bangladesh Gazette Extraordinary, January 11, 1972 Part. I, pp. 47-48; গাজী শামছুর রহমান, বাংলাদেশের সংবিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ১২-১৪।

২. দৈনিক বাংলা, ২১ অক্টোবর ১৯৭২।

৩. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি : সংঘাত ও পরিবর্তন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪), পৃ. ৮৭।

৪. আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা (ঢাকা, পড়ুয়া, ১৯৯৭) পৃ. ৯৩।

৫. দৈনিক বাংলা, ১৯ ২৩ ও ২৯ অক্টোবর, ১৯৭২।

৬. সিদ্দিকুর রহমান, নির্মল সেন প্রমুখ শ্রমিক নেতা ১৯৩৯ সালের ২৯ আগস্ট শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল গঠন করেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকে এই দল চরম লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে। এই দলের মতে প্রত্যেক দেশেই একদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে ভিন্ন ভিন্ন পথে। কোন দেশকে অনুসরণ বা অনুকরণ করে নয়, বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজস্ব পথে এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত দেখুন, আমজাদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯।

৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর, ১৯৭২।

৮. দৈনিক বাংলা, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭২।

৯. The Bangladesh Observer, 19 October, 1972; দৈনিক বাংলা, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭২

১০. দৈনিক বাংলা, ১৭ অক্টোবর, ১৯৭২।

১১. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।

১২. ঐ, পৃ. ৯৫।

১৩. ১৯৬৭ সালে মাওবাদী কিছু তরুণ সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে ঢাকায় মাও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রুপটি পরে (১৯৬৮) 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন' গঠন করে। এরপর ১৯৭১ সালের ৩ জুন বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠির পেয়ারাবাগানে অনুষ্ঠিত এক গোপন সম্মেলনে সিরাজ শিকদার পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন বিলুপ্ত করে ঐ তারিখেই 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি' গঠন করেন। সিরাজ শিকদার দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাও সেতুং-এর আদর্শে বিশ্বাসী এই দলটি গুপ্ত সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত এক দলিলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে 'সম্প্রসারণবাদী' ভারতের সেবাদাস হিসেবে চিহ্নিত করে অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়। বিস্তারিত দেখুন, The Bangladesh Gazette Extraordinary, January 11, 1972 Part. I, pp. 47-48; জগলুল আলম, বাংলাদেশ বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-৮৯ (ঢাকা: প্রতীক, ১৯৯০), পৃ. ৮৮-৮৯। আমজাদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।
Md. Nurul Amin, "Maoism is Bangladesh : the Case Study of the East Bangla Sarbohara Party", (Asian Survery, Vol, XXVI, No. 7, July 1988, pp. 759-760;

১৪. দেবেন সিকদার ও আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) যারা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)-তে যোগদান না করে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে পৃথকভাবে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে। কমরেড দেবেন সিকদার দলের সভাপতি এবং আবুল বাশার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে 'বিশ্ব সর্বহারার অবিচ্ছেদ্য অংশ, বাংলাদেশ শ্রমিক শ্রেণীর সর্বোচ্চ শ্রেণী-সংগঠন ও রাজনৈতিক দল এবং তার অগ্রগামী বাহিনী' বলে তার গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করে। তাছাড়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সেতুং-এর চিন্তাধারাকে ইহা দলীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করে। পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গঠনতন্ত্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ধাপে ধাপে সমাজকে উন্নত করে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ায় কথা বলা হয়। বিস্তারিত দেখুন, আমজাদ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

১৫. Stanley Wolpert, Zulfie Bhutto of Pakistan : His Life and Times (London : Oxford University Press, 1993), P. 248.

১৬. ড. এম. আমিনুর রহমান, "বাংলাদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় পার্লামেন্টের কার্যকারিতা (১৯৭৩-১৯৮২) : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা", সামাজিক বিজ্ঞান জার্না, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্টম সংখ্যা, ২০০৩, পৃ. ৬৬।

১৭. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই, (ঢাকা; অবসর প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ৬৫।

১৮. ঐ, পৃ. ৬৬।

১৯. মতিউর রহমান, তৃতীয় বিশ্বে চীনের বিশ্বাসঘাতকতা, (ঢাকা: প্রাচ্য প্রকাশনী, ১৯৭৯), পৃ. ৮১।

২০. ঐ, পৃ. ৮২।

২১. ড. এম. আমিনুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

২২. মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

২৩. Muhammad Shahidullah, Ibid, p. 176

২৪. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

২৫. আবু জাফর মোস্তফা সাদেক, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন ইতিহাস ও সমীক্ষা (ঢাকা : চলন্তিকা বই ঘর, ১৯৮৭), পৃ. ৭৬-৭৭।

২৬. বিস্তারিত দেখুন, অজিত কুমার দাস, "বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি : অতীত ও বর্তমান", অপ্রকাশিত এম. ফিল, থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮-৬০।

২৮. শফিকুল আজিজ মুকুল (গ্রন্থনা), বাকশাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু (ঢাকা : লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৯) পৃ. ৫০-৫১।

২৯. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ১২।

৩০. Azizul Haque, "Politics in Bangladesh : Confiict and Confusion" in Mohabbat Khan and Syed Anwar Husain (ed.), Bangladesh Studies : Politics, Administration, Rural Development and Foreign Policy, Center For Administrative Studies, University of Dhaka, 1986, p. 5.

৩১. Zillur R. Khan, Martial Law to Martial Law : Leadership Crisis in Bangladesh (Dhaka : University Press Limited, 1984), pp. 85-114.

৩২. শফিকুল আজিজ মুকুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬।

৩৩. তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতাদের সাক্ষাৎকারের জন্য দেখুন, সাপ্তাহিক

মেঘনা, ২৩ জানুয়ারি এবং ৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. ১৯-৩১; তারেক শামসুর রেহমান, "বাকশাল ব্যবস্থা কি সীমিত সময়ের জন্য ছিল?" সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১৩; আবদুল গাফফার চৌধুরী, "সেনা-শাসনের কথা-৮ : বাকশাল কেন এবং কি উদ্দেশ্যে গঠন করতে হয়েছিল", ভোরের কাগজ, ১৫ জানুয়ারি ২০০৫।

৩৪. মিজানুর রহমান চৌধুরী, রাজনীতির তিন কাল (ঢাকা : হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, তারিখবিহীন), পৃ. ১৬০-১৬১।

৩৫. এম, ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২-২৩৪।

৩৬. দৈনিক বাংলা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫; আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায় , প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

৩৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৫; দৈনিক বাংলা, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৫।

৩৮. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

৩৯. দৈনিক বাংলা, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৫।

৪০. আজাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫; দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫।

৪১. বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)-এর গঠনতন্ত্রের পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুন, ১৯৭৫।

৪২. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ মার্চ, ১৮৭৫।

৪৩. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত।

১৯৭৫ সালে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পটভূমি

ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া

১৯৭৫ সালের ৩ জানুয়ারি সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর প্রথম চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছিল সিরাজ শিকদারের পতন। ১ জানুয়ারি (১৯৭৫) মাওবাদী উগ্র-বামপন্থী দল, 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি' প্রধান সিরাজ শিকদারকে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য যে, সিরাজ শিকদার সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করে শ্রেণীমুক্ত "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" কায়েমের সংকল্প নিয়ে ১৯৭২ সালে গঠন করেন গুপ্ত সংগঠন 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি'। গুপ্তহত্যা, রাহাজানি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ফাঁড়িতে সশস্ত্র হামলা, খাদ্য ও পাটের গুদামে অগ্নিসংযোগ, খাদ্যদ্রব্য বহনকারী পরিবহন ধ্বংস, ইত্যাদি সহিংস নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগ ছিল পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে। ২ জানুয়ারি বিকেলে বঙ্গবন্ধুর বাসায় গেলে প্রথমে জানতে পারি যে, পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন অবস্থায় সিরাজ শিকদার পুলিশের গুলিতে নিহত হন। যাহোক, পরের দিন অর্থাৎ ৩ জানুয়ারি (১৯৭৫) তারিখে পুলিশের এক ভাষ্যে বলা হয় যে, নিজের দলের একটি গুপ্ত ঘাঁটি চিনিয়ে দেয়ার জন্য পুলিশ গাড়িতে করে সাভারের দিকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাবার সময় সিরাজ শিকদার পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। অতঃপর ঘটনাটির ব্যাপারে তদন্ত করার জন্যে সরকার একটি কমিটি গঠন করে।

২ জানুয়ারি (১৯৭৫) তারিখে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় শ্রমিক লীগের নেতা আবদুল মান্নানকে। ৩ জানুয়ারি তারিখে জরুরী অবস্থা আইনবলে জরুরী ক্ষমতা বিধি-বিধান জারি করা হয়। উক্ত বিধি-বিধানে নাশকতা, সন্ত্রাসী ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, চোরাচালানী, কালোবাজারী এবং গুপ্তহত্যার মতো অপরাধের দায়ে দোষী ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং এই সব সমাজবিরোধী কাজের দমনে সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। ৪ জানুয়ারি তারিখে খাদ্য বিভাগ ও বিজি প্রেসের মোট ৪৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এক লাখ রেশন কার্ড জালিয়াতির অভিযোগে। ৬ জানুয়ারি তারিখে সরকার

জরুরী অবস্থা আইনের আওতায় সারাদেশে সর্বপ্রকার সভা, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, লকআউট অনির্দিষ্টকালের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ৭ জানুয়ারি তারিখে সরকার এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠন করে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স।

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা। আমি আমার বিদেশে উপার্জিত অর্থে একটি নিশান গাড়ি আমদানী করেছিলাম ১৯৭৪ সালে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার কর্মসূচির অধীনে আমার ১৯৭৫-এর মার্চ মাসে (তৎকালীন) পশ্চিম জার্মানী যাওয়া চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হলে আমি উক্ত গাড়িটি আইনসম্মত উপায়ে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিই। এ ব্যাপারে প্রয়োজন হয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি। অতএব উক্ত গাড়িটি বিক্রি করার অনুমতি চেয়ে বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রীর বরাবরে একটি পত্র লিখে তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি নিই।

খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব ঐদিন বিকাল ৩টায় তাঁর আগামসি লেনস্থ বাসায় আমাকে যেতে বলেন। তিনি তখন তাঁর বাড়ির ছাদের লবিতে ছিলেন। সিঁড়ি বেয়ে উপরে যাওয়ার সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এক তরুণ কর্মকর্তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। সম্ভবত তিনি খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজেকে মেজর রশীদ বলে পরিচয় দিলেন। উপরের ছাদের লবিতে পৌঁছে খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময়ের মুহূর্তে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার বড় ছেলে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সেখানে হাজির হন। অতঃপর ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন খন্দকার মোশতাক আহমদের উদ্দেশে কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। এর অল্পক্ষণ পরেই খন্দকার মোশতাক আহমদ মইনুল হোসেনকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "বাবা মইনু, ওয়াজেদ অনেকদিন পর আমার কাছে এসেছে বিশেষ একটা দাপ্তরিক কাজে। অতএব তুমি আজকের মত চলে যাও। আগামীকাল আবার এসো।" ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন চলে যাওয়ার পর আমার গাড়ি বিক্রির প্রয়োজনীয়তার কারণ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে আমি বাণিজ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিটি খন্দকার মোশতাক আহমদকে প্রদান করি। অতঃপর খন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন, "এটি অতি সামান্য ব্যাপার। আগামীকাল অফিসে গিয়ে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবো। এখন এই সুযোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।" অতঃপর খন্দকার মোশতাক আহমদ আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার শ্বশুর যে দেশের সংবিধান পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করেছেন সে সম্বন্ধে তুমি কোন কিছু জান কিংবা শুনেছো কি না? বঙ্গবন্ধুর এটা করা মারাত্মক ভুল হবে।" এর জবাবে আমি বললাম, "আপনি যদি আমাকে খুলে বলেন বঙ্গবন্ধু সংবিধানের কি ধরনের পরিবর্তন ঘটানোর পরিকল্পনা করেছেন তাহলেই তো আমি বুঝতে পারবো সেটা তাঁর ভুল পদক্ষেপ হবে কি না। তবে বঙ্গবন্ধুকে আমি যতটুকু জেনেছি তা থেকে আমার বিশ্বাস যে, তিনি সংবিধানে

এমন কোন পরিবর্তন ঘটাবেন না যার ফলে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ও বিধিব্যবস্থা বিনষ্ট হয়।" আমার এই কথার জবাবে খন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য হয়ে তিনি সবকিছু প্রকাশ করতে পারেন না। যা হোক উপরোক্ত ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তিনি আমাকে পরামর্শ দেন। অতঃপর আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি।

এর দু-একদিন পর আমদানী ও রফতানী বিষয়ক নিয়ন্ত্রকের অফিস থেকে আমাকে উক্ত গাড়িটি বিক্রি করার অনুমতি দেয়া হয় এই শর্তে যে, পরের তিন বছরে আমি আর কোন গাড়ি আমদানী করতে পারবো না। এই শর্ত শিথিল করার আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখে আমি আবার খন্দকার মোশতাক আহমদের বাসায় যাই। তিনি আমাকে আশ্বাস দেন যে, ঐ শর্ত প্রত্যাহার করার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। সেদিনও তিনি বঙ্গবন্ধুর সংবিধান পরিবর্তন করার পরিকল্পনার বিষয়টি উত্থাপন করেন। তখন আমি বললাম, "কাকা, স্বাধীনতার পর থেকে আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষ কথাবার্তা বলি না। আপনি বরঞ্চ শেখ মণির সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ করুন।" এর জবাবে খন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন, "মণিকে বলে কিছু হবে না, কারণ সে নিজেই তোমার শ্বশুরের পক্ষাবলম্বন করছে।" এ কথা বলেই তিনি আবারো আমাকে ঐ বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়ার পরামর্শ দিয়ে বিদায় দিলেন। এরপর আমি আর কখনও খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের বাসায় যাইনি।

১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু কুমিল্লাস্থ সামরিক একাডেমীতে প্রথম শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে বিদায়ী জেন্টেলম্যান ক্যাডেটদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। দেশ থেকে সর্বপ্রকার দুর্নীতি উচ্ছেদ করার তাঁর সংকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "যে দুঃখী মানুষ দিনভর পরিশ্রম করে, তাদের পেটে খাবার নেই, গায়ে কাপড় নেই, বাসস্থানের বন্দোবস্ত নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার। পাকিস্তানীরা আমাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। কাগজ ছাড়া আমাদের কারও জন্য কিছু রেখে যায়নি। আমাদের বিদেশ থেকে ভিক্ষে করে সব জিনিস আনতে হয়। কিন্তু চোরের দল সব লুট করে খায়, দুঃখী মানুষের সর্বনাশ করে। এবার আমি শুধু জরুরী অবস্থাই ঘোষণা করিনি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বাংলাদেশের মাটি থেকে ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, মুনাফাখোর আর চোরাচালানকারীদের নির্মূল করবো।" বাংলাদেশের আর এক শ্রেণীর মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "আর একদল লোক আছে, যারা বিদেশীদের অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে চায়। তারা রাতের অন্ধকারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। একটি লোক কেমন করে যে পয়সার লোভে মাতৃভূমিকে বিক্রি করতে পারে, তা ভাবলে আমরা শিউরে উঠি। যারা বিদেশের আদর্শ বাংলাদেশে চালু করতে চায়, এ দেশের মাটিতে তাদের স্থান হবে না।" স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন মনমানসিকতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু এরপর বলেন, "মনে রেখো, তোমাদের

মধ্যে যেন পাকিস্তানী মনোভাব না আসে। তোমরা পাকিস্তানীদের সৈনিক নও, বাংলাদেশের সৈনিক। তোমরা হবে আমাদের জনগণের। তোমরা পেশাদার বাহিনীও নও, কেবল সামরিক বাহিনীও নও। দরকার হলে তোমাদের আপন হাতে উৎপাদন করে খেয়ে বাঁচতে হবে।" পরিশেষে, বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। এ স্বাধীনতা নিশ্চয়ই টিকে থাকবে। একে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। তবে বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারলে এ স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।"

২০ জানুয়ারি তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণ দেন (তৎকালীন) রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদউল্লাহ। ইতোপূর্বে, ১৮ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক। এই বৈঠকেই বঙ্গবন্ধু সংসদ সদস্যদের কাছে তুলে ধরেন তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক স্কীমের রূপরেখা। উক্ত সভায় তাঁর ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "শতাব্দীর জীর্ণ ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে প্রশাসন যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণ এবং একটিমাত্র রাজনৈতিক প্লাটফরমের পতাকাতলে সমগ্র জাতিকে সমবেত করে সুসংহত ও সংঘবদ্ধ জাতীয় প্রয়াস ছাড়া সংকট থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। খন্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অসংলগ্ন পরস্পরবিরোধী কর্মতৎপরতা নয়–আজ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সকল দেশপ্রেমিক শক্তির নিবিড় একাত্মতা এবং ঐক্যবদ্ধ ও গঠনমূলক সর্বাধিক কর্মপ্রয়াস। কেবলমাত্র একটি শক্তিশালী ও বৈপ্লবিক ব্যবস্থার অধীনেই তা সম্ভবপর।" উল্লেখ্য, ১৯৭৪-এর জুলাইয়ের ৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সংসদীয় দলের যৌথ বৈঠকে 'শোষিতের গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে' প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। ১৯৭৪-এর জুলাই মাসের ১৫ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গদলসমূহের এক সপ্তাহব্যাপী জরুরী সম্মেলনেও বঙ্গবন্ধুর প্রতি 'শোষিতের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' জন্যে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরূপ অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এসব প্রস্তাবসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ জানুয়ারি (১৯৭৫) তারিখের সভায় বঙ্গবন্ধু নতুন সিস্টেম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন।

আওয়ামী লীগের একটি অংশ বঙ্গবন্ধুর এই স্কীমের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। এই গ্রুপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, জেনারেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান, নূরুল ইসলাম মনজুর, নূরে আলম সিদ্দিকী, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন প্রমুখ। জেনারেল (অবঃ) ওসমানী ও নূরে আলম সিদ্দিকী আওয়ামী লীগের ১৮ জানুয়ারি (১৯৭৫) তারিখের বৈঠকে একদলীয় রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। জেনারেল (অবঃ) ওসমানী তাঁর বক্তৃতার এক

পর্যায়ে বলেন, "আমরা আইয়ুব খানকে দেখেছি, ইয়াহিয়া খানকে দেখেছি। আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুজিবুর রহমান খান হিসেবে দেখতে চাই না।" জেনারেল (অবঃ) ওসমানী যখন এই মন্তব্য করেছিলেন বঙ্গবন্ধু তখন মুচকি মুচকি হাসছিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে জেনারেল (অবঃ) ওসমানীকে তাঁর কাছে ডেকে বঙ্গবন্ধু বলেন, "Don't be excited my friend, people are fed up with fiery speeches. They want some revolutionary changes in the social, political and economic system." ২১ জানুয়ারি (১৯৭৫) তারিখে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠকে 'বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে' প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে বঙ্গবন্ধুকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয় সর্বসম্মতিক্রমে। এরপর বঙ্গবন্ধু দ্রুত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন প্রবর্তনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

২৪ জানুয়ারি তারিখে আমি সকাল সাড়ে আটটার দিকে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব এবং বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে মামাশ্বশুর মঈনুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আমার দাপ্তরিক বিষয়ে আলাপ করতে তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসায় যাই। সেখানে পৌঁছে দেখি যে, তিনি শেখ কামালের সঙ্গে আলাপ করছেন। মঈনুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আলাপ শেষে কামাল চলে যাওয়ার সময় ওকে জিজ্ঞেস করেন, "আগামীকাল (২৫ জানুয়ারি) থেকে তোর আব্বা (বঙ্গবন্ধু) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। অতএব এরপর তোরা রাষ্ট্রপতির বঙ্গভবনে না ধানমন্ডিস্থ তোদের নিজেদের বাসায় অবস্থান করবি?" এর জবাবে শেখ কামাল বলেন, "না, না, না, আমরা কোন অবস্থাতেই বঙ্গভবনে যাব না। আমরা ধানমন্ডির নিজেদের বাসাতেই থাকবো।" অতঃপর শেখ কামাল চলে যায়। আমি মঈনুল ইসলাম সাহেবকে উক্ত ব্যাপারটি একটু পরিস্কার ও বিস্তারিতভাবে আমাকে জানানোর অনুরোধ জানালে তিনি বলেন, "তুই দেখছি এ ব্যাপারে কিছুই জানিস না। আগামীকাল থেকে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন-ব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে এবং তোর শ্বশুর (বঙ্গবন্ধু) রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন। সংবিধানের প্রস্তাবিত পরিবর্তনে দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথাও উল্লেখ করা থাকবে।" অতঃপর আমি সরাসরি আমার আণবিক শক্তি কেন্দ্রের অফিসে যাই।

২৪ জানুয়ারি তারিখে আমি বিকেল পাঁচটার দিকে অফিস ত্যাগ করি। গাড়ি চালিয়ে আমি সরাসরি বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাই। বাড়ির গেটের কাছে পৌঁছে দেখি গেটের দরজা বন্ধ। গেটের দরজা খুলতে বললে সেখানে প্রহরারত নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা আমাকে জানায় যে, বাইরের কারো গাড়ি নিয়ে বাড়ির ভেতর যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তখন লক্ষ্য করলাম যে, ঐদিন থেকে বঙ্গবন্ধুর বাসায় পুলিশের অতিরিক্ত হিসেবে সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক সদস্যকেও ডিউটিতে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। আমি নিজের পরিচয় জানালেও তারা আমাকে গাড়ি নিয়ে বাড়ির ভেতর যেতে দিতে সম্মত হলো না। অতঃপর আমার বাসা বঙ্গবন্ধুর বাসার

অতি নিকটে হওয়ায় আমি আমার গাড়িটি আমার বাসায় রেখে আসি। গেটের পকেট দরজা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় ঢোকার সময় দেখি খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে সেখানে এসে পৌঁছেছেন। "কাকা, আসসালামু আলাইকুম" বলে আমি তাঁকে সালাম জানানো সত্ত্বেও মোশতাক আহমদ সাহেব কোন কিছু না বলে গেটের কাছে চলে গেলেন। এর অব্যবহিত পরই খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব আবার গেটের ভেতরে এসে আমাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, "বাবা ওয়াজেদ, আমি দুঃখিত যে আমি তোমার উপস্থিতি খেয়াল করতে পারিনি।" অতঃপর খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব আমাকে গেটের নিকটস্থ আম গাছটির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আগামীকাল তোমার শ্বশুর (বঙ্গবন্ধু) সংবিধানের যে পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছেন, তা করা হলে সেটা শুধু একটি মারাত্মক ভুলই হবে না, এর ফলে দেশে এবং বিদেশে তাঁর ভাবমূর্তিও অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অতএব এক্ষুণি বাড়ির তেতলার বৈঠকখানায় গিয়ে তোমার শ্বশুরকে এ বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করানোর চেষ্টা করো। আমি আমার শেষ চেষ্টা করে বিফল মনোরথে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বাসায় ফিরে যাচ্ছি।" এই কথাগুলো বলেই খন্দকার মোশতাক আহমদ বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে চলে গেলেন। উপরোক্ত কথাগুলো আমাকে বলার সময় খন্দকার মোশতাক আহমদকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। আমার মনে হলো, ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্ভবত তাঁর ভীষণ তর্কাতর্কি ও ঝগড়াঝাটি হয়েছে।

পরদিন, অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি (১৯৭৫) তারিখে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু সংসদে পেশ করেন সংবিধান চতুর্থ সংশোধন বিল। তখনকার সংবিধানে উল্লেখিত দেশের শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য পেশকৃত প্রস্তাবনাকে বঙ্গবন্ধু আখ্যায়িত করেন বাংলাদেশের 'দ্বিতীয় বিপ্লব' হিসেবে। অতি অল্প আলোচনা এবং প্রায় বিতর্কহীন পরিবেশে সংসদে পাস হয়ে যায় চতুর্থ সংশোধন বিল। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহ তখন তাঁর সংসদ ভবন অফিসে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখিত চতুর্থ সংশোধন বিলটি সংসদে পাস হওয়ার অব্যবহিত পর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহ তাতে স্বাক্ষর করেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই তা বলবৎ হয়ে যায়। এই চতুর্থ সংশোধনী বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে নতুনভাবে প্রবর্তিত হলো রাষ্ট্রপতির শাসন-ব্যবস্থা। উল্লেখ্য যে, উক্ত সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীতে দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগ রাখা হয় এবং তৎসংক্রান্ত বিধানটি নিম্নরূপ : "(১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিসমূহের কোন একটা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে অনুরূপ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, রাষ্ট্রে শুধু একটা রাজনৈতিক দল (অতঃপর জাতীয় দল নামে

অভিহিত) থাকিবে। (২) যখন (১) দফার অধীন কোন আদেশ প্রণীত হইবে, তখন রাষ্ট্রের সকল রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং রাষ্ট্রপতি জাতীয় দল গঠন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। (৩) জাতীয় দলের নামকরণ, কার্যসূচি, সদস্যভূক্তি, সংগঠন, শৃঙ্খলা, অর্থসংস্থান এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত সকল বিষয় রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে। (৪) (৩) দফার অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আদেশ সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি জাতীয় দলের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন।" আরও উল্লেখ্য যে, উক্ত সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীতে নিম্নোক্ত বিধানও সন্নিবেশিত হয় : "(ক) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি রাষ্ট্রপতির পদে থাকিবেন না এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে; (খ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হইবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত প্রবর্তন হইতে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকিবেন যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়াছেন।"

জাতীয় সংসদে সংবিধান চতুর্থ সংশোধন বিল গৃহিত হওয়ার পর প্রদত্ত প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী সুদীর্ঘ ভাষণে বঙ্গবন্ধু এই পরিবর্তনের পটভূমি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দাবি করেন যে, এই পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। দেশে বিরাজমান নৈরাজ্য এবং রাজনৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু সংসদকে জানান, "দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, আজ আপনার এই এসেম্বলী বা সংসদের চারজন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। যাঁদেরকে আগে হত্যা করা হয়েছে তাঁরা এই কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর মেম্বার ছিলেন। হত্যা করা হয়েছে গাজী ফজলুর রহমানকে, হত্যা করা হয়েছে নূরুল হককে, হত্যা করা হয়েছে মোতাহার মাষ্টারকে। এমনকি, যা কোনদিন আমাদের দেশে আমরা শুনি নাই যে, নামাযে, (পবিত্র) ঈদের নামাযে (যখন) কোন লোক নামায পড়তে যায়, সেই নামাযের সময় তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে যাঁরা স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে যাঁরা (দেশের) স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে যাঁরা (সুদীর্ঘ) ২৫ বছর পর্যন্ত এই বাংলাদেশে পাকিস্তানী শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কারানির্যাতন ভোগ করেছেন, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। কোন একটি রাজনৈতিক দল যাদের আমরা অধিকার দিয়েছিলাম–তাঁরা কোনদিন এদের কনডেম করেছেন কি? না, তাঁরা কনডেম করেন নাই। তাঁরা মুখে বলেছেন যে, তাঁরা অধিকার চান। তাঁরা মিটিং করেছেন, সভা করেছেন, (রাজনৈতিক) পার্টি গঠন করেছেন। কিন্তু তারা কি করেছেন? আমাদের সংবিধানে অধিকার দেয়া আছে, ভোটের মাধ্যমে আপনারা সরকার পরিবর্তন

করতে পারেন– এই ক্ষমতা আমরা দিয়েছিলাম। বাই-ইলেকশন আমরা তিন মাসের মধ্যে দিয়েছি। জনগণ ভোট না দিলে তার জন্য আমরা দায়ী নই। তখন তাঁরা বলেছিলেন, এই সরকারকে অস্ত্র দিয়ে উৎখাত করতে হবে। মুখে বলেছেন, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, নাগরিক অধিকারে বিশ্বাস করেন। কিন্তু গোপনে গোপনে তাঁরা অস্ত্র যোগাড় করেছেন এবং সেই অস্ত্র দিয়ে, যাঁদের কাছ থেকে (আমরা) অস্ত্র নিয়েছি, যাঁরা অস্ত্র দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন–তাঁদেরকে হত্যা করেছে ঘরের মধ্যে গিয়ে।... আজকে আপনারা জানেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এটা একটা 'হট বেড অব ইন্টারন্যাশনাল ক্লিকে' (পরিণত হয়েছে)। এখানে অর্থ আসে, এখানে মানুষকে পয়সা দেয়া হয়। এখানে তাঁরা বিদেশীদের দালাল হন। আজকে একটা কথা এখানে আমাদের ভুললে চলবে না যে, যে-রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, দরকার হলে সেই রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে। স্বাধীনতা নস্যাৎ হতে দেয়া হবে না এবং তাদের মনে রাখা দরকার, আমরা যারা দীর্ঘদিন, পঁচিশ বছর মাথা নত না করে বাংলার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য, এদেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছি, আমাদের রক্ত থাকতে এ দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারোর নেই।"

সর্বপ্রকার দুর্নীতিবাজদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি বহুদিন পর্যন্ত বার বার বলেছি, এ বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করেন না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করেন না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ।"... সংবিধান চতুর্থ সংশোধনী ঘটানোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "(সংসদের) এই সীটে আমি আর বসবো না। এটা কম দুঃখ আমার, স্পীকার সাহেব, তবুও আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি শাসনতন্ত্রকে। কারণ (দেশে) সুষ্ঠু শাসন কায়েম করতে হবে– যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমোতে পারে, যেখানে মানুষ অনাচার-অবিচার থেকে বাঁচতে পারে। (এই) চেষ্টা নতুন–আমি বলতে চাই এটা আমাদের 'দ্বিতীয় বিপ্লব'। এই বিপ্লবের অর্থ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এর অর্থ অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। আমি চাই, এই হাউজ স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে দেশবাসী দলমত নির্বিশেষে সকলকে বলবো, দেশকে ভালোবাসুন, জাতির চারটি প্রিন্সিপলস, (যথা) জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সেকুলারিজমকে ভালোবাসুন। আপনারা আসুন, কাজ করুন, (আমাদের) দরজা খোলা। সকলকে, যারা এই মতে বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেককে সংগঠিত করুন। আসুন, কাজ করুন, দেশকে রক্ষা করুন, দেশকে বাঁচান, মানুষকে বাঁচান, মানুষের দুঃখ দূর করুন। আর দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারীদের উৎখাত করুন।"

অতঃপর দেশের স্বাধীনতা বিরোধী (পাকিস্তানপন্থী) ডানতত্ত্ববাদী সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ মৌলবাদী নিষিদ্ধ দলগুলোর কার্যকলাপ উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন,

"তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলাম আমরা (যা) কোন দেশে করে নাই। স্পীকার সাহেব, আপনিও তো ছিলেন। কোন দেশের ইতিহাসে নেই– পড়েন দুনিয়ার ইতিহাস। বিপ্লবের পর বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে যারা, শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে যারা, যারা দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের কোন দেশে, কোন যুগে ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম– (এদের) সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম। (তখন) বলেছিলাম, দেশকে ভালোবাসুন, দেশের জন্য কাজ করুন, (দেশের) স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নিন, থাকুন। কিন্তু (তাঁদের) অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা এখনও গোপনে বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।"

সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "আজকে এমেন্ডেড কনস্টিটিউশনের (মাধ্যমে) যে নতুন সিস্টেমে আমরা যাচ্ছি এটাও গণতন্ত্র– শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। আমাদের শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাংলার মাটিতে কোনদিন আসতে পারবে না– আমরা এলাউ করবো না। বাংলাদেশকে ভালোবাসবো না, বাংলার মাটিকে ভালোবাসবো না, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসবো না, বাংলার কালচারকে ভালোবাসবো না, তা মানবো না। আর এখন পর্যন্ত, বিকজ (কারণ) আমি ফ্রি ষ্টাইল দিয়ে দিয়েছিলাম– যার যা ইচ্ছে তাঁরা তা লেখেন, কেউ এই নামে বাংলাদেশকে ডাকেন, ও নামে বাংলাদেশকে ডাকেন। বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে যাঁরা লজ্জাবোধ করেন, তাঁদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার। যেমন নাই চোরাকারবারী, ঘুষখোরদের, যেমন নাই দুর্নীতিবাজদের, তেমন নাই ওই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী যাঁরা মনে মনে ভুলে যান, ভুলে যান বাংলার মাটি।"

অতঃপর পরিবর্তিত সংবিধানের অধীনে এবং নতুন ব্যবস্থায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার ও মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "স্পীকার সাহেব, এজন্যে আজ আপনার মাধ্যমে যাঁরা যেখানে আছেন, যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন, সকলকে আমি আহ্বান করবো : আসুন দেশ গড়ি, আসুন দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটাই, আসুন আমরা দেশের মানুষের দুঃখ দূর করি। তা না করতে পারলে ইতিহাস আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করবে।"

এরপর নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমাকে তাঁরা প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন এবং আজকে নতুন সিস্টেমে সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন। সিস্টেম পরিবর্তন করেই আমরা সাকসেসফুল হতে পারবো না। যদি আপনারা চেষ্টা না করেন এবং আপনারা যদি নিঃস্বার্থভাবে– যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলাম, নিঃস্বার্থভাবে পঁচিশ বছর সংগ্রাম করেছিলাম– সেই সংগ্রাম আপনারা না করেন, অন্যায়,

অবিচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে গঠনমূলক কাজে, দেশ গড়ার কাজে, উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে, তাহলে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি এ অনুরোধ করবো : চলুন আমরা অগ্রসর হই–বিসমিল্লাহ করে আল্লাহর নামে অগ্রসর হই। ইনশাল্লাহ, আমরা কামিয়াব হবো।"

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ সমাপ্ত হওয়ার পর জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। অতঃপর বঙ্গবন্ধু পরিবর্তিত সংবিধানের অধীনে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন সংসদ কক্ষেই।

২৬ জানুয়ারি অর্থাৎ তাঁর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পরদিন বিকালে বঙ্গবন্ধু ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি ১৭-সদস্যবিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। এই মন্ত্রিপরিষদে আওয়ামী লীগের খন্দকার মোশতাক আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দু'জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ডঃ এ. আর. মল্লিককে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহ উক্ত মন্ত্রিপরিষদে অর্ন্তভুক্ত ছিলেন এবং তাঁকে ভূমি সংস্কার ও প্রশাসন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো।

২৬ জানুয়ারি (১৯৭৫) তারিখে গ্রেফতার হন মাওবাদী চরমপন্থী নেতা ক্যাপ্টেন আলতাফ। ২৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি পৃথক জেলায় বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে আওয়ামী লীগের জেনারেল (অবঃ) এম.এ.জি, ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীর প্রতিবাদে জাতীয় সংসদ সদস্যের পদ থেকে ইস্তফা প্রদান করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি খুলনার দৌলতপুরের ৪টি পাটগুদাম দুষ্কৃতিকারীদের কারসাজিতে অগ্নিকান্ডে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের প্রতি তাঁদের স্ব স্ব ব্যক্তিগত বিষয় সম্পত্তির হিসাব দাখিল করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) একীভূত হয়ে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। অতঃপর বঙ্গবন্ধুকে এই দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীর বিধি বিধান অনুযায়ী এই দলকে 'জাতীয় দল' বলে আখ্যায়িত করে একটি আদেশ জারি করেন। 'জাতীয় দল' গঠিত হওয়ার ফলে দেশের অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটে। আওয়ামী লীগ, কমরেড মণি সিংহ-এর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ-এর সদস্যগণ সামগ্রিকভাবে 'বাকশালে' যোগদানের জন্য এগিয়ে আসেন। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের ৮জন বিরোধী

সদস্যের ৪ জন প্রবীণ নেতা জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব আবদুস সাত্তার, মিস্টার খোয়াই বেয়োজর এবং সৈয়দ কামরুল ইসলাম, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন 'বাকশালে' যোগদান করেন।

২৬ মার্চ (১৯৭৫) তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' বেশ কিছু স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। প্রায় সোয়া ঘণ্টাব্যাপী সুদীর্ঘ ভাষণের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "...একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের দেশে প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার (দেশের) জায়গা হলো (মাত্র) ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের দেশে প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ (লোক) বাড়ে তাহলে ২৫-৩০ বছরে বাংলায় কোন জমি থাকবে না চাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সেজন্য আজকে আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে। এটা হলো তিন নম্বর কাজ। এক নম্বর হলো, দুর্নীতিবাজ খতম করুন, দুই নম্বর হলো (কল) কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে প্রোডাকশন বাড়ান, তিন নম্বর পপুলেশন প্ল্যানিং আর চার নম্বর হলো, জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্যে একদল (গঠন) করা হয়েছে। যাঁরা বাংলাকে ভালোবাসেন, এর আদর্শে বিশ্বাস করেন, চারটি রাষ্ট্রীয় (মূল) আদর্শ মানেন, সৎপথে চলেন, তাঁরা সকলেই এই (জাতীয়) দলের সদস্য হতে পারবেন। যাঁরা বিদেশী এজেন্ট, যাঁরা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেন, এতে তাদের স্থান নাই। সরকারি কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারবেন, কারণ তাঁরাও এই জাতির একটা অংশ। তাঁদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হওয়ার। এই জন্য সকলে যে যেখানে আছেন একতাবদ্ধ হয়ে কাজে লাগতে হবে।" অতঃপর একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতীয় দলের সাংগঠনিক কাঠামোর সম্ভাব্য রূপরেখা বর্ণনা করে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই জাতীয় দলের আপাততঃ ৫টা ব্রাঞ্চ থাকবে। একটা শ্রমিক ভাইদের অঙ্গদল, কৃষক ভাইদের একটা, যুবক ভাইদের একটা, ছাত্রদের একটা এবং মহিলাদের একটা। এই পাঁচটা অঙ্গদল মিলে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)। আমাকে অনেকে বলেন, কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ হলে আমাদের কি হবে। আমি বলি, আওয়ামী মানে তো জনগণ, (তাই) ছাত্র, যুবক, শিক্ষিত সমাজ, সরকারি কর্মচারী, সকলে মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।"

নতুন রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু বলেন, "সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ-ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন

চাই। আমি জানি, আপনাদের সমর্থন আছে। কিন্তু একটা কথা– এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে যাচ্ছি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে– ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেবো না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাবো– তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান-এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু যে বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলের টাউটদের বিদায় দেয়া হবে। তা না হলে, দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে (এক) হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত কম্পলসারী কো-অপারেটিভ সদস্য হবেন। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, (কিছু) অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে (আর বাকি) অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। দ্বিতীয়তঃ থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। এই কাউন্সিলে রাজনৈতিক কর্মী, সরকারি কর্মচারী যেই হোক, একজন তার চেয়ারম্যান হবেন। এই থানা কাউন্সিলে থাকবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারি কর্মচারী। তার মধ্যে আমাদের কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি থাকবে, যুবক প্রতিনিধি থাকবে, ব্যাংক প্রতিনিধি থাকবে–তারাই থানাকে চালাবে। আর মহকুমা থাকবে না– সমস্ত মহকুমা জেলা হয়ে যাবে। সেই মহকুমায় একটি করে এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল হবে। তার চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী এক সঙ্গে তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিউপিলস রিপ্রেজেনটেশন থাকবে। পার্টি রিপ্রেজেনটেশন থাকবে। সেখানে তাঁরা সরকার চালাবেন। এইভাবে আমি একটা সিস্টেমের চিন্তা করছি এবং করবো বলে ইনশাআল্লাহ আমি ঠিক করেছি। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই।"

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের রূপরেখা উল্লেখ করে উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "আর একটা কথা বলতে চাই, বিচার। বাংলাদেশের বিচার (ব্যবস্থা) ইংরেজ আমলের বিচার (ব্যবস্থা)। আল্লাহর মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে, সেই মামলা শেষ হতে লাগে প্রায় ২০ বছর। আমি যদি উকিল হই, আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে কেস দিয়ে যাই। ঐ মামলার ফয়সালা হয় না। আর যদি ক্রিমিন্যাল কেস হয়, চার বা তিন বছরের আগে শেষ হয় না। এই বিচার বিভাগকে নতুন করে এমন করতে হবে যে, থানায় ট্রাইব্যুনাল করার (ব্যবস্থা থাকবে) এবং সেখানে মানুষ এক বছর বা দেড় বছরের মধ্যে বিচার পাবে।"

CONTRIBUTION OF BANGABANDHU TO CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW

Dr. M Rafiqul Islam

The emergence of Bangladesh as a sovereign and independent state through secession from Pakistan in 1971 marked the beginning of a new era of self-determination in the post-colonial era. The bid for its independent political status started during the British colonial rule in India, succeeded partially with the retreat of the British in 1947, matured into a formidable force during the Pakistani internal colonialism, and culminated into a war of national liberation in 1971 for the creation of Bangladesh. These epoch-making historical events and process through which Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Nation, achieved the historic independence of Bangladesh had a number of discernible impacts on the progressive development of international law. The manner and extent to which Bangabandhu has contributed to the development of new horizons of international law are briefly highlighted and commented upon here. The advent of Bangladesh has influenced the direction and delineated the new frontiers of international law in one of its most perplexing and domineering areas.

After 22 years since its independence, Pakistan held its first national general election. In this election, the Awami League headed by Bangabandhu won a massive electoral victory. It was a democratic expectation that Bangabandhu, as the majority party leader, would be called upon to form the government and become Prime Minister of Pakistan. This legitimate constitutional expec-

tation however turned to frustration by the military oligarchy of Pakistan. Bangabandhu made the Unilateral Declaration of Independence (UDI) of Bangladesh immediately before his arrest on 26 March 1971, which was reaffirmed in the formal proclamation of independence by the Provisional Government of Bangladesh (a six-member cabinet headed by Sheikh Mujib) on 10 April 1971 in Mujibnagar, Kushtia *(International Legal Materials,* 1972, vol.11, p. 119; U Thant, *View from the UN,* New York, 1978, p.420). Was the UDI of Bangladesh illegal in international law? The clear answer is no. Bangabandhu proclaimed UDI quite consistently with international law.

There is nothing in international law to suggest that East Pakistan, which lacked the statehood status until 1970, could not claim such a status. Neither international law nor the UN Charter forbids UDI. The UDI of Bangladesh was a revolutionary act. A revolution per se is neither legal nor illegal but extra-legal, which acquires legality upon success. The parent state Pakistan had a right to take police action for the sake of maintaining law and order and pacifying the UDI of Bangladesh. International law position was to accept the outcome of any conflict/struggle between the assertion of the UDI of Bangladesh and its suppression bid by the parent state Pakistan. Viewed the UDI of Bangladesh from the perspective of a revolution in international law, it was a notification to the rest of the world about the creation of a new state and its governmental authority. The proclamation of UDI was only the starting point of Bangladesh, which was created upon the success of its UDI. And it was this success that transformed an extra-legal revolutionary act into a legal one. The rule of any revolution is the same: might determines the right and nothing succeeds like success. This is true even from the perspective of the constitutional law doctrine of effectiveness (advanced by Kelsen). There is precedent in the history of the constitutional law of Pakistan where the revolutionary access to power by General Ayub Khan in 1958 was judicially endorsed by

the Supreme Court of Pakistan as valid on the basis of the effectiveness of the new regime in *State* v *Dosso* case (1958).

In its bid to make the UDI of Bangladesh successful, the Bangladesh Provisional Government of Bangladesh (then in exile in India) organised and launched resistance movement for the physical liberation of Bangladesh. This counter-use of force against Pakistani troops in East Pakistan was permissible in international law. The 1970 UN Declaration -on Friendly Relations imposes an absolute injunction upon states not to use force for the denial of equal rights and self-determination of its people. If a state resorts to this prohibited use of force, the aggrieved people whose legitimate rights are forcibly denied acquire a consequential right to use counter-force against the state's illegal use of force. In so doing, the people can even seek and receive international support and help (principle V, paragraph 5). Pakistan used illegal force to deny the *Bengalees* of their equal rights and self-determination. In response, the Bangabandhu Government, being the elected representative and on behalf of the people, waged an armed resistance and sought and got international support and assistance, particularly from India. However, the Bangabandhu Government did not have any inherent right to the violent exercise of equal rights and self-determination. Its right to use counter-force emanated from the illegal and violent suppression of its people's right by Pakistan. Similarly, the Indian use of force on 6 December, 1971 in response to Pakistan's pre-emptive air strikes of 3 December 1971 was justified as an act of self-defence under Article 51 of the UN Charter. Therefore, neither the process through which Bangabandhu proclaimed the UDI of Bangladesh, nor the method through which the Bangabandhu Government physically liberated Bangladesh was illegal in international law. The international legal presumption is that the successful assertion of the UDI of Bangladesh regularised all of its acts retrospectively to avoid any legal vacuum in the continuity and stability of Bangladesh from the date of its UDI.

Bangladesh is the first ever successful exercise of self-determination by way of secession from an already existing independent state, the Federation of Pakistan, in the post-colonial era. Major abortive secessionist attempts from parent states prior to Bangladesh were Katanga from the Republic of the Congo in 1960 and Biafra from the Federation of Nigeria in 1966. International law and the United Nations (UN) Charter developed and recognised the right of colonial people to self-determination up to independence in order to eradicate the evils of inhuman domination under colonialism, an institution once created by the international community as a so-called civilising trust. In 1960, the UN unanimously adopted its decolonisation declaration, outlawing colonialism in all its forms and manifestation wherever it occurs. This right to be decolonised was instrumental in the retreat of European colonialism and the political emancipation of many dependent people and their territories all over the world. International law reinforced and facilitated the UN process of decolonisation through the development of a rule, called "the one-time-only rule". The rule entails that the colonial people are entitled to exercise their right to self-determination only once. If a colonial people exercise their right and become independent, the right is deemed to have been exhausted and there will be no such right available to them, as they have their own independent state, whose territorial integrity and political unity must be respected under Article 2, paragraphs 4 and 7 of the UN Charter. In other words, there is no room for the creation of new states from an existing sovereign state. The UN asserted and maintained its position quite consistently at least until 1970 (*UN Monthly Chronicle,* 1970,vol.7:2, p. 36).

The process that Bangabandhu adopted challenged the wisdom and disproved the validity of both the 'one-time-only rule' of international law and the posture of the UN. The main features of colonialism are political domination, economic exploitation, social discrimination, cultural imperialism, oppressions and

human rights violations. These features exist not only in traditionally defined western colonialism but also in independent states. Once these features are practised on a people even in a technically independent state, those people who are bearing the full brunt of subjugation and discrimination are legally colonial and entitled to exercise their right to self-determination. Otherwise, if only the subjugated people of a colony, not the subjugated people in an independent state, is entitled to self-determination, then self-determination becomes the right of the territory, not of the people, which is legally unacceptable. Self-determination is a collective/group human right of a people, which constitutes selfhood to determine its political destiny. Bangabandhu through his political activism, particularly through the famous *six-point program of 1966,* displayed beyond doubt that the *Bangalees* of then East Pakistan endured prolonged Pakistani internal colonialism. The right of the *Bangalees* to self-determination, although exercised once in 1947 against the British colonial rule and became independent, resuscitated as a result of nearly a quarter century of Pakistani neo-colonialism.

The emergence of Bangladesh through the successful exercise of secessionist self-determination was a triumph for the *Bengalees* at the expense of the territorial integrity of Pakistan. In this crisis, two important principles of international law—equal rights and self-determination of peoples and territorial integrity of states—came at the crossroads. This apparent conflict was an artificial one, as there need not be any such conflict. These two principles are complementary to each other. The international legal system is largely state-centric. The territorial integrity is essential for the protection and promotion of human rights and desired value-oriented goals of the people who live within it. In lieu of this state protection, nationals would afford unqualified loyalty and allegiance to the territorial integrity of state.

The right of people to self-determination and the right of state to territorial integrity are recognised rights and both are meant to

be supportive of each other through mutual respect, not denial or exclusion. This mutual respect and equilibrium was lost in Pakistan, where territorial integrity not only failed to protect the human rights of its own nationals but also became oppressive. As a result, a negative feeling towards the territorial integrity of Pakistan developed among the *Bengalees,* who consensually felt that they would have no present or future security within Pakistan. In a bid to secure their security of lives, the *Bengalees* passionately and collectively asserted their independent political destiny under the leadership of Bangabandhu.

Both statehood and its territorial integrity are temporal and their non-negotiability is a myth. The history of the creation of states by breaking empires into states and by the breaking of states and remaking of states does not endorse the inviolability of territorial integrity of a state. The process also contributes to the unification of states, notably the two Vietnams are now united into one state. So is the case with two Germany. To constitute a state, the requirement of a population is indispensable. A land-mass alone without population cannot form .a state. Indeed, the people are the most fundamental basis of a state. Now, if a state does not or cannot protect the interests of its constituent people, for whose interest is its territorial integrity created and pleaded?

Pakistan was entitled to preserve its territorial integrity, which was bound up with its responsibility to respect equal rights and internal self-determination of its citizens. The denial of these rights and the commission of various atrocities and crimes by Pakistan against its own nationals under a veil of territorial integrity resulted in the erosion of its majority people's respect for its territorial integrity. Without the allegiance of the majority people, the territorial integrity of Pakistan became hollow and self-defeating. Its profound disregard for duty created a situation, which undermined its right to territorial integrity. Greater political integrity, however desirable, warrants specific measures to promote it. Its preservation in a multiracial state is based on the

promotion of national unity on even fibre, yielding a common national feeling. Territonial integrity endures if the national unity strengthens. The ruling elites of Pakistan failed to promote national unity both by what they did and by what they failed to do in East Pakistan. The widespread deflection of loyalty in East Pakistan from Pakistani nationalism generated an extra-ordinary crisis in Pakistan's nation-building and political unity.

The Bengalees of East Pakistan were entitled to their equal rights and self-determination within Pakistan by having a right to elect a government of their own choice and a right not to be discriminated against. Instead of receiving support for the realisation of these rights, the Bengalees experienced the ruthless suppression of their rights in Pakistan. The successive and unilateral imposition of unrepresentative authoritarian regimes in defiance of the popular will expressed in the 1970 general election convinced the Bengalees once and for all that they would not be able to exercise their rights through constitutional means. They, therefore, opted for the realisation of their rights beyond constitutionalism regardless of its effect on the territorial integrity of Pakistan. It was indeed the non-compliance by Pakistan with the principle of equal rights and self-determination of its people that engineered the Bangladesh crisis, which eventually ended with the dismemberment of Pakistan.

Following the independence of Bangladesh in 1971, the UN has changed its posture and international law has abandoned its one-time-only rule. As early as in December 1971, the UN Secretary-General in his Annual Report to the General Assembly foreshadowed this shift in the politico-legal position concerning break-away attempts in UN member states. The inviolability of territorial integrity that is oppressive of its own people is no longer non-negotiable. International law now recognises that there is a room for the creation of new state by breaking-away from existing states and that territorial integrity is temporal and divisible. This explains why the post-Bangladesh era witnesses

an increase in the number of successful exercise secessionist self-determination, notably the creation of the Baltic and Balkan states. The territorial integrity and political unity of many dictatorial, undemocratic, and human rights abusive states are vulnerable. Bangladesh and its architect have introduced a new humane element in the creation of new statehood, where human values, dignity and worth are the end and territorial integrity is a means to achieve these ends. This legal coverage of marginalised plight of people within a state has augmented the ongoing human rights movement even further.

Recently, Bangladesh has been experiencing systematic violations of human rights of its citizens on an unprecedented scale. The persistent acts of killing, severing body parts, gang-raping, destroying and looting properties and terrorising innocent people, particularly minorities, have generated worldwide concern. Political killings are now rampant. These barbarous acts warrant our civility, assault our consciousness and challenge our sense of propriety as a civil society. Bangabandhu pursued secularism in cementing the solidarity of non-communal forces in pre-independence era to combat the politics of communal hatred, a legacy of the British divide and rule policy. This unity has steadily eroded in the post-independence era to an extent that has resulted in an alarming surge in religious extremism and anarchy. There is no substitute for galvanising the non-communal forces once again to gather momentum against religious excesses. After the assassination of Bangabandhu by the enemies of secular Bangladesh, his contributions to the lawful emergence of Bangladesh have been undermined by narrow sectarian interest and political cultism. These contributions to the passionate cause of national identity are inseparably linked to the soil of Bangladesh and blood of innumerable *Bangalees,* who sacrificed their cherished lives for a non-communal Bangladesh.

PROSPERITY OF BANGLADESH AS THE FOUNDING FATHER VISUALISED

Azizul Islam Bhuiyan

The development achievements in the long 32 years under successive six governments are no equal to the three-year accomplishments of the Government of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in the immediate post-independence days in Bangladesh.

The gross national product (GNP) inclusive of goods and services plus the gross domestic products (GDP) progressively tilted towards a favorable climate in the immediate aftermath of the scorched-earth policy of the retreating occupation forces of Pakistani adversaries.

The GDP showed a 17 percent rise in the first three years of the Awami League government under the founding father of the nation. Its sectarian achievements in the field of construction, industrial production, housing, communications et cetera were beyond all expectations. Contrary to the post-independence year, the achievements in the post-1975 year can be counted on the fingers of one hand.

The vertical rise in the economic growth in short span of three-and-a-half years of the Bangabandhu government demonstrated the truth that the founding father of the nation spelled out that an independent Bangladesh would be the torch-bearer for newly emerging nations fighting for economic self-reliance.

During the long period of Pakistani subjugation, the welfare of the people of this part of the country was never taken into con-

sideration by the Pakistani rulers in their economic programmes and policies. In the war-ravaged country, for the first time Bangabandhu's Government enunciated a plan for reconstruction and development of the economy taking into account the inescapable political, social and economic realities of Bangladesh.

Bangabandhu liberated Bangladesh against the backdrop of a long and cruel Pakistani subjugation where economic exploitation and disparity of the Bengalees was more severe than political deprivation. The Punjabi rulers, to make their power absolute, always served the cause of an identified affluent coterie, known as "22-families," and worried little about the well-being of the common people.

But the politics of Bangabandhu were totally different. His entire political endeavors were dedicated to the welfare of the oppressed masses. This was clearly evident after liberation of the country, when Bangabandhu nationalised all mills and factories, banks, insurance companies and other financial organisations and economic institutions. This frustrated not only ambitious party leaders, but also a growing business and trade hierarchy, who lent support to the Awami League in the hope of becoming millionaries in the liberated Bangladesh.

The First Year Plan (FYP) was prepared within one-and-a-half years of the liberation of Bangladesh under the dynamic leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. It is unusual for a country to prepare a FYP within such a short time—it was more so in the case of Bangladesh because there was no planning machinery in the country at the time of liberation, nor comprehensive and reliable data on all aspects of the national economy. Still, Bangabandhu's Government launched the FYP, considering the urgent need to provide a sense of direction and to determine the order of priorities., within the frame-work in which coherent and consistent policies and programmes could be formulated.

The political wisdom and the clear concept of Bangabandhu on the prevailing reality of the country was demonstrated through the comments of the Father of the Nation, which he made in putting forward for the FYP. He wrote : "No plan, however well formulated, can be implemented unless there is a total commitment on the part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices."

"All of us," Bangabandhu said, "therefore have to dedicate ourselves to the task of nation-building with single-minded determination." Bangabandhu expressed his firm commitment and hope that the people would devote to this task of economic reconstruction with as much courage and vigor as they demonstrated during the great war of liberation.

Bangabandhu also took the initiative to build up an appropriate cadre of government functionaries, motivated workers and political leadership at the grass-root level who could do the ground work and prepare the country for further social changes in the next phase of the development efforts, which he announced through his programme for "Second Revolution."

Development is painful and slow process—it means present sacrifice for future gains—and is specially painful for a country with very low living standards, such as Bangladesh, where an increasingly significant reliance is to be placed on domestic resources for development. That was why the Father of the Nation, returning from Pakistani captivity, made a clarion call to his countrymen to make some sacrifices for only a time being saying: " I can not give you anything for the next three years." And the nation was convinced and properly realised the inner message of the ca l of Bangabandhu.

"Conditions are to be created to emancipate the toiling masses from the forces of exploitation, every citizen is to enjoy the right to work."... "All citizens are to be assured equal opportunities so that an egalitarian society can be established." "Enjoyment

of unearned income is to be discouraged and there will be limits to private ownership of means of production as prescribed by law"—are some of the cardinal provisions made by Bangabandhu in the country's sacred Constitution, with an objective to establish an exploitation-free society in Bangladesh.

Economists and planners can give only directions, but execution of programmes and policies depends entirely on the political will of the country. The latter depends on the commitment and effectiveness of the leadership, the ability of the party in power to mobilise the people and the dedicated functions of the government machinery.

Inter alia, the economic policies of Bangabandhu were guided towards achieving the objectives of poverty reduction, completion of the post-war reconstruction process, increasing the rate of growth of GDP to at least 5.5 per cent per annum, stopping the rising trend in the general price level, increasing per capita income at the modest rate of 2.5 per cent per annum, reducing dependence on foreign aid, transforming the institutional and technological base of agriculture, controlling the population boom and ensuring a wide and equitable diffusion of income and employment opportunities.

It can not be said that Bangabandhu completely succeeded in achieving the socio-economic emancipation of the people or economic prosperity of the nation, but it is crystal clear that the Father of the Nation fully succeeded in invigorating a ray of hope among the people for prosperous future, which, however faded away following the brutal assassination of Bangabandhu on the fateful night of August 15, 1975.

The father of the Nation, by his supreme sacrifices, bound his nation to the eternal bonds of debt. This debt can only be repaid only through materialising his dream of a poverty and hunger free prosperous "Sonar Bangla" (Golden Bengal) in its true perspective.

বঙ্গবন্ধুর নজিরবিহীন অর্জন এবং অতুলনীয় কৃতিত্ব

আবুল মাল আবদুল মুহিত

১৯৬৯ সালে বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন, "এই দেশের কষ্টিপাথরে এ যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন বাংলাভাষা থাকবে, যতদিন বাংলা থাকবে, বাঙালি থাকবে; গঙ্গা-যমুনা, পদ্মা-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, করতোয়া, কীর্তনখোলা নদীর দুই তীরের মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, যতদিন এদেশের মানুষের হৃদয়ে উত্তাপ থাকবে, ততদিন অন্তরের মণিকোঠায় একটি নাম চির জাগরূক থাকবে– শেখ মুজিবুর রহমান।" মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একান্তই নিজের ত্যাগ-তিতিক্ষা, দৃঢ়তা, সততা, দুঃসাহস এবং জনসেবায় নিবেদনের জোরে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

এই জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয় প্রক্রিয়া ন্যূনপক্ষে ১,৫০০ বছর ধরে চলে। এই ভূখণ্ডের সীমানা নির্ধারিত হতে থাকে সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের সময় থেকে। ১৩৪২ সালে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এই ভূখণ্ডের নামও প্রদান করেন যখন তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি হলেন 'শাহে বাঙালিয়া'। সপ্তম শতাব্দীতেই (বিকল্পে দশম শতাব্দীতে) বাংলাভাষার বিকাশ শুরু হয়। এবং প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে সংগঠিত হয় একটি যৌগিক জাতি যেখানে পৌত্তলিকতা (পেগানিজম) এবং চারটি ধর্মবিশ্বাস– হিন্দু, বৌদ্ধ, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রিস্টান– তাদের নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে। এই ভূখণ্ডে গণতন্ত্রের পত্তন হয় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে যখন রাজা গোপাল দেশাধিপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সম্পৃক্তির সূচনা হয় ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে উনবিংশ শতাব্দীতে পর্দাপণ কালে।

জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া এত দীর্ঘ হলেও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় কিন্তু মাত্র শত বছরের বিষয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা মূর্ত হয় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। কিন্তু তা চাপা পড়ে যায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং এই সংগ্রামের শেষ পর্বে হিন্দু-মুসলিম বিভেদের জাঁতাকলে।

বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয় ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বলগ্নে যখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শরৎচন্দ্র বসু যুক্তবাংলার নক্শা প্রণয়ন করেন। পরবর্তী যে উদ্যোগটি ছিল সেই প্রক্রিয়ার শেষ অধ্যায়টি হয় পূর্ব পাকিস্তানে এবং তা সার্বিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যান শেখ মুজিব। ১৯৪৭ থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৪৮-এ ছাত্রলীগ ও ১৯৪৯-এ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনী বিজয়, ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন এবং ১৯৬০ সাল থেকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন– সব কিছুতেই তিনি ছিলেন সংগ্রামী, ত্যাগী এবং অকুতোভয় সংগঠক ও নেতা। ১৯৬৪-তে তিনি হলেন আওয়ামী লীগের কাণ্ডারী, ১৯৬৬ সালে তিনিই উপস্থাপন করলেন বাংলাদেশের বাঁচার দাবি 'ছয়-দফা' এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে তিনিই মোকাবিলা করলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মিথ্যা অভিযোগ। সামরিক কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বিজয়ী রাষ্ট্রনেতা তখনই হলেন 'বঙ্গবন্ধু' এবং ধাপে ধাপে জাতিকে এগিয়ে দিলেন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে।

১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন পাকিস্তান জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তদানুযায়ী ক্ষমতা গ্রহণের অপ্রতিরোধ্য অধিকার। এই অধিকার যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং পশ্চিমের এক ফ্যাসিবাদী নেতা মানলো না তখনই শুরু হলো বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্যায়। একাত্তরের ৭ মার্চে তিনি ঘোষণা করলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" পাকিস্তান সরকার সংলাপ ছেড়ে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন।

নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী ভারি অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য ভারতের সাহায্য গ্রহণ করে। ৩ ডিসেম্বরে পশ্চিম ভারতে বিমান আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তান পাক-ভারত যুদ্ধের সূচনা করে। পূর্ব রণাঙ্গনে বাংলাদেশ ও ভারত তখন যৌথ কম্যান্ড প্রতিষ্ঠা করে। এই যৌথ কম্যান্ডের হাতে পাকিস্তানের দখলদার সেনাবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বপটে আবির্ভাব হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

অনুপস্থিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। এবং মুক্তিযুদ্ধ হয় তাঁর নামে ও তাঁর প্রেরণায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানে কারাবন্দি ছিলেন। সেখানে রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য তাঁর বিচার হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। তবে বাংলাদেশের বিজয়ের পর পাকিস্তানে ক্ষমতা পরিবর্তন হয় এবং ইয়াহিয়া জান্তার পরিবর্তে জুলফিকার আলী ভুট্টো সামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পাকিস্তান বিশ্বজনমত এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন ও দিল্লি হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে তিনি দেশগড়ার শুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দলের উর্ধ্বে উঠে তিনি হন রাষ্ট্রের মহানায়ক, জাতির পিতা এবং জনগণের বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রথম কর্তব্য হয় বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যাহার। যুদ্ধবিরতির তিনমাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আগ্রহে এবং অনুরোধে ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৯৭২ সালের ১৫ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। এত দ্রুততার সঙ্গে মিত্রবাহিনীর প্রত্যাহার ছিল ইতিহাসে বিরল।

বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী দায়িত্ব হয় পাকিস্তানি দস্যুবাহিনীর হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার বাংলাদেশের জনগণের পুনর্বাসন এবং অর্থনীতির পুনর্গঠন। তিন বছরের শেষে পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে পদক্ষেপ নিতে শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অব্যবহিত পরে ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসেই বাংলাদেশ গণপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গণপরিষদ নয় মাসের মধ্যে জাতিকে একটি চমৎকার সংবিধান উপহার দেয়। বাংলাদেশে পুরনো ঐতিহ্য ধারণ করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়। সেখানে শক্তিশালী স্বশাসিত ও সয়ম্ভর স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থা রাখা হয়। এই সংবিধান বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমুন্নত করে এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগকে ক্ষমতা প্রদান করে। এই সংবিধান আরো নিশ্চিত করে যে, অকারণে কোন ব্যক্তিকে বিচার প্রক্রিয়ার বাহিরে গ্রেপ্তার করা যাবে না।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন অহিংস নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির কূটকৌশলের একজন নিপুণ শিল্পী। তাঁর সারা জীবনের আন্দোলন ছিল জনগণের ক্ষমতায়ন, সামরিক শাসনের উচ্ছেদ ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। দায়বদ্ধ প্রশাসন এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাজাতে সচেষ্ট হন। বাংলাদেশের মজ্জাগত মূল্যবোধ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ, জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র এবং সামাজিক সুবিচার ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বার্থে সমাজতন্ত্র।

একেবারে নতুন করে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয়। বিংশ শতাব্দীতে বিচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ

জাতিরাষ্ট্রেরই উদ্ভব হয়। এজন্য বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে অনেক বেগ পেতে হয়। বাংলাদেশকে নতুনভাবে তার বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তিন বছরে বাংলাদেশ সমুদয় আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন এবং ইসলামি রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থার সদস্যও হয বাংলাদেশ। ১৯৭৪ সালের মধ্যেই ১২১টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ জাতিসংঘেরও সদস্যপদ লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় সম্মানবোধ সম্বন্ধে ছিলেন গভীরভাবে সচেতন। বিধ্বস্ত বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে বিশ্বসভায় নিজের স্থান নির্ধারণ করবে এই ছিল তার অঙ্গীকার। প্রথমেই তিনি পদক্ষেপ নেন যাতে বাংলাদেশ কোন একটি দেশ বা কোন একটি বলয়ের উপর নির্ভরশীল না থাকে। ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারিতে তিনি ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং কারো সঙ্গে বৈরিতা করবে না। তিনি বলেন যে, তিনি বাংলাদেশকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলবেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্দিনে যাতে সকলের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যায় তিনি সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্রত হন।

পাকিস্তানের দেনার ভাগ নেওয়ার জন্য যখন তাঁর উপর শক্তিশালী চাপ আসে তিনি তা নাকচ করে দেন এবং জানিয়ে দেন যে, চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করেও দেশটি কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না। তিনি জানিয়ে দেন যে, যতদিন পাকিস্তান াংলাদেশের উপর তাদের অধিকার পরিত্যাগ না করবে ততদিন পাকিস্তানের দেনার কোন হিস্যা বাংলাদেশ নেবে না। ১৮৭৪ সালে মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদের এক বড় দল বাংলাদেশকে ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে পীড়াপীড়ি করেন। বঙ্গবন্ধুর সাফ জবাব ছিল যে, লাহোরে যেতে হলে প্রথমে তাঁকে পাকিস্তানের কূটনৈতিক স্বীকৃতি পেতে হবে। পাকিস্তান যে দিন স্বীকৃতি দিল তার পরদিন বঙ্গবন্ধু এই সম্মেলনে গেলেন।

মুক্তিযুদ্ধে ভারত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য ও সহায়তার জন্য তিনি উচ্চকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এই দুইটি দেশেই স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁর প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমতার ভিত্তিতে বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং তাতে তিনি সাফল্যও অর্জন করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বশান্তির শক্তিশালী প্রবক্তা, তাঁর কথা ছিল, 'ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি'।

তিনি দেশের সমস্ত জনগণকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর কথা ছিল যে, তিনি তাঁর দেশ ও জনগণকে ভালোবাসেন এবং তাঁর জনগণ তাঁকে ভালোবাসে। বিষয়টি এতই আলোচিত যে, এই সত্যটি ছিল দেশে-বিদেশে সকলের জানা। তিনি

বলতেন যে, 'আমি দক্ষিণপন্থীও নই, বামপন্থীও নই, আমি দেশবাসীর স্বার্থের পক্ষে।' জনগণের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অকুণ্ঠ ও অটুট। এবং এদের ভাগ্যোন্নয়নে ছিল তাঁর আজীবন ব্রত।

দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটি প্রতিবিপ্লব সাধন করে। বিপথগামী হঠকারী কতিপয় সেনা সদস্য অত্যন্ত নৃশংসভাবে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার পরিজন এবং সহকর্মীসহ মোট ১৮ জনকে হত্যা করে এবং দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এই সামরিক ক্যুর অভিশাপ ও কুফল জাতি আজো বয়ে বেড়াচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ এখনও সুইজারল্যান্ড হয়নি। এই সোনার বাংলায় সামরিক শাসনের পৌনপুনিক অভিশাপ এখনো বিলুপ্ত হয়নি। এই সোনার বাংলাদেশে এখনও স্থানীয় স্বশাসনের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন হয়নি। এই সোনার বাংলাদেশে এখনও প্রায় ৪০ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। তারা অর্থনৈতিক মুক্তি অথবা ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা এখনো পায়নি। এখানেই হলো বাংলাদেশের ব্যর্থতা। কিন্তু এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণই হবে বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পেছনে ফিরে দেখা : বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাজ করার বিরল সৌভাগ্য

শাহ এ. এম. এস. কিবরিয়া

১৯৭২ সাল ছিল আমার জীবনে এক স্মরণীয় বছর। এই একটি বছর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। ২৬ জানুয়ারি সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করলাম। এক অনাবিল আনন্দে মন-প্রাণ ভরে গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে সপরিবারে ঢাকা এসেছি। অনেক স্বপ্ন চোখে, অনেক আশা-উদ্দীপনা বুকে। বিশ্বাস করা শক্ত ছিল যে, আমি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দিয়েছি। আবেগাপ্লুত হয়ে ভাবছিলাম, জীবন শুরু করেছিলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরাধীন প্রজা হিসেবে। কর্মজীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে–যে রাষ্ট্রের সঙ্গে সত্যিকারভাবে আমার আত্মার যোগ কোনোকালেই স্থাপিত হয়নি। এসব চড়াই-উৎরাই পার হয়ে সব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে আমি আজ আমার কল্পনা ও স্বপ্নের দেশের অধিবাসী। বার বার মনে হয়েছে, এমন সৌভাগ্য ক'জনের জীবনে ঘটে? বাংলাদেশকে বিশ্ব-মানচিত্রে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ ঢাকায় আমার সমস্যাবলির কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। বাসস্থান নেই। একটা সরকারি বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। ভাগ্যক্রমে শ্বশুরের বাড়িতে নিচের তলা প্রায় পুরোটা খালি ছিল। আপাতত সেখানেই আশ্রয় নিলাম। কন্যা নাজলীর বয়স দশ বছর। বাংলা ঘরে পড়িয়েছি। তাই ঢাকার হলিক্রস স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলো। সমস্যা হলো পুত্র রেজাকে নিয়ে, তার বয়স প্রায় ১৫ বছর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সে অনায়াসে হাইস্কুল পাস করে কলেজে প্রবেশ করতে পারতো, কিন্তু ঢাকায় সমস্যা দেখা দিল। বঙ্গবন্ধুই এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন। সে কাহিনী পরে আসছে।

আবদুস সামাদ আজাদ তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন। নবপ্রতিষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ে চলছে বিভিন্ন পদে পরিবর্তনের পালা। বাঙালি কূটনীতিকরা একে একে দেশে ফিরছেন। চারদিকে তখনো বেশ অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। সদ্য আগত বাঙালি পেশাদার কূটনীতিকদের বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। আমাকে নিয়োগ দেয়া

হয়েছিল মহাপরিচালক (রাজনৈতিক) পদে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো তখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। অফিসে বসার চেয়ার-টেবিল নেই, ফাইলপত্র নেই। কিন্তু আমাদের উৎসাহের ঘাটতি ছিল না। কূটনীতিক জীবনের সীমিত অভিজ্ঞতার আলোকেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। অনেকটা ভারতের অনুকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দু'জন সচিবের পদ সৃষ্টি করা হলো। ভারতে তিনজন সচিব-পদমর্যাদার কূটনীতিক তাঁদের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকেন। অনেকে মনে করলেন, আমরাও দু'জন সচিব নিয়োগ দিতে পারি, এতে দক্ষতা বাড়বে। এই ব্যবস্থা বেশিদিন টেকেনি। পরে আমার সুপারিশেই এই ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছিল। তবে ১৯৭২ সালের প্রথম আট মাস দু'জন সচিব ছিলেন। একজনকে বলা হতো পররাষ্ট্র সচিব; অন্যজনকে সচিব, পররাষ্ট্র বিষয়ক। শেষোক্ত সচিবের ওপর মূলত প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে সিনিয়র কূটনীতিক আবদুল ফাতেহকে পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত করা হয়। তিনি বাগদাদে রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। তিনি নানা ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিদেশে কোনো দূতাবাসে যেতে চাইলেন। তাঁকে প্যারিসে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, যদিও ফ্রান্স তখনো আমাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি। প্রশাসনিক সচিব পদে ছিলেন আবদুল মোমেন। তিনি আর্জেন্টিনায় রাষ্ট্রদূত থাকাকালে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করেন। তিনি কানাডায় হাইকমিশনার পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। আবুল ফাতেহ সাহেবের স্থলে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিয়োগ পান সৈয়দ আনওয়ারুল করিম। তিনি নিউইয়র্কে পাকিস্তান মিশনে উপস্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। আবদুল মোমেন সাহেবের কাছ থেকে ১১ মার্চ ১৯৭২ তারিখে আমি পররাষ্ট্র-বিষয়ক সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করি। অর্থাৎ তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দু'জন সচিব— সৈয়দ আনওয়ারুল করিম ও আমি। করিম সাহেব আমার চাইতে চার বছরের সিনিয়র ছিলেন। মন্ত্রণালয়ে ততদিনে বেশ কয়েকজন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার যোগ্য কয়েকজন বাঙালি কূটনীতিক যোগ দিয়েছেন। ফারুক আহমদ চৌধুরী মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই প্রোটোকল প্রধানের দায়িত্ব পালন করছিলেন। যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে তিনি বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদও তাঁকে পছন্দ করতেন। আমার আরেক বন্ধু আরশাদুজ্জামানও এ সময়ে মন্ত্রণালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও তিনি পেশাদার কূটনীতিক ছিলেন না, প্রেস অ্যাটাচি হিসেবে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জন্য তাঁকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে একজন কূটনীতিক হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। আতাউল করিম, এ. ডাবলু. শামসুল আলম, এ. কে. এইচ. মোর্শেদের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। উপসচিব পর্যায়ে

ফজলুল করিম ও অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি পর্যায়ে মোহাম্মদ জমির ও আফসারুল কাদিরের নাম মনে পড়ছে। কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সবাই একে একে দেশে ফিরে এলেন। মির্জা রশিদ আহমদ, মোহাম্মদ সুলতান, বশিরুল আলম, রেজাউল করিম প্রমুখ মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ বাঙালি কূটনীতিকদের সংখ্যা আসলেই ছিল বড় অল্প।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা ছিল বিজয়ের নগরী। চারদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের আনন্দ-উল্লাস। তাদের গর্বিত পদচারণায় রাজপথ প্রকম্পিত। অবশ্য তখনই বহু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার আবির্ভাব হয়েছিল বলে জনসাধারণের মনে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। বহু রাজাকার তাদের মুখোশ পাল্টে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছিল। বিশেষত বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দেশবাসীর মনে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় সৈনিকরা তখনো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো সুরক্ষিত করছিলেন। তারা অতি সুশৃঙ্খল ও ভদ্র বলেই আমার মনে হয়েছে। আশ্চর্য হয়ে এখন ভাবি, ঢাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনকার তুলনায় অনেক ভালো ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র তখনো ছিল, কিন্তু খুন-রাহাজানির ঘটনা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। শুধু বেশি রাতে রাজপথ নিরাপদ মনে করতাম না। বিদেশি পণ্যের অভাব অবশ্যই ছিলো, কিন্তু মাছ-মাংস, শাক-সবজির অভাব ছিল না। বিদেশি ওষুধ বেশ দুর্লভ ছিলো বলেই মনে পড়ছে। সরকারি কর্মকর্তাদের বেতনের সর্বোচ্চ সীমা এক হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছিল। জরুরি অবস্থায় একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে এই বিধান সবাই মেনে নিয়েছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও কলাবরেটরদের বিভাজন তেমন স্পষ্ট ছিল না। বিদেশে সবার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়া বা প্রকাশ্যে আনুগত্য ঘোষণা করার নানা অসুবিধা ছিল। তাই অল্প কয়েকজন ব্যতীত প্রায় সব বাঙালি কূটনীতিককে বাংলাদেশের চাকরিতে গ্রহণ করা হয়েছিল।

ঢাকা পৌঁছার তিনদিন পরেই আবদুস সামাদ আজাদ আমাকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কূটনীতিক হিসেবে আমার যোগ্যতা বা সুনাম সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু বলেননি, তবে আমার ছাত্রজীবনের কৃতিত্ব সম্পর্কে তিনি জানতেন এবং তা-ই তিনি ফলাও করে বললেন। ওয়াশিংটনে আমার পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগের তথ্যটাও তিনি বঙ্গবন্ধুকে বললেন। বঙ্গবন্ধু হাসিমুখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন্ বিভাগে আমি যোগ দিয়েছি। আমি জবাব দিলাম, মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক পদবিন্যাস সম্পূর্ণ হয়নি। অভিজ্ঞ অফিসারের সংখ্যা খুব কম। আমাকে রাজনৈতিক বিষয়ের মহাপরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বললেন, "তোমাকেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢেলে সাজাতে হবে।" তাঁর হুকুমে মার্চ মাসের ১১ তারিখে আমাকে সচিব হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক

দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এত দ্রুত বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে তা ভাবিনি। আমার সৌভাগ্য–বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিন থেকেই তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেছেন। আমার ওপর তাঁর আস্থা আজীবন অটুট ছিল।

বঙ্গবন্ধু আমার শ্বশুর মরহুম আলী আহমদকে বেশ ভালভাবেই চিনতেন। পঞ্চাশের দশকের শেষপ্রান্তে তিনি দীর্ঘদিন ঢাকার ডিসি ছিলেন— যখন বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। সামাদ আজাদ সাহেবের মুখে তিনি শুনলেন ছাত্র হিসেবে আমার কৃতিত্বের কথা। এসব কথা বঙ্গবন্ধুর মনে নিশ্চয়ই রেখাপাত করেছিল। কারণ পরবর্তী দিনগুলোতে আমার প্রতি বারবার তাঁর স্নেহ ও আস্থার বহিঃপ্রকাশ দেখেছি। শুনেছি, ভাল ছাত্রদের তিনি খুব পছন্দ করতেন। মেধাকে তিনি যথাযোগ্য গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতেন বলেই আমার ধারণা।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার আশায় ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেই সুযোগ পেয়ে গেলাম। তাঁর প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরের তারিখ স্থির হলো ফেব্রুয়ারি ২৯ এবং প্রত্যাবর্তন ৫ মার্চ (১৯৭২)। তার মাত্র মাসখানেক আগে ২৬ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গবন্ধুকে তাদের দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্য এবং অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য এই সফর ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই সফরের প্রভাব ও তাৎপর্য আমরা দীর্ঘকাল আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুভব করেছি। এই সফরের প্রস্তুতির সময় থেকে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ আমার জন্য এক বিরল সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। এই সফরের অভিজ্ঞতা আজো আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই সফর সম্পর্কে অন্যান্য সফরসঙ্গী হয়তো তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন, কিন্তু এই ঘটনা আমরা সবসময় একই দৃষ্টিতে দেখি না। হয়তো আমার বর্ণনার সঙ্গে অন্যদের বর্ণনার হুবহু মিল নাও হতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর সোভিয়েত সফরের জন্য ব্রিফ প্রস্তুত করার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। কেন আমার ওপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তা আমার পরিষ্কার মনে নেই। হয়তো আমিই রাজনৈতিক বিষয়াদির দায়িত্বে নিয়োজিত মহাপরিচালক ছিলাম বিধায় এই কাজ আমাকেই করতে হবে বলে সবাই ধরে নিয়েছিলেন। পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ আনোয়ারুল করিম সফর সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় দেখছিলেন, তবে ব্রিফের প্রস্তুতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। কাজ হাতে নিয়ে দেখি সবকিছুই নতুনভাবে শুরু করতে হবে, কারণ পুরনো কাগজপত্র কিছুই নেই। ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যে ক্ষুদ্র লিয়াজোঁ অফিস ছিল, সেখানে মৌলিক বা ব্যাকগ্রাউন্ডে তথ্যাদি কিছুই ছিল না। এতে দমে যাইনি। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্রিফ তৈরি করার জন্য যেসব তথ্যের প্রয়োজন, তা জোগাড় করতে আমাকে যথেষ্ট

পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তারপরও ব্রিফটি অর্থবহ ও সময়োপযোগী হয়েছিল কি-না, সে বিচার আমার পক্ষে এখন করা শক্ত। বাংলাদেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, ভারত, পাকিস্তান ও চীনসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক এবং ভিয়েতনাম ও মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি সংঘাতকেন্দ্র সম্পর্কে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অবস্থান এই ব্রিফে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ব্রিফটি শুধু পড়েনইনি, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ আমাকে নিয়ে আলোচনাও করেছিলেন। তিনি আমাকে ওই ব্রিফের ভিত্তিতে 'টকিং পয়েন্ট' তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। মস্কোতে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সময় ব্রিফের সংক্ষিপ্তসার 'টকিং পয়েন্ট' বঙ্গবন্ধুর সামনে রাখা ছিল এবং তিনি ওই ব্রিফের মূলধারা অনুসরণ করেই আলোচনা পরিচালনা করেছিলেন। পেছন ফিরে তাকিয়ে ভাবি, আমার জন্য এটা ছিল অবশ্যই এক বিরল সৌভাগ্য।

স্বাধীনতার প্রথম মাসগুলোতে আমাদের অর্থনীতি ছিল এক বিপর্যস্ত অবস্থায়। পরিবহন ব্যবস্থা, বিশেষত বিমান পরিবহনের পরিস্থিতি ছিল শোচনীয়। বঙ্গবন্ধুর সফরের জন্য সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কসিগিন একটি মধ্যমাকৃতির বিমান ইলুশিন-১৮ ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, আরেকটি 'বেক-আপ' বিমানও পাঠানো হয়েছিল। প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর হলেও দলের আয়তন ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পরবর্তীকালে কোনো কোনো সরকারপ্রধান বৃহদাকার বিমান বোঝাই করে দলীয় লোকজন নিয়ে যেভাবে আড়ম্বরের সঙ্গে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করেছেন, বঙ্গবন্ধুর প্রথম সফরে সে ধরনের কিছুই ছিল না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি-চেয়ারম্যান ড. নূরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমদ, পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ আনোয়ারুল করিম, অর্থ সচিব মতিউল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরী, বাণিজ্য সচিব নূর মোহাম্মদ, প্রোটোকল প্রধান ফারুক আহমদ চৌধুরী, বহিঃপ্রচার মহাপরিচালক আরশাদুজ্জামান এবং নিরাপত্তা সংযোগ কর্মকর্তা নুরুল মোমেনের নাম মনে পড়ছে। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামাল আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। বস্তুত বিমানেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার বিনম্র ব্যবহার ও আমার প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কিছুটা অবাক হয়েছিলাম বলতে পারি, কারণ তার সম্পর্কে ওই সময়েও অপপ্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। একটি অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র তরুণকে দেখে আমি ভাবতেই পারিনি তাকে ঘিরে এসব অপপ্রচার কেন করা হচ্ছে। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি, এসবই ছিল পরিকল্পিত চরিত্রহননের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। মস্কোতে সকালবেলা পৌঁছার লক্ষ্যেই আমরা রাত ৯টার পর মুম্বাইর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করি। প্রায় ঘন্টা দুয়েক পর উড়োজাহাজ মুম্বাই বিমানবন্দরে অবতরণ করে। রাত তখন বেশ গভীর, প্রায় মধ্যনিশি। বিমানে

আমরা কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নেমে দেখি এলাহি কাণ্ড। বিশাল এক জনতা বঙ্গবন্ধুর জন্য তুমুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের গভর্নরবৃন্দ ও মন্ত্রীরা সবাই হাজির। বিমানবন্দরের মধ্যেই একটি মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। হর্ষোৎফুল্ল সেই জনতার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে সেই মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো। চারদিকে লোকজন গিজগিজ করছে। সেই কোলাহলের মধ্যে হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর গলা শুনতে পেলাম আমাকে উদ্দেশ করে। তিনি আমাকে বললেন যে, উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তিনি বাংলায় ভাষণ দেবেন এবং আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর বক্তব্য ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হবে। অপ্রত্যাশিত দায়িত্ব মাথায় এসে পড়ল, তবে ঘাবড়ে যাইনি। ভাগ্যক্রমে কাগজ-কলম সঙ্গে ছিল কিন্তু মঞ্চের ভিড়ে কোথায় কাগজ রেখে তার বক্তৃতার সারাংশ দ্রুত লিখতে পারি, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। এ অবস্থাতেই যতটুকু সম্ভব হলো তার বক্তৃতা নোট করলাম। অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতোই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলাম। আমার অনুবাদ কতটা সত্যনিষ্ঠ হয়েছিল জানি না, কারণ ওই অবস্থায় হুবহু অনুবাদ করা সম্ভব ছিল না। তবে স্পষ্ট মনে আছে; বঙ্গবন্ধুর প্রায় ১৫ মিনিটের বক্তৃতা আমি ৭/৮ মিনিটে তরজমা করেছিলাম। বেশকিছু কথা নিশ্চয়ই বাদ পড়েছিল। বিমানে ফিরে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু হাসিমুখে আমাকে প্রশংসা করে বললেন, আমার অনুবাদ নাকি চমৎকার হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, তাঁর উদারতা ও স্নেহের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়েছিলাম, কারণ আমার তখন মনে হচ্ছিল তাঁর বেশ কতগুলো কথা বাদ পড়েছে এবং অনুবাদ আরো সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ হতে পারতো।

পরদিন ভোরবেলা আমরা জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসি (তিফলিস) বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। জর্জিয়া এখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সম্প্রতি জর্জিয়া এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ কঠিন রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ করেছে বলে মনে হয়। সত্তরের দশকে জর্জিয়া ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম রিপাবলিক– সেখানে রাজনৈতিক সংকটের কথা কেউ শুনতে পায়নি। স্ট্যালিনের জন্মভূমি হিসেবেই জর্জিয়ার পরিচিতি ছিলো। তিবলিসিতে আমাদের সংবর্ধনা ছিলো উষ্ণ ও রাজকীয়। খাদ্যসম্ভারে উপচেপড়া টেবিলে প্রাতঃরাশের আয়োজন করা হয়েছিল। জর্জিয়া সরকারের উপরতলার সবাই উপস্থিত ছিলেন সেখানে। দোভাষীদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে এমন পর্যাপ্ত সংখ্যায় বাংলাভাষায় অভিজ্ঞ দোভাষী তৈরি করেছিল, তা আমাদের ধারণা ছিল না। এর ফলে এই সফরে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলাপ-আলোচনা বাংলা ও রাশিয়ান ভাষাতেই হয়েছিল। দ্বিপক্ষীয় আনুষ্ঠানিক আলাপের সময় বঙ্গবন্ধু বাংলায় কথা বলেছেন এবং সোভিয়েত নেতারা রাশিয়ান ভাষায় কথা বলেছিলেন। পাকিস্তানে তখনো ইংরেজির জোর প্রচলন

ছিল। সুতরাং আমাদের কাছে বিষয়টা বেশ ব্যতিক্রমী মনে হয়েছিল। ওই প্রাতঃরাশের টেবিলে ফল-ফলাদির যে বিপুল সমারোহ দেখেছিলাম, তা আজো আমার মনে রেখাপাত করে আছে। আঙ্গুর, আপেল, পিচ ইত্যাদি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ফল। জর্জিয়া এবং তৎসংলগ্ন ককেসাস পার্বত্য অঞ্চল এসব ফলের জন্য বিখ্যাত। আমি ষাটের দশকে তেহরানে কর্মরত থাকার সময়ে এই অঞ্চলের ফলের বিচিত্র সমারোহ দেখেছি। সোভিয়েত আতিথেয়তায় আমরা মুদ্ধ হলাম যখন আমাদের শীতবস্ত্র সরবরাহ করা হলো। আমরা মস্কোযাত্রী কিন্তু ওই এলাকার শীত সম্পর্কে দলের অনেকেরই বাস্তব ধারণা ছিল না, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়ও ছিল না। একটা বড় হলঘরে ভারী ওভারকোট, গরম কোট-প্যান্ট, উলের সোয়েটার ও গরম টুপি ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা ছিল। আমরা পছন্দমতো প্রয়োজনীয় কাপড়গুলো বেছে নিয়েছিলাম। তিবলিসি থেকে মস্কো-প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

১ মার্চ সকালবেলায় প্রায় ১১টার সময় আমরা মস্কোর ভনুকোভা বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। বিমানবন্দরে রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মতো আবেগ-প্লাবিত ঘটনা আমার জীবনে কমই এসেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি মৃদু তুষারপাত ও হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ব্যান্ডের যন্ত্র থেকে যখন বেজে উঠল– আমার সোনার বাংলা তখন সেই সঙ্গীতের সুমধুর ধ্বনি শুনে এবং বিমানবন্দরের দৃশ্যাবলি দেখে আমার মনে হলো, সত্যি বাংলাদেশ আজ বিশ্ব-সমাজে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধু ধীর পায়ে যথাযোগ্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে সেনাসদস্যদের গার্ড অফ অনার পরিদর্শন করলেন। প্রধানমন্ত্রী কসিগিনসহ অনেক মন্ত্রী ও কর্মকর্তা আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। আমার কূটনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, মস্কোতে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে শুধু একজন সরকারপ্রধান হিসেবে নয়, নির্যাতিত জনগণের মুক্তিসংগ্রামের একজন মহান নেতার মর্যাদাই দিয়েছিলেন।

মস্কোতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সফরসঙ্গীদের ইতিহাসখ্যাত ক্রেমলিন প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিরাট প্রাসাদের কোন্ অংশে কী আছে এবং কোথায় কে থাকে জানার উপায় ছিল না। আসলে এটা একটা বিশাল দুর্গ হিসেবেই নির্মিত হয়েছিল। ভেতরে অনেকগুলো প্রাসাদ। আমাদের থাকার ঘরগুলো ছিল আরামদায়ক ও সুসজ্জিত। আহারাদির ব্যবস্থাও ছিল অতি উন্নতমানের। ক্রেমলিনে আমাদের তিনদিনের স্বল্পকালীন অবস্থান ছিল স্বপ্নের মতো। কীভাবে এই তিনদিন কেটে গেল বুঝতে পারিনি। প্রথমদিনেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ ছিল। সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী কসিগিন বঙ্গবন্ধুর সম্মানে নৈশভোজ দিয়েছিলেন। ভোজের মেনু তৈরি করা হয়েছিলো বাংলা ও রাশিয়ান ভাষায়। বেশ

কতোগুলো অপ্রচলিত শব্দ ওই মেনুতে ব্যবহার করা হয়েছিল। Smoked fish-কে ধূমায়িত মৎস্য বা grilled lamb-কে ঝলসানো ভেড়ার মাংস ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখে বেশ মজা পেয়েছি, কারণ বাংলায় এসব খাদ্যের নাম এভাবে ব্যবহার সচরাচর দেখা যায় না। রাষ্ট্রীয় নৈশভোজেই বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত সরকার ও জনগণকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের সাহায্যের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সফরের দ্বিতীয় দিনে দুই প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সাহায্যকারীদের নিয়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় বসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী কসিগিন নিজ নিজ মাতৃভাষায় তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন। এতে অনুবাদে বেশ সময়ক্ষেপণ করতে হয়েছিল এবং আলোচনা বেশ দীর্ঘ হয়ে যায়।

আলোচনা মধ্যাহ্নভোজের পরও বেশ দীর্ঘ সময় যাবত চলেছিল। দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বিষয়াদি ছাড়াও দুই প্রধানমন্ত্রী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে নিজেদের দেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। বাংলাদেশের জন্য ওই সময়ে কূটনীতির মুখ্য লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি লাভ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ এই প্রক্রিয়ারই একটি অংশ হিসেবে আমরা মনে করেছি। তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ছিল আমাদের সবচাইতে জরুরি কাজ। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যের প্রস্তাবগুলো ছিল খুবই উদার ও আকর্ষণীয়। একটা পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী কসিগিন আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরের নাব্য ও কার্যকারিতা পুনরুদ্ধারের জন্য ডুবানো জাহাজ অপসারণ করা ও বন্দরের কারিগরি মেরামত ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য 'অনুদান' হিসেবে দেয়ার ঘোষণা করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু ইতোমধ্যে ঢাকাস্থ জাতিসংঘের প্রতিনিধিকে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তবে পাশ্চাত্যের কোনো দেশ থেকেই সুনির্দিষ্ট কোনো সাহায্যের জন্য প্রস্তাব আসেনি। সুইডেনের সরকার আমাদের অনুরোধ ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করছে বলে আমাদের জানানো হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু কসিগিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকায় ফেরার পরই সোভিয়েত সাহায্য প্রস্তাব সম্পর্কে বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হবে।

ওইদিন রাতে বঙ্গবন্ধু ঢাকা থেকে এ বিষয়ে সর্বশেষ সংবাদ চেয়ে পাঠালেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোড মারফত ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। আমাদের গোপন কোড প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি তখনো সম্পূর্ণ হয়নি। তবু এই সফরের জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল এবং একজন বিশেষ সহকারীকে সফরসঙ্গী করা হয়েছিল। দীর্ঘ দাড়িশোভিত এই ভদ্রলোক খুবই পরহেজগার ছিলেন। ক্রেমলিনে অতি ভোরবেলা আমি তাঁর কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শুনেছি। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকাকালে চট্টগ্রাম বন্দর সংক্রান্ত বিষয়ে

ঢাকা থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। ঢাকায় ফেরার পর বঙ্গবন্ধু খবরাখবর নিয়ে বুঝতে পারলেন জাতিসংঘ বা পাশ্চাত্য দেশগুলোর কাছ থেকে দ্রুত সাহায্য লাভের কোনো আশা নেই। এদিকে খাদ্য আমদানিসহ সব জরুরি আমদানি-রপ্তানি বন্ধ হয়ে আছে। কর্ণফুলীতে ডুবন্ত জাহাজ এবং নদীর মোহনায় ও সাগরে ভাসমান মাইন। এমন সংকটের সময়ে বিলম্বের অবকাশ ছিল না। পূর্ব-আলোচনার সূত্র ধরে বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী কসিগিনের কাছে তার সাহায্য গ্রহণে সম্মতি জানিয়ে একটি পত্র পাঠালেন। পত্রের খসড়াটি আমি তৈরি করেছিলাম। বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরের পর ঢাকাস্থ নবনিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত পপভের কাছে আমি হস্তান্তর করেছিলাম। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই উত্তর এসেছিল। প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল নিয়ে উচ্চপদস্থ সোভিয়েত নৌবহর ও সিভিল কর্মকর্তারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিমান ও জাহাজযোগে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। মস্কোতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রমিকোর সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। একপর্যায়ে দেখলাম গ্রমিকোর ইংরেজি ভাষাজ্ঞান দোভাষী থেকে বেশি, কারণ অনুবাদ করার সময় বিশুদ্ধ ইংরেজিতে তিনি তাঁর ভুল ধরিয়ে দিলেন। গ্রমিকো ছিলেন গম্ভীর ও রাসভারি ব্যক্তি। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের প্রশ্নে তাঁর পরামর্শ তার দীর্ঘ কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক ছিল। অপরাহ্নে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। বঙ্গবন্ধুর সাবলীল, তেজোদ্দীপ্ত বক্তব্য শ্রোতারা আগ্রহের সঙ্গে শুনেছে।

রাতে বলশয় থিয়েটারে আমাদের জন্য ব্যালে নৃত্য দেখার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত বলশয় থিয়েটারের নাম অনেক শুনেছি, এর আগে দেখার সুযোগ হয়নি। পাশ্চাত্য নৃত্যগীত আমাদের দেশের অনেকেই তেমন উপভোগ করতে পারে না। ব্যালে নৃত্যের সঙ্গে তেমন পরিচিত না হলেও কুশলী নৃত্যশিল্পীদের অতি উঁচুমানের পরিবেশনা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। আসলে অনুষ্ঠানটি ছিল আমার জন্য শুধু উপভোগ্য নয়, স্মরণীয়।

পরদিন আমরা বিমানযোগে লেনিনগ্রাদ গেলাম। আগে এই নগরীর নাম ছিল সেন্ট পিটার্সবার্গ। জার পিটার দি গ্রেট এই শহরকে ইউরোপিয়ান অন্যান্য বিখ্যাত শহরের আদলে নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেখানে 'হারমিটাজ' নামক জাদুঘর আমার কাছে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিউজিয়াম বলে মনে হয়েছে। এই মিউজিয়ামের দর্শনীয় মূর্তি, কলাচিত্র ও অন্যান্য মহামূল্যবান সামগ্রী একদিনে বা এক সপ্তাহে দেখেও শেষ করা যাবে না। এত দুর্লভ চিত্রকলা, বিশেষত ডাচ মাস্টার র‍্যামব্রন্ডট-এর আসল চিত্রকলা দেখার সুযোগ পৃথিবীর খুব বেশি মিউজিয়ামে নেই। লেনিনগ্রাদে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী ছিলেন। এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

লেনিনগ্রাদ থেকে ৪ মার্চ তাসখন্দে পৌঁছলাম। উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ ঐতিহ্যময় ও ঐতিহাসিক নাম, কিন্তু শহরটি বেশ আধুনিক। ভূমিকম্পে প্রাচীন শহর নাকি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত যুগেই নতুন শহর নির্মিত হয়েছে। তাসখন্দের সোভিয়েত শাসকরা কমিউনিস্ট হলেও ইসলামী ঐতিহ্য একেবারে ত্যাগ করেননি। বারবার আমার মনে হয়েছে, মোগল সাম্রাজ্যের স্থপতি সম্রাট বাবর এই অঞ্চলের ফারগানা থেকেই যাত্রা শুরু করে দিল্লী জয় করেছিলেন। তাসখন্দে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সৌহার্দ্য ও সম্মাননা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল।

দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধুর তিন বছরের শাসনকাল সম্পর্কে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস আজো লেখা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর সমর্থকরা যেভাবে তাঁর অবদানকে মূল্যায়ন করছেন, তাঁর বিরুদ্ধাচারীরা মূল্যায়ন করছেন বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ইতিহাসে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই সফরের পরই কূটনৈতিক স্বীকৃতি এসেছে একের পর এক। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান শীতল লড়াই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে বেশ বিতর্কের মধ্যে ফেলেছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলোর ধারণা হয়েছিল যে, ভারতের প্রভাবে বাংলাদেশ সোভিয়েত প্রভাব-বলয়ে প্রবেশ করেছে। আমার ধারণা, এর ফলেই বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তি বিলম্বিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সুসম্পর্ক অবশ্যই চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ভারত বা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব-বলয়ে থাকতে চাননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করা ছিল তাঁর ঐকান্তিক লক্ষ্য। কিন্তু পাকিস্তান লবি বিরামহীনভাবে প্রচারণা চালিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোভিয়েত সফরকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেছে। এসব প্রচারণার জাল ছিন্ন করেই বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সফরে আমি সফরসঙ্গী হয়ে এবং বিশেষত সফরের জন্য ব্রিফ তৈরি করে স্বাধীন বাংলাদেশের কূটনৈতিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রক্রিয়ায় একটা ভূমিকা রাখার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। প্রায় চার দশকব্যাপী কূটনৈতিক জীবনে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় ও ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু ১৯৭২ সালের ওই রাষ্ট্রীয় সফর জাতির জীবনে ছিল যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি আমার কূটনৈতিক জীবনে ছিল একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই সফরের মধ্যমণি ও প্রাণপুরুষ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ শিষ্টাচারসম্মত আচার-আচরণ, কথা ও কাজে আমাদের গর্বিত ও গৌরবান্বিত করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর নান্দনিক ভাবনা

ড. আতিউর রহমান

"এ দেশের যা-কিছু তা হোক নগণ্য, ক্ষুদ্র
তাঁর চোখে মূল্যবান ছিল–
নিজের জীবনই শুধু তাঁর কাছে খুব তুচ্ছ ছিল;
স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে পড়ে আছে বিশাল শরীর...'
-রফিক আজাদ, (এই সিঁড়ি)

আর ক'দিন বাদেই পনেরই আগস্ট। বাঙালির সবচেয়ে দুঃখের দিন। ৩২তম জাতীয় শোক দিবস। একত্রিশ বছর আগে এই দিনে ঘাতকদের আঘাতে প্রাণ দেন বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় বীর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রফিক আজাদ ঠিকই বলেছেন নিজের জীবন ছাড়া এই বাংলাদেশের সবকিছুই তাঁর কাছে ছিল মূল্যবান। 'স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে' আজ পড়ে আছে তাঁর 'বিশাল শরীর'। এই দীঘল পুরুষ 'হাত বাড়ালেই/ধরে ফেলতো পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল/ সাড়ে সাত কোটি হৃদয়/ধরে ফেলতো বৈশাখী মেঘ কেমন অনায়াসে' (বাবুল জোয়ারদার, 'সে ছিল দীঘল পুরুষ')। মনে হয় আজও তিনি বাংলার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলের মতো। আমাদের মতো করে আমাদের একটি স্বাধীন দেশ সৃষ্টির যে স্বপ্ন ঘুরে বেড়িয়েছে হাজার বছর ধরে এ ভূ-খণ্ডের মানুষের মনে, পথে-প্রান্তরে, তা এসে যেন থিতু হয়েছিল তাঁর মাঝে। ইতিহাসের এই বরপুত্রের 'চোখে ধরা পড়েছিল রূপসী বাংলার স্নিগ্ধ মুখশ্রী,/ তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল–'আমার সোনার বাংলা',/তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল মুক্তি-স্বপ্ন প্রিয়/স্বাধীনতা' (নির্মলেন্দু গুণ, 'পুনশ্চ মুজিবকথা')। আর সে কারণেই বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিচ্ছেদ্য এক সত্তা।

১৭ মার্চ তাঁর জন্মদিন। একাত্তরের উত্তাল মার্চের ঐ দিনেও তিনি বলতে ভুলে যান নি যে, এদেশের জনগণ এবং তাঁর জীবন অবিচ্ছেদ্য। এদেশের প্রতিটি বাড়িই তাঁর বাড়ি। একাত্তরে তাঁর ৫২তম জন্মদিনে বিদেশী সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, "আমি জীবনে কখনও আমার জন্মদিন পালন করিনি। আপনারা আমার দেশের মানুষের অবস্থা জানেন, তাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। যখন কেউ ভাবতেও পারে না মরার কথা, তখনও তারা মরে।

আমার আবার জন্মদিন কি, মৃত্যুদিবসই-বা কি? আমার জীবনই-বা কি? মৃত্যুদিন আর জন্মদিন অতিগৌণভাবে এখানে অতিবাহিত হয়। আমার জনগণই আমার জীবন।"

জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির চিন্তাই ছিল তাঁর একমাত্র আরাধ্য। ধীরে ধীরে তাই বাঙালির সকল চাওয়া-পাওয়ার এক মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। একই সঙ্গে আবার বিশ্বের সকল মানবিক উদ্বেগ তাঁর ভেতর ঠাঁই করে নিয়ছিল। সেই অর্থে তিনি ছিলেন স্বভূমিতে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এক আধুনিক মানুষ। তাই ৩০মে ১৯৭৩-এর ডায়েরিতে তিনি লিখেছিলেন যে এই দুই ভাবনা তাঁর রাজনীতি ও অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে। "As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bangalee, I am deeply involved in all that concerns Bangalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being." ['৩০মে, ১৯৮৩ নিজ হাতে ইংরেজিতে লেখা বঙ্গবন্ধুর ডায়েরির একটি পাতা', শাহরিয়ার ইকবাল সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধুর জীবনের শেষ বছরের দৈনন্দিন কর্মতালিকা ও কতিপয় দলিল', উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১০৫]।

এই আগস্টে, এমনি এক সম্পূর্ণ বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে চাই তাঁর নান্দনিক তথা শিল্প ও সংস্কৃতি ভাবনার খানিকটা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। প্রচলিত অর্থে তিনি শিল্পী ছিলেন না। কিন্তু 'রাজনীতির এক অমর কবি' বলে তাঁকে চিহ্নিত করতে ভুল করেন নি সমকালীন বিশ্বমানের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। রবীন্দ্রনাথ কলাবিদ্যা বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন, "হৃদয় বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকবেই, আর থাকাই শ্রেয়।..." এই হৃদয় বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যেই ঘটে।' ('রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ; শিল্পচিন্তা', রবীন্দ্ররচনা সংকলন, সম্পাদনা : সত্যেন্দ্রনাথ রায়, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লি., ১৯৯৬ পৃ. ১৩৯)। দেশের আবেগ, স্বপ্ন, উদ্বেগ শুধু কবিতায়, গানে বা নাটকের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় না। উপযুক্ত প্রতিনিধির প্রাত্যহিক কথায়, বক্তৃতায়, জীবন চলার মাধ্যমেও তা প্রকাশিত হতে পারে। মানুষের ভেতরে আবেগের যে উদ্বৃত্ত দেখা দেয় তা নানাভাবে প্রকাশিত হয়। সেই প্রকাশ যদি নান্দনিক হয়, তা যদি অন্যের অন্তরে সমান তালে দোলা দিতে পারে তাকে নিশ্চিতভাবেই শৈল্পিক বলা চলে। ব্যক্তিত্বের এই সুন্দরতম প্রকাশকেও তাই আর্ট বা শিল্পের আওতায় ফেলতে পারি।

"...Man has a fund of emotional energy which is not all occupied with his self-preservation. This surplus seeks its outlet in the creation of art, for man's civilisation is built upon his surplus... When a

felling is aroused in our hearts which is far in excess of the amount that can be completely absorbed by the object which has produced it, it comes back to us and makes us conscious of ourselves by its return waves... This is the reason why, of all creatures, only man knows himself, because his impulse of knowledge comes back to him in its excess. He feels his personality more intensely than other creature, because his power of feeling is more than can be cxhausted by his objects. This efflux of the consciousness of his personality requires an outlet of expression. Therefore, in Art, man reveals himself and not his objects...' ['What is Art?' in Personality, ১৯১৭, দেখুন সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত; শিল্পচিন্তা', ১৯৯৬, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ: ১৩৬]

ব্যক্তিত্বের প্রকাশই আর্টের প্রধান লক্ষ্য। যে-মাধ্যম ব্যবহার করে তা প্রকাশ করা হয় (ছবি, গান, বক্তৃতা) তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সত্য, ব্যক্তিত্বেরই অন্যতম দ্যুতি। "আমার বোধ হয় আর্ট মাত্রেরই কাজ হচ্ছে বিশ্বের যেটুকু আমাদের মনোহরণ করে সেইটুকুকে সযত্নে তার অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কাছে অবিমিশ্র উজ্জ্বল করে ধরা। সত্যের উপরিভাগ থেকে সেইটুকু ছেঁকে নেওয়া সাজিয়ে তোলা আর্টিস্টের কাজ।" [রবীন্দ্রনাথ, 'ছিন্নপত্রাবলী', ১৩১ নং পত্র (দেখুন, সত্যেন্দ্রনাথ রায় ঐ. পৃ. ১১৫)], এই যদি হয় আর্ট বা নন্দনতত্ত্বের মূল কথা তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা চলে বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক বড়ো শিল্পী। ছিলেন রাজনীতির এক অমর কবি। তাঁর সময়ের প্রধান কথক, প্রভাবশালী নিয়ামক, জীবন্ত এক কিংবদন্তি। তাঁর নান্দনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর দৃঢ় তর্জনী হেলনে, অঙ্গভঙ্গিতে, কথায়, ব্যবহারে, আচার-অনুষ্ঠানে এবং সর্বোপরি কালজয়ী সব বক্তৃতায়, বিশেষ করে একাত্তরের ৭ মার্চের হৃদয়স্পর্শী অনুপম ভাষণে। বাঙালির ক্ষোভ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, অপমান, জেদ, অহং, সংযম, স্বপ্ন, প্রতিরোধ, সংকল্প-সবকিছুই সমন্বিতভাবে অর্কেস্টার মতো সেদিন বেজে উঠেছিল তাঁর বজ্রকণ্ঠে। সাহিত্যের তথা নন্দনতত্ত্বের কাজ যদি হয় "সাধারণ জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা" (রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের সামগ্রী'র চতুর্থখণ্ড, পৃ: ৬২৪) তাহলে বঙ্গবন্ধু খুবই দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। এর আগে এবং পরেও তিনি নিরন্তর জনগণ ও নিজের জীবনকে একই সুতোয় গেঁথেছেন। একাত্তরের সাতই মার্চের সেই অতুলনীয় ভাষণে এই সৃজনশীলতাকে তিনি কতটা দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন তা নতুন করে আজ আর বলার প্রয়োজন নেই।

বাঙালির হৃদয়কে অনুক্ষণ স্পন্দিত করা, প্রভাবিত করা, অন্তর ও বাইরের ভেতর সংযোগ স্থাপন করার কাজটি তিনি আজন্মই করে গেছেন। তাঁর ছিল প্রতিভাশালী এক হৃদয়। আর সেই হৃদয়ের কাছে সঞ্চারিত হবার জন্যে লক্ষ, কোটি বাঙালি হৃদয়ের 'সুর, রঙ, ইঙ্গিত, প্রার্থনা' করার বিষয়টি ছিল লক্ষ করবার মতো। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আকারে, প্রকারে, ভাবে, ভাষায় মিলিত হবার এই আকাঙ্ক্ষাই শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পেরেছিল। মনে রাখা চাই, জাতীয়তাবাদ একটি অনুভবের বিষয় উপলব্ধির বিষয়। হৃদয়ে স্পন্দিত হবার বিষয়। তাঁকে ঘিরেই আমরা সাতচল্লিশ-উত্তর উত্তাল সময়ে এক হতে পেরেছিলাম। তাঁকে বাহন করেই আমরা বাঙালিরা 'স্বাজাত্যবোধে'র পর্যায়ে থেকে 'স্বাধিকার' হয়ে 'স্বাধীনতার' পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলের মুক্তিপাগল মানুষ এমন একজন নেতাকে খুঁজছিলেন যাঁর মাধ্যমে তাদের জাতীয় স্বাজাত্যবোধের বিকাশ ঘটাতে পারেন। অতীতের সকল অর্জনকে ত্যাগ করে স্বদেশের সকল জাতীয় বীরের সাহস ও শৌর্যকে আত্মস্থ করে তিনি হয়ে উঠেন পুরো সমাজের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। প্রায় শতবর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি কবির, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষীয় সমাজ', রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, জয় বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৪০৬, পৃ. ৬৩৪)।

আমাদের বড়োই সৌভাগ্য যে, আমাদের চাওয়া-পাওয়ার এক অনন্য প্রতীক হিসেবে তেমন একজনকে আমরা পেয়েছিলাম। কয়েক দশক ধরে তাঁকে ঘিরেই আমাদের দুঃখ ও আনন্দ আবর্তিত হতে থাকে। আমাদের সকল কথা। সকল ব্যথা যেন তার হয়ে যায়। তাঁরও অন্তরের সাহসী উচ্চারণ আমাদের সকলের হয়ে যায়। তিনি অতি সহজেই হয়ে যান আমাদের 'পথের দাবি'র মূল নায়ক। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন নায়ক। এক পর্যায়ে তিনি ও আমরা এক হয়ে যাই। তিনি আমাদের শুধু একটি জাতিই উপহার দেন নি, তৈরি করে দিয়ে গেছেন একটি স্বপ্নের ঠিকানাও। কিন্তু আমরা এমন এক ভাগ্যাহত জাতি যে, সেই স্বপ্নের নির্মাতাকে 'আমাদের'ই একাংশ করেছে অপমান। কেড়ে নিয়েছে তাঁর প্রাণ। আর তাই জাতি হিসেবে আমাদের আজ এমনই নিম্নাঞ্চলে যাত্রা, এমন অধঃপতন। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন যে, "সেইসব জাতি ভাগ্যবান, যারা সবসময় স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মাঝেই খুঁজে পায়" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৪)। আর আমরা আমাদের তৈরি ইতিহাসকেই করছি অস্বীকার। আর জাতীয় বীরদের করছি অপমান।

তিনি সমুজ্জ্বল সাধারণের অন্তরে

যেকোনো সফল রাষ্ট্রের লক্ষণই হচ্ছে যে, তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সে কিছুতেই বিতর্কিত করতে দেয় না। বিশেষ করে, আগামী দিনের নাগরিকদের কাছে ইতিহাসকে কখনও ছক্কা, পাঞ্জার বিষয় করা হয় না। একটি দেশ আগামী দিনে এতোটা উন্নত হবে তা কিন্তু নির্ধারিত হয়ে যায় আজকেই তার বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণীকক্ষে। সেই শ্রেণীকক্ষে গুণমাণের শিক্ষার পাশাপাশি যদি দেশের সত্যিকার ইতিহাসকে ঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয় তাহলে সমাজের ভেতরে যে আত্মশক্তির জন্ম নেয় তা খুবই অদম্য হয়ে ওঠে। সেই আত্মশক্তিই গড়ে তোলে ঘরে-বাইরের সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ। সেই আত্মশক্তিই হতে পারে আমাদের স্বদেশী উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। আমাদের বড়োই দুর্ভাগ্য যে, আমাদের সন্তানদের আমরা একদিকে গুণমানের শিক্ষা দিচ্ছি না, অন্যদিকে সত্যিকার ইতিহাসও তাদের জানাচ্ছি না।

নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোমলমতি শিশুদের আমরা সর্বক্ষণ বিভ্রান্ত করে চলেছি। তাদের আমরা জানতেও দিচ্ছি না যে, দীর্ঘ এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ফসল এই বাংলাদেশ। এই মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি তৈরি করেছেন অসংখ্য জাতীয় বীর। তাঁদের আত্মত্যাগ, দূরদর্শিতা এবং পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছিল মুক্তিকামী বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সমাজবিদগণ। পূর্বসূরিদের সেইসব অবদানকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে স্বদেশের জন্যে সকলকে অন্তপ্রাণ করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিব। জনগণ তাঁকে ভালোবেসে উপাধি দিয়েছিলেন 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে।

বাংলার অকৃত্রিম এই বন্ধু শেষ-অবধি একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে তাঁর প্রতি জনগণের ভালোবাসা ও আস্থার ঋণ শোধ করেছিলেন। আর জনগণ তাঁর মুখকে স্বদেশের প্রতিচ্ছবি হিসেবেই খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরেই তাদের সকল চিন্তা, চেতনা ও প্রত্যাশা দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত হয়েছে। আজও তিনি সমুজ্জ্বল সাধারণের অন্তরে। সুবিধাভোগীদের দল তাঁর কথা মনে না রাখলেও এদেশের দুঃখী মানুষ তাঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে বেঁচে আছে, থাকবে চিরদিন। দিন দিন তিনি বড়ো হচ্ছেন, বিপুল রূপ ধারণ করছেন; আকাশ ছোঁয়া হচ্ছেন।

অন্য সকল জাতীয় বীরদের চেয়ে বঙ্গবন্ধু এ-কারণে স্বতন্ত্র যে, তিনি আপামর জনসাধারণের মনে একটি স্বাধীন স্বদেশের স্বপ্নের বীজ পুঁতে দিতে পেরেছিলেন। স্বদেশকে তাঁর মধ্যেই উপলব্ধি করেছেন এদেশের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে যোগ রাখলেই সকলের সঙ্গে যোগ রাখা হতো। কেননা, সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, একমাত্র তিনিই স্বদেশী সমাজের বৃহত্তর ঐক্যের প্রতীক। তিনি যে স্বদেশের ঘরে ঘরে। এক অর্থে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমাদের স্বপ্নের বাতিঘর। সর্বক্ষণ তিনি বাঙালির আলাদা অস্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও সাহসের

প্রতিনিধিত্ব করেছেন। নিজের সাহস সকলের মনে সংক্রমিত করেছেন। এ স্বপ্ন বোনার কাজটি তিনি এমন নিপুণভাবে করতে পেরেছিলেন বলেই মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই একটি স্বাধীন বাংলাদেশের বহিঃপ্রকাশ প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

"সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, শেখ মুজিবের নামে ইতিহাসের দরজা খুলে যায়" (বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর)। সেই দরজা দিয়ে বের হয়েই আমরা আবার নিয়তির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছি।

আবারও অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে বাঙালি জাতিসত্তা। এই সংকট থেকে বের হতেও প্রয়োজন হবে বঙ্গবন্ধুর মতো প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নিবিড় সংযোগ এবং পর্বতপ্রমাণ সাহস। সেই কারণেই আমরা খুঁজে নিতে চাই তাঁর সাহসের উৎস, জনগণের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সংযোগের ভিত্তি এবং সত্যের প্রতি অবিচল থাকার তাঁর প্রেরণার মূল। অনুভব করতে চাই রাজনীতির এই অমর কবির নান্দনিক ভাবনার তল। স্পর্শ করতে চাই তাঁর মানবিক ও শৈল্পিক চেতনার শেকড়।

অভাজনের শেখ মুজিব, অভিজনের শেখ মুজিব

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন প্রজন্মের কাছে পরিচিত ছিলেন মুজিবর, মুজিব ভাই, শেখ সাহেব ও বঙ্গবন্ধু নামে। এই সম্বোধনগুলোর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মুজিবের বেড়ে ওঠা, পরিণতি লাভ করা ও জনসম্পৃক্ততার রেখাচিত্র ফুটে ওঠে। শেখ মুজিব তাঁর রাজনীতি শুরু করেছিলেন মুসলিম বাংলায়। সেই সময় তাঁর রাজনৈতিক দল ছিল 'মুসলিম লীগ'। আটচল্লিশ ও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ব্যক্তি মুজিব ও জাতিকে কতোখানি নাড়া দিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মুসলিম লীগ'-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নাম ধারণের মধ্য দিয়ে। আরও এক ধাপ এগিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম হয় 'আওয়ামী লীগ'। বায়ান্নর ভাষা শিক্ষার লড়াইয়ে। ছেষট্টিতে এ-দাবি আরও স্পষ্ট হয় ছয়দফার মাধ্যমে। ছয় দফার পথ বেয়েই উনসত্তরে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার দাবি মিলেমিশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত হয়। এসব আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে তিনি ছিলেন সক্রিয়।

ছেষট্টিতে রবীন্দ্র সংগীত বিরোধী তৎকালীন সরকারের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে লড়াইও ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার লড়াই যা শেষ-অবধি শুধু বাঙালি এলিটদের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের অংশ না থেকে সাধারণ মানুষের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের লড়াইয়ের অংশ হয়ে ওঠে। উনসত্তরের সামরিক শাসনবিরোধী গণঅভ্যুত্থান সত্তরের নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্থিতিশীল পটভূমি তৈরি করে। আর এই নির্বাচনের মাধ্যমে ছয়দফা ভিত্তিক পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অধিকার জনরায়ে সমর্থিত হয়। যার পথ ধরেই আসে একাত্তর।

সকল অর্থেই একাত্তর ছিল এক হিরন্ময় সময়। জাতি হিসেবে দানা বাঁধবার এক শ্রেষ্ঠ সময়। একাত্তরের মার্চেই জন্ম নেয় বাংলাদেশ। অসহযোগের পুরোটা সময় ধরেই চলছিল তার জন্মের উন্মাদনা। মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রস্তুতিপর্বে বাঙালি শিল্প ও সংস্কৃতির অঙ্গনের সকল প্রতিনিধিই তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অনিবার্য করে তোলেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকসহ সকল শক্তিই আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি। এরপর এলো মুক্তিযুদ্ধ। দুঃখের দিনে এক হবার এক অনন্য অভিজ্ঞতা। সেই দিনগুলোতেও মুক্তির গান গেয়ে গেয়ে লড়াই করেছেন সংস্কৃতিসেবীরা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। তাঁর বজ্রকণ্ঠও প্রতিদিন উজ্জীবিত করতো তাঁদের। তাঁর দেয়া 'জয় বাংলা' রণহুঙ্কার তখন ছিল মুক্তিপাগল সকল বাঙালির মুখে মুখে। হুমায়ুন আজাদ মনে করেন "১৯৭১-এর মার্চে শেখ মুজিব সৃষ্টি করেছিলেন শুভ দাবানল, শুভ প্লাবন, শুভ অগ্নিগিরি, নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালি মুসলমানকে। যার ফলে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। তিনটি রূপকপ্রতীক আমরা পেয়েছিলাম একাত্তরের মার্চে। একটা জাতীয় সংগীত— 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি', যাতে কোনো উগ্রতা নেই, আছে শুধু প্রকৃতিপ্রেম; দ্বিতীয়টি এক অপূর্ব জাতীয় পতাকা, যাতে ছিল সবুজের মাঝে সূর্যের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র, তৃতীয়টি হৃদয়কাঁপানো, স্বদেশ জাগানো স্লোগান : 'জয় বাংলা'। এ তিনটি রূপকপ্রতীক নিয়ে মার্চ ও তার পরের মাসগুলো আলোড়িত ও মুখরিত ছিল। এগুলো ছিল পুরোপুরি পাকিস্তান চেতনার বিপরীত, এবং আবেগ ও শৈল্পিকভাবে অনেক উৎকৃষ্ট' (হুমায়ুন আজাদ, 'স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিব', ভোরের কাগজ, ১৭ মার্চ ২০০৬)। বলাই বাহুল্য, এই চেতনা, এই শৈল্পিক আবেগের বীজ বুনেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই তিন রূপকপ্রতীক এবং বঙ্গবন্ধু অভিন্ন। অবিচ্ছেদ্য। আর সেকারণেই বন্দি থেকেও "তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধকে, তিনিই সৃষ্টি করে চলছিলেন একটা স্বাধীন রাষ্ট্র" (হু: আ: ঐ)। একথা ঠিক তিনিও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। তাই বলে কতিপয় বামনদের আকাশ ছোঁয়া এই ব্যক্তিত্বের ওপর আঘাতের এই কসরৎ একেবারেই বিসদৃশ্য। যে যাই বলুক না কেন, "তিনি মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, বাংলাদেশের মহা স্থপতি" (হু: আ: ঐ)। মনে রাখা চাই, 'সারা ১৯৭১-এ যত কিছু ঘটেছে, বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যত প্রচার হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধারা যত সেতু উড়িয়েছে, যত পাকিস্তানি জন্তু বধ করেছে, যত বাঙালি নিহত হয়েছে, যতো নারী লাঞ্ছিত হয়েছে, আর আমরা স্বাধীনতার যত স্বপ্ন দেখেছি, তার সবটাই মুজিবের নামে। অন্য কোনো নামে এটা ঘটতে পারতো না; অন্য কোনো নাম থেকে এ প্রেরণা উৎসারিত হতো না।" (হু: আ: ঐ)

রাজনীতির এক অমর কবি

পঞ্চাশ-উত্তর পুরোটা সময় জুড়েই রাজনৈতিক-সামাজিক-নান্দনিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে। তাঁর বজ্রকণ্ঠ, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশনা, অঙ্গুলি হেলন, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ভঙ্গিই প্রভাবান্বিত করেছে সদ্যজাত বাঙালি জাতিকে। সেই অর্থে একাত্তরের ৭ মার্চের কালজয়ী সেই অনুপম ভাষণটিই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ বাঙালির সে-দিনের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে নয়া এক মাত্রা যোগ করেছে।" এই ভাষণেই আমরা লক্ষ্য করলাম রাজনীতির এই অতুলনীয় কবির আবেগ, গরিবের প্রতি মমত্ববোধ, চরম উত্তেজনাময় পরিবেশেও সংযতবোধ, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের শেষ পরিণতি সার্বিক মুক্তির আহ্বান। তিনি বললেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।.... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো, এ-দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ।" বললেন, প্রধানমন্ত্রিত্ব তিনি চান না। তিনি চান মানুষের অধিকার। এই ভাষণেই তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি ছিলেন এদেশের মাটি ও মানুষেরই অংশ। ঐতিহ্যের সন্তান। 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'র মতো আঞ্চলিক ভাষা ও অনুভূতির মিশেলে এমনি সাহসী উচ্চারণের কারণেই তাঁর ঐ ভাষণটিকে রাজনীতির এক মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করেছেন অনেকে। এমন মহাকাব্য একদিনেই তৈরি হয় না। মাটি ঘেঁষা রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি নিরন্তর অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন বলেই তিনি এমন অনুপম এক হৃদয়কাড়া রাজনৈতিক কবিতা লক্ষ-কোটি মানুষের সামনে সেদিন ওভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন। এমন একটি ভাষণ যিনি দিতে পারেন তাঁর নান্দনিক চিন্তার তল কতোটা গভীর থাকতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাঙালির স্বাতন্ত্র্য বিকাশের পেছনে যে-মানুষটির অবদান অতুলনীয় তাঁর সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক চিন্তা-চেতনার খানিকটা স্পর্শ তাই আমরা পেতে চাই।

এদেশের খেটে খাওয়া মানুষের তিনি ছিলেন সার্থক প্রতিনিধি। গ্রাম থেকে চলে আসা যেকোন কৃষক তাঁর সঙ্গে সহজেই ভাবের আদান প্রদান করতে পারতেন। একই সঙ্গে অভিজনদের, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর যোগাযোগ। স্বদেশের গরিব-দুঃখী মানুষের দুঃখের কথা বলে গেছেন যেসব কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী তাঁদের তিনি মন থেকে ভালোবাসতেন। তাঁরা তাঁকে একইভাবে ভালোবাসতেন। কবি জসীম উদ্দীন, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, প্রফেসর মোজাফ্ফর আহমদ, প্রফেসর মোহাম্মদ এনামুল হক, প্রফেসর নূরুল ইসলাম, প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ, জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, সুফিয়া কামাল, আবুল ফজলের মতো শিক্ষাবিদ-শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক সম্পর্ক। তাঁর ও সকলে মনে করতেন তিনিই

বাঙালির সকল আশা ভরসার প্রতীক। এদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কতটা গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৯ সালে কন্যা শেখ হাসিনাকে লেখা এক চিঠিতে— "বোধ হয় শুনেছ, মানিক ভাই পিন্ডিতে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। বুঝতেই পার আমার অবস্থা প্রফেসর হাই সাহেবও মারা গিয়াছেন। বাংলাদেশের দুইজন কৃতী সন্তান আমরা হারালাম।" (সূত্র: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত এ্যালবাম 'জাতির জনক', ২০০৩, পৃ. ২১১)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামে বাঙালি জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের প্রশ্নটি সবসময় বঙ্গবন্ধুর কাছে সমভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। তাই তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে স্বাধীন বাংলাদেশে নেমেই ছুটে যান রেসকোর্সের অপেক্ষমাণ জনসমুদ্রের কাছে এবং উচ্চারণ করেন "ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি, ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরো বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।' সাধারণ এ-শব্দমালার উচ্চারণের পেছনে তাঁর ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ এই দুই ভিত্তির ওপরই বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক দর্শন ও শৈল্পিক ভাবনার বিষয়গুলো গড়ে উঠেছিল।

বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন

একটি জাতিকে পঙ্গু ও পদানত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা। তাই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীও চেয়েছিল আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু এদেশের মানুষ কখনও তা মেনে নেয়নি। তারা ভাষার মর্যাদার জন্যে আন্দোলন করেছে, অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। যোগ্য নেতার মতো বঙ্গবন্ধুও সে সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার মানসে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সময় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুসলিম ছাত্রলীগকে দ্বিধাবিভক্ত করে ১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারি পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ গঠনকৃত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর ডাকে ১১ মার্চ হরতাল ডাকা হয়। হরতালের মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার সময় ঢাকার আব্দুল গণি রোডে শেখ মুজিব তৎকালীন পুলিশের আইজি শামছুদ্দোহার মুখোমুখি হলে গ্রেফতার হন। কিন্তু প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভের মুখে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন শেখ মুজিবসহ অন্যান্য ছাত্রনেতাদের ৫ দিনের মাথায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৬ মার্চ যে-সভায় মুখ্যমন্ত্রীর জন্যে তৈরি

স্মারকের শর্ত ঠিক করা হয় তার সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিব (দ্র: তাজউদ্দিন ডায়েরি)। সেই সভাতেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের আটদফা চুক্তির সংশোধনী আনতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঐ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি 'রাষ্ট্রভাষার দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণকে পূর্ব-বাংলার সদস্য ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের উপর বাধ্যতামূলক করেন'(দেখুন, আতিউর রহমান ও সৈয়দ হাশেমী, 'ভাষা আন্দোলন : অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান', ইউপিএল, ১৯৯০, পৃ.৫৩, গাজীউল হকের সাক্ষাৎকার)। বায়ান্নতে ভাষা আন্দোলন আরও জোরদার হয়। জেলে থেকেও শেখ মুজিব এই পর্বে ভাষা আন্দোলনকে নিয়মিতভাবে প্রভাবিত করেছেন।

ভাষা আন্দোলনের দুই পর্যায়েই তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি ছিলেন সংগ্রামী ছাত্রনেতা। দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং দুর্ভিক্ষাবস্থা মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ঢাকায় ভূখা মিছিল থেকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ ২ বছর ৮ মাস কারাভোগের পর ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অসুস্থাবস্থায় শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন। (সূত্র : জেল রিপোর্ট, যেখানে লেখা আছে, "Security Sk. Mujibur Rahman broke his fast on receipt of Govt. Order for his release on the afternoon of 25.2.52. He was let off from the jail on the morning of 27.2.52")

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে বন্দি থাকার কারণে শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও আন্দোলনকে বেগমান করতে নেতৃত্ব দানকারীদের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। তাই ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "অনেকেই ইতিহাস ভুল করে থাকেন। ১৯৫২ সালের আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস আপনাদের জানা দরকার। আমি তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বন্দি অবস্থায় চিকিৎসাধীন। সেখানেই আমরা স্থির করি যে, রাষ্ট্রভাষার ওপর ও আমার দেশের উপর যে আঘাত হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি, তার মোকাবেলা করতে হবে।" সেখানেই গোপন বৈঠকে সব স্থির হয়। একথা আজ বলতে পারি; কারণ, আজ পুলিশ কর্মচারীর চাকরি যাবে না। সরকারি কর্মচারীর চাকরি যাবে না। কথা হয়, ১৬ ফেব্রুয়ারি আমি জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট করবো, আর ২১ তারিখে আন্দোলন শুরু হবে। জেলে দেখা হয় বরিশালের মহিউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে। তাকে বললাম, আমরা এই প্রোগ্রাম নিয়েছি। তিনি

বললেন, আমিও অনশন ধর্মঘট করবো। ১৬ ফেব্রুয়ারি আমরা অনশন ধর্মঘট করলাম। এর দরুন আমাদের ট্রান্সফার করা হলো ফরিদপুর জেলে। সূচনা হয় ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের"।

ভাষা আন্দোলন থেকেই গড়ে ওঠে স্বায়ত্তশাসনের জন্যে আন্দোলন। স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন থেকেই দানা বাঁধে মুক্তিযুদ্ধ। প্রতিটি পর্যায়েই তাঁর নেতৃত্ব বাঙালি জাতির বিকাশের ধারাকে করেছে বেগবান, মহিমান্বিত।

তিনিই বাংলাদেশ

'বাংলাদেশ' এবং 'বঙ্গবন্ধু' এই দু'টো নাম একই সূত্রে গাঁথা। একটি ছাড়া অন্যটিকে কল্পনা করা যায় না। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন বঙ্গবন্ধু গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১৭ জুন তিনি পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে ২১ দফা দাবি করেন। এরপর ২৩ জুন তিনি ঘোষণাও দেন পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। তাই ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণ-পরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন, "Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'Pakistan'. The word 'Bengal'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One- Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy.? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite :"

অনুবাদ : স্যার আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ববাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কিনা। এক ইউনিটের প্রশ্নটা গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রশ্নটাকে এখনই কেন তুলতে চান?

বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কী হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটারই কী সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই-বা কি ভাবছেন? পূর্ববাংলার জনগণ অন্যান্য প্রশ্নগুলোর সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাবো তারা যেন আমাদের জনগণের 'রেফারেন্ডাম' অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেয়া রায়কে মেনে নেন" (সূত্র : Sheikh Mujib In Parliament (1955-58), Edited by Shahryar Ikbal, Agamee Prakashani)। বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ নামটি প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। ঢাকা হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার মাজার প্রাঙ্গণে ঊনসত্তরে সোহরাওয়ার্দী স্মরণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এক সময় এ-দেশের বুক হইতে মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কিছুতে বাংলা কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।... বাংলা ও বাঙালির অবিসংবাদিত গণনায়ক শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার প্রতিও অমার্জনীয় অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে।... বাংলার এই কৃতী দুই সন্তান আজ অসহায়ের মতো আমাদের মুখের ওপর তাকাইয়া আছেন। এই দুই নেতার মাজারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি–আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব-পাকিস্তানে'র পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।" (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯)।

বঙ্গবন্ধু সবসময় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছিলেন। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এক করে ভাবতেন। তাঁর কাজের মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করে গেছেন সবকিছু। অহিংস আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী যা পেরে ওঠেননি, বঙ্গবন্ধু তা করেছেন। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এদের ধর্মের ঊর্ধ্বে তিনি নিতে পারেননি। আর যদি তিনি নিতেই পারতেন তাহলে ধর্মভিত্তিক দুটো রাষ্ট্রেরও সৃষ্টি হতো না। অথচ বঙ্গবন্ধুর ডাকে সকল ধর্মের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে একটি জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেখানে ছিল না কোন ধর্মীয় ভেদ। সত্যিকার অর্থেই আধুনিক মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল এক অনন্য ঘটনা।

পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন তাইতো শ্রদ্ধাভরে লিখেছেন,

আমরা গান্ধীর বাণী জীবন করিয়া দান,
মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান।
তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে-ধর্মে আর,
জাতিতে-জাতিতে ভুলিয়াছ ভেদ সন্তান বাংলার।"

(–জসীম উদ্‌দীন, 'বঙ্গবন্ধু')

বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বঙ্গবন্ধু

৩১ ডিসেম্বর ১৯৭০ হোটেল পূর্বাণীতে 'পূর্বাণী'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ফুটে উঠেছিল। সেদিন তিনি বলেছিলেন, "শিল্পী, সাহিত্যিক এবং কবিদের তাঁদের লেখায় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই প্রতিফলিত করতে হবে। তাঁরা তাঁদের মানুষ, তাঁদের মাতৃভূমি ও সংস্কৃতির জন্যে শিল্পচর্চা করবেন। জনগণের স্বার্থে এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে সাহিত্যিকদের প্রাণ খুলে আত্মনিয়োগ করার জন্যে আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমি তাঁদের আশ্বাস দিচ্ছি, শিল্পী, কবি এবং সাহিত্যিকবৃন্দের সৃষ্টিশীল বিকাশের যেকোন অন্তরায় আমি এবং আমার দল প্রতিহত করবে। আজ আমাদের সংস্কৃতির সামনে কোনও চক্রান্ত নেই, শাসন বা নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল নেই। শিল্পী-সাহিত্যিকরা আর মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের জন্যে সংস্কৃতিচর্চা করবেন না। দেশের সাধারণ মানুষ যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্যে শিল্পী, সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।" সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর এই মমত্ববোধ এবং পক্ষপাতিত্বের মাত্রা দিন দিন বরং বেড়েছে। ক্ষমতাসীন বঙ্গবন্ধু তাদের জন্যে কী তীব্রভাবে ভাবতেন তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় তা লক্ষণীয়।

তিনি নিজেও তাঁর সকল সাংগঠনিক তৎপরতায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের যুক্ত করার চেষ্টা করতেন। স্বদেশী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশী দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ মেলে বাংলাদেশের সংবিধানের নান্দনিক উপস্থাপনার মধ্যে। দেশের প্রখ্যাত সব শিল্পীদের দায়িত্ব দেন মূল সংবিধানটি হাতে লিখে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের শৈল্পিক প্রতিফলন ঘটাতে। আবার ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত যে-সম্মেলন মঞ্চে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা জনগণের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেন তাতে শিল্পী হাশেম খানসহ অনেকেরই হাত পড়েছিল। ৬-দফাকে শৈল্পিকভাবে বাঙ্ময় করার এই আগ্রহ থেকেও অনুমান করা যায় কী গভীর ছিল তাঁর নন্দনপ্রীতি।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ও আধুনিক। ক্ষুদ্রচিন্তা তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি। বঙ্গবন্ধু যেমন নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করেছেন তেমনি অন্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির কথাও বলেছেন। ১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে পূর্ব-পাকিস্তান সংগীত-শিল্পী সমাজ বঙ্গবন্ধুর সম্মানে এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। সেই অনুষ্ঠানে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন

যে, তিনি কতোটা উদারনৈতিক ও মানবিক। নিজের সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার পাশাপাশি অন্যের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তিনি কখনও খাটো করতেন না।

সেদিন তিনি উল্লেখ করেছিলেন, "আমি যখন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কথা বলি তখন সিন্ধি, পাঞ্জাবি, বেলুচি, পশ্তু তথা অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের সমান সমৃদ্ধি কামনা করি। কারণ, আঞ্চলিক পরিবেশ ও জনগণের ধ্যানধারণার ভিত্তিতেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে। ধর্মের ভাড়াটিয়া সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া মানুষের আত্মার স্পন্দনকে পিষে মারার শামিল" (সূত্র দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭১)। এ-অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু একটি জাতীয় 'ললিতকলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য বঙ্গবন্ধু সর্বক্ষণ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁদেরকে নির্ভয়ে কাজ করার সাহস যুগিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমী আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দানকালে তাই বঙ্গবন্ধু বলেন, "মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতিরোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এ-দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন। দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য রচনা করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না' (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, পাকিস্তান, আজাদ, সংগ্রাম ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১) 'স্বাজাত্যরোধ' কথাটি উচ্চারণের মধ্যে তাঁর অন্তরের একান্ত অনুভূতি ফুটে উঠেছে। একই সঙ্গে তাঁর নান্দনিক চিন্তার গভীরতার দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর এই ভাষণের মাধ্যমে এদেশের সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি কর্মীদের নির্ভয়ে এবং জোরালোভাবে স্বদেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদা টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে যুক্ত থাকার আহ্বান করেছিলেন এবং নিজে বাঙালি সংস্কৃতির মূলে শক্তির যোগান দিয়েছেন সবসময়। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, "মানবাত্মার সুদক্ষ প্রকৌশলী হচ্ছেন দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী... জনগণ হলো সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোদিন কোনো সৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না।" (সূত্র : দৈনিক বাংলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪)।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে বঙ্গবন্ধুর হাতের ছোঁয়া লাগে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বাংলা একাডেমী ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড দু'টি আলাদা প্রতিষ্ঠান ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বিকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন হওয়ার পর এ-দু'টোকে একই প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। এতে বাংলা ভাষা গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। দেশের নিবেদিত প্রাণ গবেষক বুদ্ধিজীবীদের এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রেখে তিনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অব্যাহত অবদান রেখে গেছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আলাদা কোনো সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ছিল না। তাঁর হাত ধরেই এই মন্ত্রণালয়টির অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ-ভারত সংস্কৃতি চুক্তি সই হয়। এতে দুই দেশের মধ্যে শিল্পী বিনিময় সহজতর হয়। বাংলাদেশের শ্রোতা শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠান বিপুলভাবে উপভোগ করেন। বাংলাদেশের শিল্পীরাও ভারতে গিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা ভারতে গিয়ে সংগীত, নৃত্যসহ বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করার সুযোগ পায়। ভারত থেকে লেখাপড়া শেষ করে এসে তারা এদেশের শিল্প সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ দু'টো দেশের সংস্কৃতি যে একই উৎস থেকে উত্থিত, সে কথাটি তিনি ভালো করেই জানতেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দু'দেশের শিল্পীরা হাতে হাত রেখে যে মুক্তির গান গাইতেন সে খবরও তিনি রাখতেন। আর সেকারণেই দু'দেশের সংস্কৃতির সংযোগ বৃদ্ধিতে তিনি খুবই উদগ্রীব ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু দেশের সৃজনশীল শিল্পী ও তাদের পোষ্যদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' গঠন করেছিলেন। সংস্কৃতিসেবী কিংবা তাঁদের পোষ্যদের আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য ও পুনর্বাসন করা এবং মেধাবিকাশের জন্য বৃত্তি প্রদান করাই ছিল এই ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (সূত্র : দৈনিক বাংলা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪)। সংস্কৃতির আর একটি অংশ খেলাধুলা। দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ গঠন করেছিলেন। এর নাম হয়েছিল 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন'। এই ফাউন্ডেশন ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ আগস্ট ১৯৭৫)। বাংলাদেশে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে তিনি ১৯৫৭ সালের ৪ এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল উত্থাপন করেন। তাঁর আগ্রহ ও সহযোগিতায় বাংলাদেশে ছায়াছবি নির্মাণের প্রাতিষ্ঠানিক গোড়াপত্তন হয়। সংস্থাটি গঠনের দেড় মাসের মধ্যে ফতেহ লোহানি 'আসিয়া' ছবি নির্মাণ শুরু করেন। (সূত্র : 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান', সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, ভাস্কর প্রকাশনী)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয়ে উত্তীর্ণ করার জন্য যেসব শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী এবং বেতারকর্মী তাঁদের সৃষ্টি বা তৎপরতা দিয়ে অসামান্য অবদান রেখেছেন বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে তাদের মধ্য থেকে বাংলাদেশের ১৮ জন এবং ভারতীয় ৪ জন বিশিষ্ট শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী ও বেতারকর্মীর জন্য বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক ঘোষণা করেন। পদক প্রাপ্তরা হলেন- শহীদ আলতাফ মাহমুদ, রাজু আহমেদ, সর্দার আলাউদ্দিন, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল আল ফুরুখ, রেজাউল করিম চৌধুরী, রাশিদুল হাসান, আমিনুর রহমান, কাজী হাবিব উদ্দিন, শফিকুজ্জামান, সৈয়দ আব্দুস শাকের, গাজী মাজহারুল ইসলাম, এম. আর. মুকুল, রবীন্দ্রনাথ রায়, সমর দাস, মুস্তফা আলম; এবং ভারতের দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, অংশুমান রায় এবং প্রণব ঘোষ। (সূত্র : দৈনিক বাংলা, ২৬ মার্চ ১৯৭৫)।

রেডিও টেলিভিশনকে বিলাসদ্রব্য হিসেবে গণ্য না করে সাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার এক মহৎ উদ্যোগ বঙ্গবন্ধু নিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা জনগণ সঠিকভাবে পাক। কার্যকর জনসংযোগের মাধ্যমে রেডিও ও টেলিভিশনের ব্যবহার জনপ্রিয় করার জন্য এক ব্যান্ডের রেডিও'র ওপর থেকে লাইসেন্স ফি, আমদানি কর ও বিক্রয় কর প্রত্যাহারের আদেশ দেন। এক ব্যান্ডের রেডিও সেটের দাম ২১০ টাকা থেকে ২৪৫ টাকার মধ্যে সীমিত রাখার জন্যে নামমাত্র শুল্ক ধার্য করা হবে বলে বঙ্গবন্ধু আদেশ দেন। এর সাথে ২০ ইঞ্চি টেলিভিশন সেটের লাইসেন্স ও অন্যান্য ফি বাতিলের নির্দেশ দেন এবং এই সেটের দাম সাড়ে তিন হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য শুল্ক হিসেবে মাত্র আড়াইশ টাকা ধার্য করার নির্দেশ দেন (সূত্র : দৈনিক বাংলা, ৪ জুলাই ১৯৭৫)

কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বঙ্গবন্ধু

কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে তাঁদের যুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। পরিকল্পনা কমিশনে ড. নূরুল ইসলাম, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর আনিসুর রহমান, ড. মোশাররফ হোসেনসহ অসংখ্য শিক্ষক, প্রকৌশলী ও পেশাজীবীদের জড়ো করেছিলেন। প্রফেসর কবীর চৌধুরীকে শিক্ষা সচিব নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি চলে আসার পর অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে শিক্ষা সচিব হবার জন্য খুব করে বলেছিলেন। বাংলায় সংবিধান প্রণয়নে তাঁকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছিলেন। প্রফেসর মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী ও ড. এ আর মল্লিককে মন্ত্রিসভায় নিয়েছিলেন। সহিত্যিক আবুল ফজলকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করেছিলেন। জয়নুল আবেদীনসহ সকল শিল্পী, শিক্ষাবিদকে শিক্ষকতুল্য সম্মান করতেন এবং তাঁদের উপদেশ শুনতেন। নিজেও প্রচুর পড়াশোনা করতেন।

তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির উজ্জ্বল সংগ্রহের কথা অনেকেই জানতেন। The tortured and the damned' উপন্যাসের লেখক রবার্ট পেইন লিখেছেন, "তিনি তাঁর গ্রন্থাগারের দিকে তাকান। সেখানে জর্জ বানর্ড'শ এবং বাট্রান্ড রাসেল-এর রচনাবলি রয়েছে। একটি বুকশেল্‌ফে রয়েছে রৌপ্যবাঁধাই মাও সেতুং-এর স্বাক্ষরিত ছবি।" তিনি লিখেছেন, "আমার বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে, মাও সেতুং।" স্বাক্ষর একটি বিস্ফোরিত আতশবাজি'র মতো মনে হয়। তিনি ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। বহুবছর আগে যখন তিনি পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে পিকিং গিয়েছিলেন তখন মাও সেতুং একমাত্র তাঁকেই একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার প্রদান করেছিলেন।" (সূত্র : রবার্ট পেইন, 'সেই দুঃসময়', সিদ্দিকুর রহমান অনূদিত, পৃষ্ঠা ১৮)

বঙ্গবন্ধুর শুধু ব্যক্তিগত লাইব্রেরিই ছিল না, তিনি সেই সময় তাঁর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাগার স্থাপন করেন। লাইব্রেরিটি শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকত। সেই পাঠাগারে সোভিয়েত ইউনিয়নের ৭ হাজার ছাড়াও ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্ব-জার্মান, পশ্চিম জার্মান, বুলগেরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ কয়েক হাজার পুস্তক প্রদান করেছিল। (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ মে ১৯৭৪)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব বঙ্গবন্ধুর জীবনে ছিল খুবই গভীর। বেগম মুজিব তাই এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "কবিগুরুর আসন বঙ্গবন্ধুর অন্তরের অন্তস্তলে। রাজনৈতিক জীবনের উত্থানপতন, দুঃখ-দৈন্য সর্বমুহূর্তে তাঁকে দেখতাম বিশ্বকবির বাণী আবৃত্তি করতে। 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়' অথবা 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে' প্রভৃতি অসংখ্য গানের টুকরো তিনি আবৃত্তি করে যেতেন দুঃখ-দৈন্য-হতাশায় ভরা অতীতের সেই দিনগুলোতে।

সবসময় মনে হতো তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠের আবেগময় আবৃত্তি যেন তার জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাচ্ছে। ... কবিগুরুর সোনার বাংলাকে পবিত্রতায়, স্নিগ্ধতায় অপরূপ করাই বঙ্গবন্ধুর জীবনের পরম প্রার্থনা, আর এ জন্যই তিনি নেমেছিলেন সংগ্রামে। আর তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে কবিগুরুর অমর বাণী। প্রতিবারই জেলে যাবার সময় সঞ্চয়িতাটা হাতে তুলে নিতেন। কারাগারে নিঃসঙ্গতায় বঙ্গবন্ধুর জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল সঞ্চয়িতা। বইটার গায়ে পড়েছিল জেলের সেন্সরের অনেকগুলো সিল (সূত্র : সংবাদ ৮ মে ১৯৭২)। বঙ্গবন্ধুর রবীন্দ্রপ্রীতির পরিচয় পাই সেই সময় বাংলা একাডেমী আয়োজিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন অনুষ্ঠানে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে। সেখানে তিনি বলেছিলেন, "নতুন পরিবেশ ও নতুন চেতনায় এবার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ ও অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে। কিন্তু সত্য, শ্রেয়, ন্যায় ও স্বাজাত্যের যে চেতনা বাঙালি কবিগুরুর কাছ থেকে লাভ করেছেন আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে তারও অবদান অনেকখানি। বাঙালির সংগ্রাম আজ সার্থক হয়েছে। বাঙালির রবীন্দ্র-সম্পাদনায় এর চেয়ে বড়ো কোন দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই" (সূত্র : দৈনিক বাংলা, ৮ মে ১৯৭২)।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নূরুল ইসলাম। ২০০৫ সালের মে'ত একান্ত এক আলাপচারিতায় তিনি আমাকে জানালেন, "এমন বড় হৃদয়ের মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ আমি আর দেখিনি। যতদিন সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়েছি ততদিনই লক্ষ করেছি যে তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে শুনতে নাশতা সারছেন।"

সুখে-দুঃখে সবসময় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ছিলেন সে কথা লেখক মাহবুব তালুকদারও জানিয়েছেন। তিনিও তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। পঁচাত্তরের ৭ মে জাহাজ গাজীতে চড়ে বঙ্গবন্ধু যাচ্ছিলেন বাবার চেহলামের উদ্দেশ্যে টুঙ্গিপাড়ায়। মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন কে কোথায় কীভাবে ঘুমুচ্ছেন। জাহাজের দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন মাহবুব তালুকদার। বঙ্গবন্ধু তার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "মাহবুব এইভাবে শুইয়া আছে। একটা বালিশ ওরে জোগাড় কইরা দিতে পারলা না?" এরপর নিজের কেবিনে গিয়ে নিজেরই একটা বালিশ এনে মাহবুব তালুকদারের মাথার নিচে দিয়ে গেলেন। 'পুরো ব্যাপারটা আমার জন্য বিপন্ন বিস্ময়' বলে জানিয়েছেন মাহবুব তালুকদার ('বঙ্গভবনে পাঁচ বছর', মাহবুর তালুকদার ১৯৯২, ইউপিএল, পৃ ১৩৬)। এর পরপরই তিনি যোগ করেছেন, "ভোরবেলা দিনের আলো ফোটার পূর্বেই উঠে পড়লাম। লক্ষ্য করলাম, বঙ্গবন্ধু জাহাজের ডেকে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে একা বসে আছেন। এত সকালে আর কেউ তখনও ঘুম থেকে উঠেনি। আমি নীরবে গিয়ে তাঁর একপাশে দাঁড়ালাম। দেখলাম তিনি পা দোলাতে দোলাতে আবৃত্তি করছেন, "নমোনমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!

গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি...।"

আমাকে দেখে আবৃত্তি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি? রাতে ভাল ঘুম হইছে তো? (মা.তা. ঐ)

রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি নজরুলের আদর্শেও তিনি ছিলেন অনুপ্রাণিত ও বিমোহিত। তাই দেশ স্বাধীন হবার পর কবি নজরুলকে তাঁর ৭৩তম জন্মবার্ষিকীতে ঢাকায় নিয়ে আসার সমস্ত ব্যবস্থা করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি কবি নজরুলকে পত্র লিখেছিলেন এভাবে "মুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জনগণ ও আমার পক্ষে আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনার জন্মবার্ষিকীতে

আপনার আদর্শে বাংলাদেশকে সিক্ত হতে দিন। আমরা সাগ্রহে আপনার আগমনের প্রতীক্ষা করছি" (সূত্র : সংবাদ, ২১ মে ১৯৭২)। বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে কবি আসলেন ঢাকায়। অবিরাম পুষ্পবর্ষণের মাঝে কবি বাংলাদেশে পদার্পণ করলেন। কবি ও বঙ্গবন্ধুর মাঝে এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হলো। বাঙালির এই দুই বিদ্রোহীর মিলনক্ষণটি ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল এক অধ্যায় হিসেবে এরই মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। গণভবন থেকে কাজ সেরে গতকাল বিকেল আড়াইটায় বঙ্গবন্ধু গেলেন তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে। বাড়ি গিয়ে তিনি বুকশেলফ থেকে বের করলেন কবি নজরুলের কাব্যগ্রন্থ সঞ্চিতা। আবেগ আর উচ্ছ্বাস জড়িয়ে আবৃত্তি করলেন 'বিদ্রোহী' কবিতা।

তারপর 'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেইদিন হব শান্ত'–চরণ দুটি আবৃত্তি করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসলেন। তাঁর বাড়ি থেকে আটাশ নম্বর কবির বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত সারাটা পথ আবৃত্তি করলেন কবিতার সেই চরণ দু'টি। হাতে তাঁর পুষ্প নৈবেদ্য।... বঙ্গবন্ধু গভীর শ্রদ্ধাভরে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। পরম স্নেহে বারবার হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন কবির মাথায়, পিঠে, সর্বাঙ্গে। নির্বাক কবি অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন বঙ্গবন্ধুর দিকে। হাত বাড়িয়ে কী যেন বললেন বঙ্গবন্ধুকে, বাকশক্তিহীন সেই মুখের ভাষা বোঝা গেল না। (সূত্র : দৈনিক বাংলা, ২৫ মে, ১৯৭২।)

আমাদের জাতীয় সংগীত ও বঙ্গবন্ধু

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটির প্রতি ছিল তাঁর আলাদা আগ্রহ। এই গানটিকেই যে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত করবেন সেটি বহু আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন। আর এই গানটি সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেবার তিনি পক্ষে ছিলেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয়দফা প্রণয়নের পর থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। বাঙালি ছয়দফাকে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। এই সময়েই 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'আমার সোনার বাংলা' গানটি সর্বত্র প্রচারে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সানজীদা খাতুন ২১-০৫-০৫ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে লিখেছেন, "১৯৫৬ সালের প্রথমার্ধে ঢাকাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতাসুদ্ধ প্রাদেশিক নেতাদের এক বৈঠক হয়েছিল। সংশিষ্ট সকলের জন্যে কার্জন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সে-সভায় আমাকে গান গাইতে বলা হয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গাইতে খবর পাঠান। এর তাৎপর্য তখন বুঝিনি, আজ বুঝতে পারি। সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের কাছে 'সোনার

বাংলা' বিষয়ে বাঙালির আবেগ-অনুভূতি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এ-দেশের নেতা। এর কিছু আগে ২৩ মার্চে পূর্ববঙ্গের নাম পূর্বপাকিস্তান করে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়েছিল। আঞ্চলিক স্বাধীনতার জন্য উত্তাল আন্দোলনের সময়ে বঙ্গবন্ধু সবসময় জাহিদুর রহিমকে এই গান গাইবার জন্য খবর পাঠাতেন। রেসকোর্সের ময়দানে তাঁর সভাতে জাহিদ যে কতবার 'আমার সোনার বাংলা' গেয়েছে! এ-গানের আবেগ বাঙালিকে আমূল নাড়া দিয়েছে। পাকিস্তানি বিরূপ প্রচারণা রবীন্দ্রসংগীত আর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে দ্বিধাগ্রস্ত করে রেখে ছিল। জনপ্রিয় নেতার বাঙালি স্বার্থ-সংরক্ষণমূলক বক্তৃতার সঙ্গে এই বাংলাপ্রীতির গান সকল মানুষকে অমোঘভাবে আকর্ষণ করল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাই মাঠের রাখালও স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গেয়ে উঠেছে। দেশের সর্বজনের অন্তর থেকে উৎসারিত এই গান তাই হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। একুশে ফেব্রুয়ারি কিংবা বাঙালির যাবতীয় আন্দোলনে শিল্পীরা ঐ গান গেয়েছেন বারংবার। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে 'আমার সোনার বাংলা'-র সুর স্বরলিপি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। তখন কেবিনেট ডিভিশনের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু রায় দেন, যে-সুর গেয়ে দেশকে স্বাধীন করা হয়েছে, তা-ই আমাদের জাতীয় সংগীতের সুর। ঘটনা এই যে, সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া রেকর্ড থেকে যে-সুর শুনে শিল্পীরা গানটি তুলেছিলেন, সে-সুর থেকে নিজেরাই খানিকটা সরে যান। আর সেই সুরই গাওয়া হয়ে আসছে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল থেকে এ-পর্যন্ত। বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত আমাদের ভুলের অপরাধকে মুছে দিয়েছিল। আজও সেই সুরেই 'আমার সোনার বাংলা' গেয়ে চলেছি আমরা।'

এক অতৃপ্ত মানুষ

তাঁর সংস্কৃতি ভাবনার পুরো জমিন জুড়েই ছিল এদেশের দুঃখী মানুষ। তিনি শিল্পী কামরুল হাসানের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন শাশ্বত বাংলার আর্টফর্ম কী করে উঠে আসে তাঁর ক্যানভাসে। জয়নুল আবেদীনের পরামর্শ মতো সারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁর ছিল (সূত্র : কাইয়ুম চৌধুরী)। সময়ের অভাবে তিনি তা করতে পারেন নি। সুযোগ পেলেই শিল্পাচার্যের সঙ্গে এদেশের শিল্পকলা নিয়ে কথা বলতেন। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার মানসে বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সোনারগাঁও-এ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গঠন করেন। স্বদেশের শিল্প সংস্কৃতির বিকাশে ও প্রকাশে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। নানা কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্প সংস্কৃতির জন্যে বরাদ্দ ছিল তার বিশেষ সময়। তাই গণভবনকে তিনি

বাঙালির গর্বের ভবন করার মানসে শিল্পী রশীদ চৌধুরীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পছন্দের কেউ গেলে তিনি তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তা দেখাতেন। জনাব আবুল মাল মুহিতকেও তিনি তা দেখিয়েছিলেন। "প্রধানমন্ত্রী একদিন আমাকে নতুন গণভবন দেখাতে শুরু করলেন। তার বক্তব্য ছিল যে এই ভবনটি তিনি ভবিষ্যতের জন্য রেখে যাচ্ছেন, তিনি তো ৩২ নম্বরেই থাকবেন। তিনি আরো বললেন যে ভবনটির আসবাবপত্র, কুশন, ফরাস, পর্দা, দেওয়াল লিখন, ভূষণ, অলংকরণ সবকিছুতে মূর্ত হবে বাংলাদেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য এবং বাঙালির রুচি পছন্দ। শিল্পী রশীদ চৌধুরী ছিলেন এই ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা নিরূপণে নিযুক্ত। মনে হলো (তখনও নির্মীয়মাণ) নতুন গণভবন নিয়ে তিনি খুবই গর্বিত ও তৃপ্ত।" (সূত্র : 'মহাপুরুষদের কথা কাছে থেকে দেখা', আবুল মাল আবদুল মুহিত, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০১, পৃ. ১০২)। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১-৫ মার্চ বন্ধুরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ায় সফরকালে সেখানকার নেতৃবৃন্দের জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে যান কচিকাঁচার মেলার শিশুদের অঙ্কিত চিত্রকর্ম। তাঁর নান্দনিক চিন্তা শুধু গানে, কবিতায় বা শিল্পকলায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি এদেশের মানুষকে নিয়ে যেসব স্বপ্ন দেখতেন সেসবও তাঁর নান্দনিক ভাবনারই অংশ। তাঁর স্বপ্নকে যেসব সাহিত্যিক, শিল্পী ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করতেন তাদের তিনি খুবই আপন ভাবতেন। যে কোনও সাহিত্যিক ও কবির মতো তিনিও ছিলেন এক অতৃপ্ত মানুষ। তাঁর স্বপ্ন পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছিল বলেই তিনি হয়ে পড়েছিলেন খানিকটা অতৃপ্ত, অস্থিরও বটে। তাই তিহাত্তর সালের বিজয় দিবসের প্রাক্কালে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে তাঁর ঐ অতৃপ্তির কথা তুলে ধরে বলেছিলেন, "আমি যে সুখী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি, দুঃখ ও নির্যাতন বরণ করেছি, সেই বাংলাদেশ এখনও আমার স্বপ্নই রয়ে গেছে। গরিব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন না হাসি ফুটবে ততদিন আমার মনে শান্তি নেই।" এমন করে গরিব মানুষের কথা কি আজ আর কেউ ভাবেন? তারা ভালো নেই বলে তিনিও ভালো নেই। তারা খেতে পারেন না বলে তিনিও খেতে পারেন না। গরিব মানুষের সঙ্গে এমন গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। আর সে কারণেই তিনি আজও রয়েছেন তাদের অন্তরের গহিনে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ছিলেন পাকিস্তানে বন্দি। তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে। জেলে কবর খোঁড়া হয়েছে। কিন্তু তিনি অবিচল বাঙালির মুক্তির প্রশ্নে। একাত্তরের শেষদিকে যখন তিনি জানতে পারলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে দেশের মুক্তির জন্য, তখন তাঁর কাছে মনে হয়, "বাংলাদেশ একটি কবরস্থানে রূপান্তরিত। তিনি কল্পনার দৃষ্টিতে দেখছেন মানুষের লাশ মাটিতে পড়ে আছে। নর-নারী এবং শিশুদের হাড় গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বুলেটের ক্ষত থেকে

বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরছে। তাদের অসহায় কাতর মুখাবয়ব যেন আকাশের দিকে চেয়ে আছে।" (রবার্ট পেইন, 'সেই দুঃসময়', সিদ্দিকুর রহমান অনূদিত, পৃ: ২৫৮) ১৯৭২ সালের ৯ মে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানের জনসভায় জনগণের কাছে তাই তাঁর অঙ্গীকার ছিল, "আপনারা জানেন, জীবনে আমি কোনদিন মিথ্যা ওয়াদা করি না। আমি জীবনে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হবার জন্যে রাজনীতি করিনি। একদিকে ছিল আমার প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন আর একদিকে ছিল আমার ফাঁসির ঘর। আমি বাংলার জনগণকে মাথা নত করতে দিতে পারি না বলেই ফাঁসিকাষ্ঠ বেছে নিয়েছিলাম। আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক।" লক্ষণীয় যে, রাজনীতির এই অমর কবির প্রতিটি পঙক্তিই নন্দনতত্ত্বের জারক রসে সিক্ত। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার অঙ্গীকারাবদ্ধ মানবিকতা ও গরিব-হিতৈষী উচ্চতর অনুভূতিসম্পন্ন।

বাংলার কৃষক, শ্রমিকের প্রতি তাঁর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার কারণেই বিশ্বাসঘাতকদের হাতে তিনি প্রাণ দিলেন। তাই গরিব মানুষ তাঁর এই আত্মবলিদানের কথা কোনোদিন ভুলবে না। তাঁর মতো মহামানবের প্রতিকৃতি এতো সহজেই জনমন থেকে আড়াল করা সম্ভব হবে না। কেননা, তিনি তো সাধারণের মনের মণিকোঠার স্থান পেয়েছেন তাঁর সুকর্মের জন্যে। দেশ পরিচালনার জন্য খুব বেশিদিন সময় পাননি তিনি। বিধ্বস্ত অবকাঠামো, কোটি মানুষের পুনর্বাসন, তারুণ্যের আকাশচুম্বি চাহিদা, দেশে-বিদেশে নানা ষড়যন্ত্র, সম্পদের অভাব। তা সত্ত্বেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শিল্প-সংস্কৃতির চেতনাসম্পন্ন উপযুক্ত নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে আধুনিক বিজ্ঞান সম্পন্ন সর্বজনীন শিক্ষার প্রসারে তৎপর বঙ্গবন্ধু 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন এবং তার চূড়ান্ত প্রতিবেদনও গ্রহণ করেন। শত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমুন্নত রাখার জন্যেই তিনি আসতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় ক্যাম্পাসে। বিশ্বাসঘাতকরা তাঁর সেই আশা পূরণ হতে দেয়নি। ক্ষমতায় গিয়েও তিনি তাঁর সাধারণ কর্মীদের কথা মনে রেখেছিলেন। তাই তিনি ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আজ বাংলার নিভৃত কোণে আমার কর্মী পড়ে আছে, যার জামা নাই, কাপড় নাই। তারা আমার কাছে আসে না। আপনাদের অনেকেই এখানে। কিন্তু আমি যদি চর কুকরী মুকরী যাই আমার ঐ ধরনের কর্মী আসে দেখি। এদের

সাথে আমার রক্তের সম্বন্ধ। আজো আমি দেখি তার পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি। আজো দেখি, সেই ছেঁড়া পায়জামা, ছেঁড়া শার্ট, পায়ে জুতা নাই। বাংলাদেশে আমার এ ধরনের লক্ষ লক্ষ কর্মী পড়ে আছে।" সাধারণ মানুষের জন্যে যাঁর এই ছিল উৎকণ্ঠা, তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে নিরন্তর উদ্যোগী ছিলেন যিনি, সেই বঙ্গবন্ধুকে এ-দেশের দুঃখী মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলার সাধ্য কার?

যে মৃত্যুর ভার হিমালয় সমান

তিরিশ বছর আগে তাঁকে কেড়ে নিয়েছে নিয়তি। সেই থেকেই ফেঁসে গেছে বাঙালি জাতি। সভ্যতার কাছে আমাদের হেরে যাবার সেই যে সূচনা, তার যেন আর শেষ নেই। নামছি তো নামছিই। এখন মনে হয় রক্তের দামে কেনা দেশটিকে যেন চেনাই যায় না। যে অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, ন্যায়নিষ্ঠ বাঙালি জাতির অভ্যুদয়ের প্রক্রিয়ায় বিশ্ববরেণ্য শিল্পী রবি শংকর, জর্জ হ্যারিসন, কবি গিনস্‌বার্গ, সাহিত্যিক অন্নদা শংকর রায়ের নৈতিক স্বয়ংস্পর্শ ছিল সেই জাতির কপালে আজ জুটছে সাম্প্রদায়িকতা ও সহিংসতার কলঙ্ক। আজ বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের পরিচয় একটি বোমার দেশ, সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য। বাংলাদেশ আজ যেন 'বাংলাস্তান'। যে দেশে জাতির স্থপতিদের হত্যা করে পার পাওয়া যায়, তিরিশ বছরেও যদি এমন হত্যাকাণ্ডের বিচার না করা যায় তাহলে সে-দেশে সব ধরনের অপরাধ করে পার পেয়ে যাবার সংস্কৃতি সুদৃঢ় হবারই কথা। বাস্তবেও তাই হচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবনের দামই শুধু এখন তুচ্ছ তাই নয়, নেতৃবৃন্দের জীবনেরও দাম প্রায় শূন্যের কোঠায়। ২১ জনের মৃত্যু, এসএএমএস কিবরিয়া, আহসানউল্লাহ মাস্টার, মঞ্জুরুল ইমাম বা কাজী আরিফের হত্যাকাণ্ড সেই সংস্কৃতিরই শেকড়কে পোক্ত করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় ১৭ আগস্টে ফেটেছে পাঁচশ'র মতো বোমা। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়েই চলেছে সেই তাণ্ডব। প্রতিদিনই এমন অসংখ্য আক্রমণ এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের সেই অপসংস্কৃতির অংশ করে ফেলেছে। এ কেমন দেশ যেখানে বিচার না করে মানুষ মারতে পারলে অন্য মানুষেরা উল্লসিত হয়? সরকারই-বা মানুষ মারার এই মহৎ দায়িত্ব কেমন করে নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে পারে? এমন দুর্ভাগা দেশ নিশ্চয় বঙ্গবন্ধু চাননি। আর তাই কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন তাঁকে উদ্দেশ করে লিখতে পারেন– "তুমি কেমন আছো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান? তুমি কি দেখতে পাও তোমার প্রিয় বাংলাদেশকে? এখন তোমার নদীগুলোয় চর পড়েছে, এখন তোমার বৃক্ষসমূহ পত্রশূন্য, তোমার অবারিত মাঠ-প্রান্তর মানুষের লাশে পরিপূর্ণ। তোমার বাংলাদেশের বাতাস নির্যাতিত নারীর আহাজারিতে বিদীর্ণ। মুক্তবুদ্ধির চর্চা এখন ঘাতকের চাপাতির নিচে" (সেলিনা হোসেন, 'বঙ্গবন্ধু তোমার জন্মদিনে', ভো: কা: ১৭ মার্চ' ০৬)। জাতি হিসেবে আমাদের এই অধঃযাত্রার শুরু হয় সেই পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে। পঁচাত্তরেই ঘটেছে এমন

কিছু অন্যায় মৃত্যু যার ভার হিমালয়ের পর্বত সমান। আজও আমাদের অস্তিত্বের সমান মানুষটির হত্যার বিচার আমরা পাইনি। যাঁকে মারতে পশ্চিম পাকিস্তানি হায়েনাদের হাত কেঁপেছিল, কবর খুঁড়েও যাঁকে মৃত্যুর আদেশটি বাস্তবায়নের সাহস রাখেনি শত্রুর দল; আর তাঁকেই কিনা গুলিবিদ্ধ করে তাঁর প্রাণপ্রতিম বাংলাদেশের মাটিতেই লুটিয়ে ফেলল কিছু বিশ্বাসঘাতক। সেদিন বাংলার ব্যর্থ দিগন্ত ছুঁয়ে লালসূর্য ঠিকই নমিত হয়েছিল, কিন্তু অর্ধ-নমিত হয়নি তাঁরই তৈরি লাল-সবুজ পতাকা। শোকে-দ্রোহে সাধারণ মানুষ পাথর বনে গেলেও কুলাঙ্গার ঘাতকদের ঘেরাও করা সম্ভব হয় নি আমাদের পক্ষে। সেই ব্যর্থতার ঘানি আজও আমরা টেনে চলেছি। তীব্র এক পাপ বোধ আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। "আমি মনে করি না যে সারা দেশের প্রতিটি গাছ থেকে ফুল তুলে এনে তোমার কবরে দিলে আমাদের পাপ ক্ষয় হবে।" (সে: হো: ঐ) রণাঙ্গনের লড়াকু বীর, মুক্তির সপক্ষ মানুষ, প্রিয় প্রজন্মের অহঙ্কারী সন্তানেরা তাহলে তোমরা কোথায়? কেন আমরা সবাই ব্যস্ত প্রতিদিনের স্বার্থপরতায়, সীমাহীন নির্লিপ্ততায় এবং ভাবলেশহীন এক রুটিন জীবনযুদ্ধে? যে পরিমাণ ঋণী আমরা তাঁর কাছে তা কি এমনি শোধ হয়ে যাবে? আমাদের কি কিছুই করার নেই? তাঁকে নিশ্চয় শারীরিকভাবে আর ফিরে পাবো না। কিন্তু রাষ্ট্র কি পারে না তাঁর জন্মদিন ও শাহাদত দিবস পালনে অগ্রণী হতে? তিনি তো কেবল বিশেষ কোনো দলের কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সকল বাঙালির।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব তাঁকে আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী করার ক্ষেত্রে। এদেশের কবিরা যেমন শ্রেষ্ঠ সব কবিতা উৎসর্গ করেছেন তাঁকে, তেমনি করেই অন্যান্য সাহিত্যিকদের এগিয়ে আসতে হবে তাঁকে উপজীব্য করে কালজয়ী গল্প, নাটক, উপন্যাস সৃষ্টির লক্ষ্যে। বিদেশ থেকে এসে রবার্ট পেইন যদি লিখতে পারেন 'সেই দুঃসময়', আমাদের নিজেদের কথাসাহিত্যিকরা কেন পারবেন না তাঁকে এবং তাঁর সময়কে ধরে রাখতে? মনে রাখা উচিত মুক্তিযুদ্ধ একটি আদর্শভিত্তিক চলমান প্রক্রিয়া। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, জাতির জীবনে উত্থান-পতন ঘটে, কিন্তু আদর্শের মৃত্যু হয় না। আদর্শ অবিনশ্বর। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও একটি আদর্শের নাম। এটিও এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া কখনও শেষ হবার নয়। এই চেতনার অর্নির্বাণ শিখা জ্বলতেই থাকবে। যুগে যুগে এই চেতনা শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের মুক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস চলমান সেই মুক্তিযুদ্ধেরও নেতৃত্ব দেবেন বঙ্গবন্ধু।

দুঃশাসন, দারিদ্র্য, ব্যাধি, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, অন্যায়-অনাচারের মতো সকল মানুষের 'কমন এনিমি' বা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের বারবার রুখে দাঁড়াতে হবে। এই শত্রু ঘরের ভেতরের বা বাইরের— দুইই হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের এই কালজয়ী

চেতনার কথা আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও সংগ্রাম থেকে জেনেছি। আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁকে যথার্থভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব থেকে আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-নাট্যকার তথা নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্টজনেরা কিছুতেই সরে দাঁড়াতে পারেন না।

উপসংহার

এদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃজনশীল কাজকর্মে বঙ্গবন্ধুকে আরো ভালোভাবে তুলে ধরতে এগিয়ে আসবেন বলে আমি প্রত্যাশা করছি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, যতই মন্দ হোক আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ তার সৃষ্টির বেদনার প্রায় পুরোটাই বয়ে বেড়িয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তিনি না জন্মালে বাংলাদেশ নামের দেশটি আজও হয়তো বিশ্বমানচিত্রে স্থান করে নিতে পারতো না। আমরাও হতে পারতাম না একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। সুতরাং আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই এই বিশাল আকৃতির মানুষটিকে তুলে ধরা চাই আমাদের কবিতায়, গানে, উপন্যাসে, পেইন্টিংয়ে, ভাস্কর্যে, নাটকে ও চলচ্চিত্রে। তিনি ছাড়া বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশ আসলেই যে অপূর্ণ, অচেনা। তাঁর জীবন ও কর্মের কথা তাই শিল্পী-সাহিত্যিকদেরই বেশি করে মনে পড়ার কথা। তাদেরই জোরালো দাবি তোলা উচিত সতেরোই মার্চ এবং পনেরোই আগস্টকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করার জন্যে। সরকার সাড়া দিক বা না দিক, পুরো সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের অস্তিত্বের প্রতীক বঙ্গবন্ধুকে স্মরণীয় করে রাখার সংগ্রামে। বিশেষ করে এই দু'টি দিন আমরা আরও ব্যাপকভাবে নিশ্চয় পালন করতে পারি। আসুন, নানা আয়োজনে, নানা উদ্যোগে আমরা তাঁকে আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের নিত্যসঙ্গী করে তুলি। আসুন শামসুর রাহমানের মতো আমরাও প্রতিজ্ঞা করি :

"যতদিন আমি এই পৃথিবীতে প্রত্যহ ভোরে
মেলবো দু'চোখ, দেখব নিয়ত রৌদ্র-ছায়ার খেলা,
যতদিন পাব বাতাসের চুমো দেখব তরুণ
হরিণের লাফ, ততদিন আমি লালন করব শোক।"
(–শামসুর রাহমান, 'ইলেকট্রার গান')

অথবা আসুন সিকান্দার আবু জাফরের মতো দৃঢ় প্রত্যয়ে বলে উঠি :

"বাঙালির ঘরে ঘরে বাঁচবে বাঙালি তার যথার্থ সম্মানে
মৃত্যুমুখে জননীর কোন পুত্র কন্যা নয়
অশক্ত নির্জীব
সে নাম মুজিব।"
(–সিকান্দার আবু জাফর, 'সে নাম মুজিব')

ঠিক যেমন প্রত্যয় নিয়ে বলে গেছেন আরেক কীর্তিমান বাঙালি অন্নদাশঙ্কর রায় :

"যতদিন রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার,
শেখ মুজিবুর রহমান!"
(অন্নদাশঙ্কর রায়, 'বঙ্গবন্ধু')

পুরো জাতির কাছে আমার আবেদন টুঙ্গিপাড়ায় নির্বিঘ্নে শুয়ে থাকা এই শ্রেষ্ঠ বাঙালির ঘুম যেন আমরা 'স্বাধীনতার ঘোষণা কে করেছেন' এমন অনর্থক বিতর্কের কর্কশ আওয়াজে ভাঙিয়ে না দেই। মাও সেতুংকে নিয়ে চৈনিকরা এমন নিম্নমানের বিতর্ক করেন না। গান্ধীকে নিয়ে ভারতীয়রা এমন রুচিহীন কথা বলেন না। অথচ এই অকৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির একাংশের রুচির কি না এমনই বিকারই ঘটেছে যে, তারা আকাশ সমান এই মানুষটির অস্তিত্বই অস্বীকার করতে চায়। অথচ তিনি মিশে আছেন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এদেশের প্রকৃতির প্রতিটি অঙ্গনে-প্রাঙ্গণে। কেউ কেউ ভুলে যান যে, "কোনো কোনো রক্তের দাগ কিছুতেই শুকোবার নয়" (পাবলো নেরুদা)। মনে রাখা চাই তিনি আমাদের একমাত্র জাতীয় বীর, যিনি একবার নয়, দুই দুইবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। একবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময়, আরেকবার একাত্তরে পাকিস্তানি বন্দিশালায়। দু'বারই তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি ছিলেন অবিচল। বিদেশীদের মৃত্যুজাল জনগণের ভালোবাসায় ছিন্ন করে বের হতে পারলেও স্বভূমিতে তিনি বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়তে পারেন নি। তবে শত্রুরা তাঁকে শারীরিকভাবে কেড়ে নিলেও তিনি রয়ে গেছেন আমাদের অন্তরের গহীনে। দিন দিনই তিনি আরও প্রকাণ্ড হচ্ছেন। এ-সময়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁকে আরও স্পষ্ট করে কীভাবে তুলে ধরা যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাস নিয়ে যেভাবে ধস্তাধস্তি শুরু করেছে, নায়ককে খলনায়ক এবং খলনায়ককে নায়ক করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের সন্তানদের আরও বেশি প্রকৃত ইতিহাস সংলগ্ন করে গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করছি। যদিও জানি ইতিহাস কারও নির্দেশে চলে না, ইতিহাসকে ছাই ছাপা দিয়েও রাখা যায় না; তবুও নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। আসুন আমাদের সন্তানদের আরও বেশি বেশি মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলি। নাম না জানা শহীদদের আত্মদানের কথা বলি। জাতীয় বীরদের কথা বলি। আরও বলি শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর জীবন ও সংগ্রামের কথা। বলি দেশকে ভালোবেসে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করার এই অতুলনীয় জাতীয় বীরের কথা। বলি আমাদের অস্তিত্বের সমান এই মানুষটির কথা। নিরন্তর স্মরণ করি বাংলাদেশের আরেক নাম এই সাহসী বীরের কথা।

বঙ্গবন্ধু, শিল্পাচার্য ও কিছু অনুভব

হাশেম খান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনবার তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম। খুব কাছে থেকে তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। আর যে লোকটির কারণে প্রথমবারের মত বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতে পেরেছিলাম তাঁর নাম নূরুল ইসলাম। নূরুল ইসলাম তার কিশোর বয়স থেকে, সেই পঞ্চাশের দশক থেকে, আওয়ামী লীগের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী, বঙ্গবন্ধুর প্রিয়ভাজন, অত্যন্ত কাছের লোক। আওয়ামী লীগের প্রচারকাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পোস্টার তৈরি করা, লিফলেট, পুস্তিকা ও বিভিন্ন রকম প্রচারকাজ, মুদ্রণ, বিলি ও সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার কাজটি সুচারুরূপে সমাধা করার জন্যে একজন পারদর্শী ও সাহসী ব্যক্তিত্ব এই নূরুল ইসলাম। স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে যে সাড়া জাগানো পোস্টার 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল–তার রূপকার ছিলেন এই নূরুল ইসলাম।

প্রচার কাজে তাঁর নিষ্ঠা ও কর্মোদ্দীপনার কারণে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা অনেকেই তাঁকে সম্বোধন করতেন 'পোষ্টার নূরুল ইসলাম' নামে।

১৯৬৬ সালের এক সন্ধ্যায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তিনি আমার ঠিকানায়–২৫ গোপীবাগ ৩য় গলির বাড়িতে। বললেন, আওয়ামী লীগের ৬-দফার লোগো, পতাকা, প্রচারপুস্তিকা, প্রচ্ছদ ও পোস্টার ইত্যাদি করতে হবে। মুজিব ভাইয়ের সাথে আলোচনা করে এসেছি। আপনাকেই সব করতে হবে।

নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার তখন কোনও পরিচয় ছিল না। তবে ছাত্রলীগের অনেকের সঙ্গেই তৎকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কারণে–বিশেষ করে পোস্টার, ফেস্টুন ডিজাইন করা, ছবি আঁকা ইত্যাদির কারণে পরিচয় ছিল, ঘনিষ্ঠতা ছিল। যেমন, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রব, আবদুর রাজ্জাক, শামসুজ্জামান খান, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, আবদুল আজিজ বাগমার, মাযহারুল ইসলাম বাকী প্রমুখ। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অসংখ্য পোস্টার এঁকেছি, তৈরি করেছি। পোস্টার আঁকা, পুস্তিকার প্রচ্ছদ

কিংবা কোন সভা বা অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি কারণে নূরুল ইসলাম যখন-তখন আমাকে কাজে লাগাতেন। হয়তো আন্দোলনের কাজে আমার আগ্রহ দেখে প্রচার কাজের বিভিন্ন শিল্পকর্মে তিনি আমাকে আস্থাভাজন মনে করতেন। আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগের ফরমায়েশ অনুযায়ী নূরুল ইসলামসহ, তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে সেই ষাটের দশকে কত পোস্টার, ফেস্টুন যে এঁকেছি, ছবি এঁকেছি, প্রচার পুস্তিকার প্রচ্ছদ এঁকেছি, আজ তার হিসেব মেলানো কঠিন কাজ।

যা হোক, তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার সনদ আওয়ামী লীগের ছয়-দফা যা শিগগিরই ঘোষণা করতে যাচ্ছেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ছয়-দফা'র লোগো, পতাকার নকশা ইত্যাদি কাজ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমার মত এক তরুণ শিল্পকর্মীকে এতবড় দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, আমি খুবই ভাবনায় পড়ি। নূরুল ইসলামকে বলেই ফেলি অনেক বড় বড় ও অভিজ্ঞ শিল্পী আছেন তাঁদের কাউকে দিয়ে কাজটা করালে ভাল হত না?

মুজিব ভাইয়ের সাথে সব কিছু আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছয়-দফার এসব কাজ আপনিই করবেন। নূরুল ইসলামের পরিষ্কার জবাব।

প্রায় সাত-আটদিন অনেক নকশা এঁকে, জল্পনা-কল্পনা করে ছয়-দফার লোগো, পতাকার নকশা, পোস্টার ও অন্যান্য শিল্পকর্ম দাঁড় করালাম। শেখ ফজলুল হক মনি ও নূরুল ইসলাম কাজগুলোসহ আমাকে নিয়ে একেবারে নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুখোমুখি। তৎকালীন হোটেল ইডেনের সামনের মাঠে সভার ব্যবস্থা করে ছয়-দফা জনসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা দেয়া হবে। তার প্রস্তুতি পর্বের কাজের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন হোটেল ইডেনের বারান্দায় আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের সাথে বসে আলাপ করছেন। শেখ মনি ও নূরুল ইসলাম আমার আঁকা নকশা ও অন্যান্য শিল্পকর্ম তাঁর সামনে তুলে ধরল। এই প্রথম আমি বঙ্গবন্ধুর সামনে (তখন অবশ্য 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাননি) তাই খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমার আঁকা নকশা, পোস্টার ইত্যাদি তাঁর পছন্দ হবে তো! এরপর এখানে উপস্থিত রয়েছেন অন্যান্য নেতা। তাঁরা সবাই কী বলেন কে জানে!

বঙ্গবন্ধু পাইপ টানছেন আর নিবিষ্ট মনে একটি একটি করে নকশা দেখছেন। অন্যান্য নেতার সামনে নকশাগুলো ঠেলে দিচ্ছেন আর মৃদু ও গম্ভীর স্বরে বলছেন, হ্যাঁ, দেখেন।

আমার বুকে তখন দপ্‌দপ্‌ আওয়াজ। ঘাবড়ে যেয়ে রীতিমত ঘেমে উঠেছি। কী বলেন কে জানে। নকশা ও ছবি যদি পছন্দ না হয়। শেখ মনি বলে উঠলেন, মামা, হাশেম ভাই নকশাগুলোর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা তৈরি করেছেন। হাশেম ভাই, আপনি ব্যাখ্যাগুলো বলুন।

আমি আরো ঘাবড়ে যাই। বঙ্গবন্ধু আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চেহারায় মৃদু হাসি দেখে এবার খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। তিনি খুশী হয়েছেন। বললেন, বেশ ত ব্যাখ্যাগুলো কী একটু শুনি।

সাহস পেয়ে আমি প্রতিটি নকশার অর্থ ও ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে বললাম। বঙ্গবন্ধু অন্যান্য নেতার উদ্দেশে বললেন, আপনারা কী বলেন, মনোগ্রাম আর ডিজাইনগুলো ভাল হয়েছে না? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব ভাল হয়েছে। নূরুল ইসলাম এবার যত তাড়াতাড়ি পারো এগুলো ছেপে বের কর। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যে মঞ্চ থেকে ছয়-দফা ঘোষণা হবে তার 'ব্যাকসিনে' এই 'সিমবলিক' নকশা দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে। আর এই 'মনোগ্রাম' ও নকশা ছয়-দফার সবরকম প্রচারে ব্যবহার করতে হবে।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর সারল। সমস্ত ভয় কেটে গেল আমার। ছয়-দফা'র লোগো, পুস্তিকা ও পোস্টারের ডিজাইন নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পছন্দ হয়েছে। আমি সেদিন হালকা মেঘের সাথে আকাশে ঘুরে বেড়াবার আনন্দ অনুভব করলাম।

শেখ মুজিবের ইচ্ছে অনুযায়ী ছয়-দফা ঘোষণা-মঞ্চে পোস্টারের নকশা ব্যবহার করা হল। ছয়-দফা উপলক্ষে দৈনিক ইত্তেফাক একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলো এবং ইত্তেফাকের পূর্ণ-পৃষ্ঠার প্রচ্ছদে ব্যবহার হল ঘোষণা-মঞ্চের অঙ্গসজ্জা।

বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ আরো ছয় বছর পর ১৯৭৩ সালের মে মাসে। আমার শিক্ষক শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এক সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাংলাদেশের সংবিধান গ্রন্থটি ছেপে বের হচ্ছে। কীভাবে ছাপা হবে, ছবি নকশা কিছু হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হবে। বঙ্গবন্ধুর সাথে আগামীকাল সকাল ১১টায় গণভবনে দেখা করতে হচ্ছে। তুমিও আমার সাথে যাবে।

পরদিন যথারীতি শিল্পাচার্যের সঙ্গে গণভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে হাজির। সেখানে আগেই উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। তিনিই সংবিধান গ্রন্থটির শিল্পমান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য শিল্পাচার্য ও বঙ্গবন্ধুর সেই সভার আয়োজন করেছিলেন। ঘরে ঢুকতেই সফেদ পাঞ্জাবী, পাজামা ও মুজিব-কোট পরিহিত শেখ মুজিব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আবেদিন ভাই, আসুন।

তারপর করমর্দনের জন্যে দু'জনকেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবেদিন স্যার আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করলেন। বঙ্গবন্ধু মাঝখানে শিল্পাচার্যকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, আবেদিন ভাই, আপনি বসুন, আমিই ওর পরিচয় দিচ্ছি। ও আমার ছয়-দফার মনোগ্রাম, নকশা, পোস্টার করেছিল। ছয়-দফা

ঘোষণার জন্যে যে মঞ্চ তৈরি হয়েছিল তার ব্যাকসিনটা ও এত সুন্দরভাবে করেছিল আমার এখনো সব মনে আছে। ছয় রঙ, ছয়টি গঠন ও আকৃতি ইত্যাদি দিয়ে সেদিন ছয়-দফার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল আমি আগে ভাবতেই পারিনি আমার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও বাঙালিদের ন্যায্য অধিকারসহ নকশা, ছবি দিয়ে ছয়-দফার এত চমৎকার ব্যাখ্যা হয়। আবেদিন ভাই, সংবিধান গ্রন্থে ছবি আঁকার জন্যে আপনি ঠিক লোককেই পছন্দ করেছেন।

আমি বিস্ময়ে অভিভূত। সেই কবে ১৯৬৬ সালের এক বিকেলে বিশ মিনিটের এক সাক্ষাৎ। আমার মত এক সাধারণ তরুণের কথা 'ছয়-দফা'র মনোগ্রাম ও পোস্টারের নকশা, তার ব্যাখ্যা সব কিছু এতদিন পর তাঁর মনে আছে। গত ছয় বছরে তাঁর ওপর দিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। কতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। ঊনসত্তরের আন্দোলন, আগরতলা মামলা, স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানের জেলে দুর্বিষহ জীবন, ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন, দেশকে গড়ে তোলার এক দুর্জয় স্বপ্ন নিয়ে এগুচ্ছেন। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র স্মৃতিও তাঁর কাছে ম্লান নয়।

সেদিন অনেক কথাই আলোচনা হল। তবে মূল আলোচনা ছিল সংবিধান গ্রন্থটির ছবি-নকশা ইত্যাদি সমন্বয়ে একটি সুদৃশ্য গ্রন্থ তৈরি করা। বঙ্গবন্ধু শিল্পাচার্যকে বললেন, আবেদিন ভাই, পাকিস্তানীরা সবই তো ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। সব সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। আমার কাছে জাতির অনেক চাওয়া এবং পাওয়া, আমি যে কী দিতে পারবো জানি না। অনেক পরিশ্রম করে আমরা একটা সংবিধান তৈরি করেছি– আট কোটি বাঙালির মুখে হাসি ফোটানোর জন্যে, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে সরকারের কিছু নিয়ম, আইন ও দলিল। আমি কিছু দিবার না পারলেও আমার পরে যারা আসবে অন্তত এই সংবিধান সামনে রেখে তারা জাতিকে নিশ্চয় কিছু দিবার পারবে। আবেদিন ভাই, সংবিধানের মত রস-কষহীন একটা বিষয় কতটুকু শৈল্পিকভাবে ও সুন্দরভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরবো সেই পরামর্শ আপনি ছাড়া আর কে দেবার পারবে। আমি কাজ করবার পারি, খাটবার পারি কিন্তু তা সুন্দরভাবে করা, কাজকে শৈল্পিক রূপ দেয়া আপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। এই সংবিধান গ্রন্থের রূপ কেমন হবে, ছবি, নকশা এসবের প্রয়োজন আছে কী নেই— সুন্দর প্রকাশনার দায়িত্বটুকু আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।

শিল্পাচার্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুকে দেখছিলেন, তাঁর কথা শুনলেন এবং বললেন, আপনি যা চাইছেন, তা আমরা শিল্পীরা কতখানি পারবো জানি না, তবে আমরা আপনার সাথে আছি। যে সোনারবাংলা গড়ার স্বপ্ন আপনি দেখছেন–আজন্ম এই ইচ্ছাকেই তো আমি লালন করে চলেছি। আজ আপনার উৎসাহ ও স্বপ্ন আমাকে এবং শিল্পী সমাজকে অনুপ্রাণিত করছে।

এরপর প্রায় চারমাসের অনলস কর্মের ফলে শিল্পাচার্যের নেতৃত্বে ড. কামাল হোসেন ও আমরা পাঁচজন শিল্পীর একটি দল দিনরাত পরিকল্পনা, চিন্তা এবং তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী সংবিধানের প্রতিটি পাতার জন্য নকশা তৈরি করি। যার মধ্যে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোকাচারের রঙ রেখার ব্যবহার করে, বাংলার রূপ-বৈচিত্র্যের এক আবহ সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়েছে।

সংবিধান গ্রন্থের অন্যান্য শিল্পীরা হলেন জুনাবুল ইসলাম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, আবুল বারক আলভী ও ক্যালিগ্রাফির জন্য আবদুর রউফ।

সংবিধান গ্রন্থটি যেটি বাংলা ভাষায়, সেটিতে মুদ্রণ যন্ত্রের টাইপ ব্যবহার না করে প্রতিটি পৃষ্ঠা হাতে লেখা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা হাতের লেখা ব্যবহার করে পুরো গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষার গ্রন্থটিতে টাইপ ব্যবহার করা হয়েছিল। এমন একটি মূল্যবান দলিল-গ্রন্থ ইচ্ছে করলে দেশের বাইরে যে কোনও উন্নত দেশ থেকে সুন্দর পরিপাটি মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা যেত। অনেকেই সেই পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পাচার্য, বঙ্গবন্ধু ও ড. কামাল হোসেন একটি বিষয়ে একমত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তা হলো–আমাদের যা সম্পদ আছে, যে প্রযুক্তি আছে, যে কর্মী আছে, শিল্পী আছে তা দিয়েই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। যে নিষ্ঠা ও চেতনা নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি–দেশ গড়ার কাজেও মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে কাজে লাগাতে হবে। নিতান্তই প্রয়োজন না হলে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই সংবিধান গ্রন্থের জন্যে শুধু কিছু উন্নতমানের কাগজ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সরকারি মুদ্রণালয়ের অতি পুরনো একটি মুদ্রণ যন্ত্রকে সামান্য মেরামত করে গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেশ তখন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত হলেও ঢাকা ও চট্টগ্রামে কয়েকটি উন্নতমানের মুদ্রণালয় থাকা সত্ত্বেও একটি আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে ও সরকারি মুদ্রণালয় এবং সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ববোধকে সচেতন করার প্রয়োজনে এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সত্যি সত্যি সরকারি মুদ্রণালয়ের কর্মচারী ও কর্মকর্তারা সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটি সমাধা করেছিলেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করায় সরকারের প্রতি তাদের সন্তোষ প্রকাশ পায়। সংবিধান গ্রন্থটির মুদ্রণ শেষ হলে সরকারি মুদ্রণালয়ে এক সমাবেশে কর্মচারী ও কর্মকর্তারা–তাদের প্রতি সরকারের আস্থা ও দায়িত্ব অর্পণের কারণে বঙ্গবন্ধু, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে তাদের আনন্দ, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। সোনারবাংলা গড়ার কাজে বঙ্গবন্ধুর হাতকে বলিষ্ঠ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ইচ্ছাকেও প্রকাশ করে।

শিল্পাচার্য ও ড. কামাল হোসেন শিল্পকর্মে শোভিত ও পরিপাটিভাবে মুদ্রিত সংবিধান গ্রন্থটি নিয়ে গণভবনে বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিলেন। সঙ্গে আমরা পাঁচজন

শিল্পী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধু একটি একটি পাতা তুলে সংবিধানের পৃষ্ঠাগুলো অবাক হয়ে দেখছেন। কিছুক্ষণ দেখার পর মুগ্ধ ও অভিভূত দৃষ্টিতে আমাদের সবার দিকে তাকালেন। বললেন, আবেদিন ভাই, এত সুন্দর কী করে করলেন! আমি যে ভাবতেই পারছি না! কিছুই তো ছিল না, ভাঙ্গা প্রেস, ভাল কালি নেই— তারপরও আপনি কি অসাধ্য সাধন করলেন। আপনারা শিল্পীরা কত সুন্দর ও পরিপাটি করে বাংলার মানুষের জন্য সংবিধান গ্রন্থ তৈরি করলেন। কিন্তু আমি কি করি? আমি কি পারব আমার বাংলাকে এত সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে? এই যেমন আপনারা পারলেন এই সংবিধান!

–বঙ্গবন্ধু, এই কাজটা তো আপনিই করলেন। আপনার পরিকল্পনা ও চিন্তাকে আমরা একটা রূপ দিলাম। আমরা আপনার হাতিয়ার, আপনার কর্মী। বাংলার মানুষের দেশ গড়ার সংবিধান–শৈল্পিক রূপ লাভ করুক, সুন্দর একটি চেহারা অর্জন করুক–আপনার স্বপ্ন ও অভিলাষকেই আমরা শিল্পীরা রূপ দিয়েছি। আমাদের শিল্পীদের মত বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ ও কর্মী আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। যাকে যে কাজে প্রয়োজন আপনি আহ্বান জানালেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনার আহ্বানেই যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাকসেনাদের মত অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যা বাংলার মানুষের ছিল না। তবুও তারা যুদ্ধ করেছে। ৩০ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়েছে। তেইশ বছর সংগ্রাম ও নয়মাস হাতিয়ার দিয়ে যুদ্ধ করে বলিষ্ঠ ও দক্ষ পাক বাহিনীকে হটিয়ে নিজের দেশকে মুক্ত করেছে। আজ আপনার স্বপ্ন–এই বিধ্বস্ত বাংলাকে সোনার বাংলা রূপে গড়ে তুলবেন। বাংলার মানুষ আপনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্যে তৈরি, আপনি ডাকুন।

বঙ্গবন্ধু অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন সংবিধান গ্রন্থটি। তারপর বললেন,— আবেদিন ভাই, আপনি তো আমার কাজটা করে দিলেন। এখন আমি আপনাদের জন্যে কি করতে পারি বলুন।

–আমি এবার একটা কাজে হাত দিতে চাই। আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন। শিল্পাচার্য বঙ্গবন্ধুকে বলতে লাগলেন— ঢাকার পাশে যে ঐতিহাসিক সোনারগাঁ, সেই সোনারগাঁ'কে আমি নতুন রূপে গড়ে তুলতে চাই। এই অঞ্চলেই তৈরি হত সারা বিশ্বে খ্যাত শিল্পকর্ম 'মসলিন' যা আজ হারিয়ে গেছে। এমনিভাবে বাংলার অনেক ঐতিহ্য ও লোক শিল্প আজ লুপ্তপ্রায় এবং যে কটি বেঁচে আছে তা কোন কদর পাচ্ছে না। বাংলার লোক ঐতিহ্য ও শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এবং পুনর্জীবিত করার জন্যে এখনি পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সোনারগাঁয়ে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মধ্যমে আমাদের লোকশিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের শিল্পকর্মে উৎসাহ প্রদান ও উজ্জীবিত করার প্রয়াসে আমি একটি বৃহৎ

পরিকল্পনা নিয়েছি। আর তা বাস্তবায়নে আপনার সাহায্য ও উৎসাহ প্রয়োজন। সোনারগাঁকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলে আপনার সোনারবাংলা গড়ার কাজ অনেকখানি এগুবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধু একটু অবাক হয়ে শিল্পাচার্যের দিকে তাকালেন। একটু সময় নিলেন। সংবিধানের পাতা উল্টাতে উল্টাতে আনন্দ ও বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, আবেদিন ভাই, আপনি আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী এখুনি কাজে নেমে যান। আমি এবং বাংলাদেশ সরকার আপনাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। শুধু আমার ছোটো একটা অনুরোধ, সোনারগাঁয়ে মাঝে মাঝে আমি আপনার কাছে গিয়ে থাকবো। আমার জন্য আপনার পাশে একটু জায়গা রাখবেন। সুন্দর কিছু সৃষ্টি করার শক্তি ও প্রেরণা আপনার কাছ থেকে যাতে পেতে পারি ও শিখতে পারি সেই ব্যবস্থা আমাকে করে দেবেন।

সংবিধান এবং সোনারবাংলা গড়ার স্বপ্ন–দুটি মানুষের কথোপকথন। আমি সেদিন বিমোহিত। মহামানব দেখতে কেমন হয়, এমন কোন ধারণা আমার নেই। কিন্তু সেদিন এই দু'জনকে আমার মনে হয়েছে, দুই মহামানবের সম্মুখে আমরা। বিশাল বক্ষ দু'জনের। যে বক্ষ ধারণ করে আছে বাংলার আপামর মানুষকে। সোনারগাঁ ও সোনারবাংলা গড়ার স্বপ্নকে। দুজনের মধ্যেই এক অদ্ভুত মিল। এই দুই মহামানব হারিয়েও গেছেন আমাদের মাঝে থেকে প্রায় একইভাবে। দুজনকেই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে মানবজাতির শত্রুরা— দুর্বৃত্ত ও দুর্জনরা। শিল্পাচার্যকে অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিল–দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগ আর বঙ্গবন্ধুকেও অকস্মাৎ হত্যা করল কিছু দূর্বৃত্ত–সৈন্য–বাংলার শত্রু!

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ পঁচিশ বছর। শিল্পাচার্যের সোনারগাঁ গড়ার স্বপ্ন সফল হল না। কী কাকতালীয় মিল। বঙ্গবন্ধুর সোনারবাংলা গড়ার স্বপ্নও সফলতার মুখ দেখল না।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও যাত্রাপালা

ড. তপন বাগচী

বাংলাদেশের যাত্রাপালায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উপস্থাপিত হয়েছে গৌরবের সঙ্গে। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের জানার কিংবা জানানোর আগ্রহ তেমন তীব্র নয়।

থিয়েটারের মঞ্চে শতনিম্ন দর্শক হলেও পত্রিকার পৃষ্ঠাজুড়ে তাঁর প্রশংসা ছাপা হয়, পাত্রপাত্রী-নির্দেশকের ছবি-মন্তব্য ছাপা হয়। এটি ভালো কথা। কিন্তু ১০ হাজার দর্শকশ্রোতাকে সারারাত আনন্দ দিতে পারলেও যাত্রানুষ্ঠানের খবর আমরা রাখি না। এইসব প্রতিকূলতা ছাপিয়েও যাত্রা টিকে আছে আবহমানকাল ধরে। সম্প্রতি 'প্রকাশ্য পারফরমেন্স'-এর অনুমতি না দেয়ায় যাত্রাশিল্পটাই ধ্বংস হতে চলেছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের হাজার বছরের গৌরবময় কীর্তিগাথা ও নীতিশিক্ষা প্রচারে যাত্রার রয়েছে প্রভাবসঞ্চারী অবদান। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যাত্রা তথা স্বদেশী যাত্রা তথা মুকুন্দদাসের যাত্রার অবদান আজ সুবিদিত। একাত্তর সালে এবং পরবর্তীকালে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের গৌরব নিয়ে রচিত হয়েছে বেশ কিছু যাত্রাপালা, আমাদের নাট্যগবেষকদের কাছে যা এখনো পাঙক্তেয় হয়ে ওঠেনি হয়তো। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালা নিয়ে তেমন কোনও কাজও আমাদের চোখে পড়ে না। আমাদের আলোকোজ্জ্বল নাট্যমঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের নাটক এসেছে। কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তেমন নাটক কই? আবদুল গাফফার চৌধুরী 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি' বাদে আর কোনও নাটকে কি বঙ্গবন্ধু এসেছেন নায়ক হিসেবে? সে রকম গৌরবের সমাচার আমাদের নাট্যমঞ্চে নেই বলেই জানি। কিন্তু 'অবহেলিত যাত্রামঞ্চ' বঙ্গবন্ধুকে নায়ক করে পালা লিখেছে, মঞ্চায়ন করেছে খোদ উনিশ শ' একাত্তর সালেই। এই কৃতিত্ব প্রথম অর্জন করেছে ভারতের খ্যাতিমান যাত্রাপালাকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দুরন্ত পদ্মা' যাত্রাপালার মাধ্যমে। এই '৭১ সালেই প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় রচনা করেন 'আমি মুজিব নই' নামের নাটক। নাটক হলেও এটি নাট্যমঞ্চে নয়, যাত্রামঞ্চেই এর ঠাঁই হয়েছে। একাত্তর সালেই রচিত হয় আরও ৮টি যাত্রাপালা। প্রখ্যাত নাট্যকার উৎপল দত্তের 'জয়বাংলা', নরেশ

চক্রবর্তীর 'সংগ্রামী মুজিব', নিরাপদ মণ্ডলের 'মুক্তিফৌজ', সত্যপ্রকাশ দত্তের 'বঙ্গবন্ধু মুজিবুর', ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গবন্ধুর ডাক'। এছাড়া 'সাতকোটির মুজিব' নামে আরও একটি যাত্রাপালার নাম ও মঞ্চায়নের খবর পাওয়া গেলেও এর রচয়িতার নাম জানা যায়নি।

তর্কের খাতিরে উৎপল দত্তের 'জয়বাংলা' পালাকে কেউ নাটক বলে আখ্যা দিতে পারেন। তাতে কিছু যায় আসে না। এটি যাত্রামঞ্চের অভিনয়-উপযোগী করে রচনা। মজার ব্যাপার হলো একাত্তর সালে রচিত এই ৮টি পালার রচয়িতা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের। তবে সত্য-প্রকাশ দত্ত এবং মন্মথ রায় একসময়ে বাংলাদেশে ছিলেন, উনিশ শ' সাতচল্লিশের পরে তাঁরা দেশত্যাগ করেন। সত্যপ্রকাশ দত্ত যাত্রাপালাকার হিসেবে শীর্ষস্থানীয়। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পরে ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কমলেশ ব্যানার্জি, রঞ্জন দেবনাথ প্রমুখের পাশাপাশি সত্যপ্রকাশ দত্ত এখনো অনিবার্য পালাকারের নাম। আর মন্থথ রায়ের নাট্যখ্যাতি তো সুবিদিত।

স্বাধীনতার পরের বছর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আরও তিনটি যাত্রাপালা রচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের পালাকার অরুণ রায়, সাধন চক্রবর্তী এবং মৃণাল কর। পালা তিনটির নাম যথাক্রমে 'আমি মুজিব বলছি', 'শেখ মুজিব' এবং 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'। মৃণাল করের রচিত, অভিনীত ও পরিচালিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' পালাটি বাংলাদেশও মঞ্চস্থ হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা লেখা হয়েছে, পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। একাত্তর সালের পরেও এ সকল পালা বিভিন্ন যাত্রাদল আসরস্থ করে। এটি অবশ্যই গৌরবের ব্যাপার।

মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের পালাকার পরিতোষ ব্রহ্মচারী, কবিয়াল বিপিন সরকার এবং অভিনেত্রী জ্যোৎস্না বিশ্বাস রচিত তিনটি পালায় মুক্তিযুদ্ধকে পাওয়া যায়। এদের পালা তিনটি নাম যথাক্রমে 'নদীর নাম মধুমতী', 'মুক্তিসেনা' ও 'রক্তস্নাত একাত্তর'। প্রথম দুটি পালা লেখা হয় ১৯৭৪ সালে এবং শেষের পালা লেখা হয় ১৯৯৬ সালে। মানসম্পন্ন না হলেও আরও চারটি যাত্রাপালা রচনা, গ্রন্থাকারে প্রকাশনা ও মঞ্চায়নের খবর পাওয়া যায়। দিলীপ সরকার রচিত 'বাংলার বিজয়' (১৯৯৪), এম. এ. মজিদ রচিত 'সোনার বাংলা' (১৯৯৫), আবদুস সামাদ রচিত 'একাত্তরের জল্লাদ' (১৯৯৬) এবং নজরুল ইসলাম সাজু রচিত 'বাংলার মুক্তি' (১৯৯৭) পালাগুলো বিভিন্ন আসরে মঞ্চস্থ হয়েছে।

অন্য পালাগুলোও মঞ্চসফল হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। নগরের শিক্ষিত ও সচেতন নাট্যকারদের হাতে এখনও বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে ইতিহাসসিদ্ধ নাটক রচিত হয়নি। অথচ সাধারণ মানুষের যাত্রামঞ্চের জন্যে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে ১৮টি পালা রচিত ও অভিনীত হয়েছে। যাত্রাপালাকার ও শিল্পীদের এই সমবেত প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবিদার।

শুধু মুক্তিযুদ্ধ নয়, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক পালারচনা সাহসের পরিচয়বাহী। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক তাজউদ্দিন আহমেদের চরিত্রও ফুটে উঠেছে নিরাপদ মণ্ডলের 'মুক্তিফৌজ' পালায়। আটটি পালায় এসেছে সরাসরি মুজিবের নাম। তিনটি পালার নামে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি এসেছে। মন্মথ রায়ের পালাটি থিয়েটারের জন্যে রচিত হলেও যাত্রামঞ্চে এটি গৃহীত হয়েছিল। পঁচাত্তর সালের পরে শেখ মুজিবের জীবনভিত্তিক পালাগুলো পেশাদার দলে অভিনীত হচ্ছে না। ইতিহাসের এই গৌরবের অধ্যায় নিয়ে এ যাবৎ মোট ১৯টি পালা রচিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। সকল পালা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এর মধ্যে ৮টি পালা রচিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে ১৯৭১ সালেই, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দুরন্ত পদ্মা' পালাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পালাটি রচিত হয়। আগস্ট মাসে এটি রচনা সম্পন্ন হয় এবং ডিসেম্বর মাসে এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় গণ-সংস্কৃতি সংঘ এটি প্রথম মঞ্চে আনে। এই পালাটি 'সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার' লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আরেকটি যাত্রাপালা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। নিরাপদ মণ্ডল রচিত এই যাত্রাপালার নাম 'মুক্তিফৌজ'। পালাকার একে 'জয়বাংলার ইতিহাস' নামে আখ্যা দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূরের টাউনশিপ গ্যারেজ ময়দানে ১৯৭১ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে (২ আশ্বিন ১৩৭৮) খেয়ালী নাট্যসমাজ এই পালাটি মঞ্চায়ন করে। পালাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় পালাকার বলেছেন–'পাকিস্তান সরকারের জঙ্গী মনোভাবের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে এগিয়ে এল বাংলাদেশের তরুণ সমাজ। 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে বাংলার আকাশ-বাতাস-মাটি মুখর হয়ে উঠল। ইয়াহিয়া খান লেলিয়ে দিল তার সেনাবাহিনী। শুরু হলো বাঙালির ওপর অমানুষিক অত্যাচার; নেমে এল দেশের বুকে রক্তের বন্যা। তারপর সব ইতিহাস। সে ইতিহাস রচনা হলো বাংলাদেশের তাজা তরুণ রক্তে। সেই রক্তের আখরে লেখা মুক্তিফৌজের অমর কাহিনী আমার অক্ষম লেখনীতে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।' [নিরাপদ মণ্ডল, মুক্তিফৌজ, নির্মল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৭২, ভূমিকা]

বাংলাদেশের যুদ্ধের কাহিনী এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনীতির ওপর ভিত্তি করে সত্যপ্রকাশ দত্ত রচনা করেন 'বঙ্গবন্ধু মুজিবুর' নামের যাত্রাপালা। ১৯৭১ সালে লেখা উৎপল দত্তের 'জয়বাংলা' মুক্তিযুদ্ধের সময় লোকনাট্য যাত্রাদল মঞ্চস্থ করে। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গবন্ধুর ডাক' নামে একটি যাত্রাপালা রচনা করেন। 'সাত কোটির মুজিব' পালাটি জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে এর রচয়িতার নাম জানা যায়নি। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' পালাটি ১৯৯৬ সালে জয়বাংলা

সাংস্কৃতিক ঐক্যজোটের আমন্ত্রণে ইন্দ্রসভা অপেরা ঢাকার মঞ্চে অভিনয় করে। বঙ্গবন্ধু চরিত্রে অভিনয় করেন পালাকার ও নির্দেশক মৃণাল কর।

পরিতোষ ব্রহ্মচারীর 'নদীর নাম মধুমতী' তুষার অপেরার মাধ্যমে অভিনীত হয়। জ্যোৎস্না বিশ্বাসের 'রক্তস্নাত একাত্তর ' পালাটি ঢাকার মঞ্চে ১৭ বার অভিনীত হয়েছে। এম.এ. মজিদ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 'সোনার বাংলা' নামে একটি পালা রচনা করেন বলে দাবি করেন। এছাড়া দিলীপ সরকারের 'বাংলার বিজয়' এবং নজরুল ইসলাম সাজুর 'বাংলার মুক্তি' যাত্রামঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করে রচিত হলেও শিল্পমূল্যবিচারে এগুলো মানসম্পন্ন নয়। তবে নড়াইল জেলার কালনা গ্রামের কবিয়াল বিপিন সরকারের লেখা 'মুক্তিসেনা' নামের পালাটি মাগুরার চৈতালী অপেরায় যশের সঙ্গে অভিনীত হয়। গ্রাম-কবিয়ালের এই পালাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের থিয়েটার তথা নাগরিক নাট্যসমাজ যা পারেনি, যাত্রা তা পেরেছে। মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু তো বটেই, 'হিটলার', 'লেনিন', 'হো-চি মিন' পালা যাত্রায় এসেছে। এ কারণেই নাট্যগবেষক প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেছেন, 'বর্তমানে অর্থাৎ সত্তর দশকে অবশ্য ঐতিহাসিক যাত্রাপালা বিষয়বস্তুর দিক থেকে থিয়েটারের নাটককে পেছনে ফেলে এসেছে বললেই হয়' [প্রভাতকুমার গোস্বামী, দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৭৮, পৃ. ৩০৬]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী নিয়ে রচিত পালাকে আমরা ঐতিহাসিক পালা বলতে পারি। কিন্তু এই কাহিনী নিয়ে একাত্তর সালে যখন পালা লেখা হল তখন একে রাজনৈতিক পালা বলা সঙ্গত ছিল। তবে একটা সময়ে ঐতিহাসিক পালা ও রাজনৈতিক পালা সমার্থক হয়ে যায়। তবে ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র যে সকল ক্ষেত্রে যথার্থ হয়, এমন নয়। কাল্পনিক রাজা-বাদশা নিয়েও ঐতিহাসিক পালা রচিত হয়েছে।

যাত্রার পৌরাণিক কাল পেরিয়ে আসে ঐতিহাসিক পালার কাল। গানের সুর অনেক দূরের শ্রোতার কানে পৌঁছে যেত। গানের স্থলে এল সংলাপ। তাই সংলাপের সুরও হয়ে উঠল চড়া। রাজা-বাদশার-ঘোষণা আর খবরদারির ভাষা একটু চড়া সুরেই হয়। তাই যাত্রাপালায় ঐতিহাসিক কাহিনী বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পৌরাণিক পালার সংখ্যা যত কমতে লাগল, তত বাড়তে লাগল ঐতিহাসিক পালা। গবেষক প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেছেন, 'যাত্রায় যে উচ্চগ্রামের জমজমাট সংলাপ তা ঐতিহাসিক চরিত্রে সংযোজিত করার অনেক সুবিধা। এইসব কারণে ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে যাত্রার পালাও রচিত হইয়া থাকে। [প্রভাতকুমার গোস্বামী, দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৭৮, পৃ. ২৯৪]

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাত্রাপালা রচনা ও মঞ্চায়নের সুযোগ রয়েছে ওই কারণেই। তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব, বর্ণাঢ্য কর্মময় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বমুখর জীবন, মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারী, উদ্দীপনাময় ভাষণের স্রষ্টা– এই সকল কারণে কাহিনীকে আকর্ষণীয় ও সংলাপকে জমজমাট করে তোলা যায়।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি' রচনা করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আগে, সেই একাত্তর সালেই অভিনয়মঞ্চে বঙ্গবন্ধু এসেছেন। যাত্রার নাম শুনলে সুধীনাট্যজনেরা না হয় মুখ ফিরিয়ে নেবেন 'ফাত্রা' মানুষের কর্ম ভেবে। কিন্তু নাট্যকার মন্মথ রায় এবং উৎপল দত্ত যখন নাটক লিখলেন, থিয়েটার মঞ্চ তো তাকেও বরণ করেননি। সেই 'ফাত্রা' লোকের যাত্রাই কিন্তু তাঁদের নাটককেও যাত্রামঞ্চে নিয়ে এসে লাখো মানুষের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে। শক্তিশালী এই যাত্রামাধ্যমকে ব্যবহার করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে জাতির প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর চলচ্চিত্র ভাবনা

আনু মাহ্‌মুদ

বঙ্গবন্ধু পাঁচ মিনিটও সময় না নিয়ে প্রশ্ন রাখলেন, 'আমি আমাদের চলচ্চিত্রের বিকাশের জন্য সকল রকম নিরাপত্তা দেব। কিন্তু তোমরা আমাকে কথা দিতে পারবে, দেশে আরও বেশিসংখ্যক ছবি করবে, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও শিল্পমানসম্পন্ন ছবি করবে, যা নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে নিজেদের পরিচিত করাতে পারে।'

সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন–হ্যাঁ, বঙ্গবন্ধু আমরা পারবো, কথা দিচ্ছি। আপনি ৫২টি ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী বাতিল করুন।

চলচ্চিত্রের উন্নয়ন ভাবনাও যে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি থেকে এড়ায়নি সে বিষয়ের আলোকেই এ প্রবন্ধটি উপস্থাপনা করেছেন রীটা কে. আফজাল এভাবে–

চলচ্চিত্র সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও এ দেশে এমনকি পাকিস্তানি আমল থেকেও কোনো সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ চলচ্চিত্র নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে এই মাধ্যমটি। অথচ চলচ্চিত্র মাধ্যম শিল্পচর্চার ক্যানভাস শুধু নয়, সরকারও বিপুল পরিমাণ রাজস্ব পেয়ে থাকে এই খাত থেকে।

এখানে অবশ্যই ব্যতিক্রম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু এ দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সৃজনশীল কর্মধারায় উৎসাহ দেয়ার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল জাতীয় চলচ্চিত্র কমিশন গঠন। ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে এই কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে একটি মেমোরেন্ডাম তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী, একজন সাংবাদিক এবং একজন চলচ্চিত্রকার এই মেমোরেন্ডাম তৈরি করেছিলেন। উল্লিখিত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ১৯৭৯ সালে লোকান্তরিক হয়েছেন। তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী কোথায় আছেন, তাও সকলের জানা। সাংবাদিক ভদ্রলোক এখনো পেশায় আছেন। ভেতরকার কিছু তথ্য তার কাছ থেকে জানতে পেরেছি।

তিনি যা জানালেন, 'বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে আমি এবং প্রয়াত কমরেড চলচ্চিত্রকার মিলে পরিশ্রম করে জাতীয় চলচ্চিত্র

কমিশনের জন্য মেমোরেন্ডাম তৈরি করি। এতে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে একটি কমিশনের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছিল। যেমন চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (এফডিসি), ফিল্ম সেন্সর বোর্ড এই কমিশনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আরো নতুন করে যুক্ত হবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং ভারতের স্টাইলে ফিল্ম ফাইন্যান্স করপোরেশন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের একটি নীতিমালাও সেখানে ছিল। অন্যদিকে ফিল্ম ফাইন্যান্স করপোরেশন বছরে একাধিক শিল্পসম্মত ছবি নির্মাণের পুরো অর্থটাই প্রদান করবে। এছাড়া নিজ অর্থে কোনো সৎ চলচ্চিত্র নির্মিত হলে তাকে করমুক্ত করা হবে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ ছবিটিকেও করমুক্ত করা হবে।

প্রস্তাবিত জাতীয় চলচ্চিত্র কমিশন এসব নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কমিশনের চেয়ারম্যান করা হবে একজন চলচ্চিত্র জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীকে, যিনি ন্যূনতম প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা পাবেন। এই মেমোরেন্ডার খসড়া হিসেবে বঙ্গবন্ধুর হাতে অর্পণ করা হয়েছিল আগস্টের প্রথম সপ্তাহে। কথা ছিল বঙ্গবন্ধু আগস্টের তৃতীয় কিংবা শেষ সপ্তাহে অনুমোদন দিলে চেয়ারম্যানসহ পুরো কমিশন গঠিত হবে এবং ১ সেপ্টেম্বর '৭৫ থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র কমিশন কাজ শুরু করবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সেই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেনি। চলচ্চিত্র নির্মাতারাও বঞ্চিত হলেন একটি বিশাল আয়োজন থেকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতের আঁধারে ঘাতকরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) ও শেখ রেহানা বিদেশ ছিলেন বলেই প্রাণে বেঁচে যান।

ইতিহাসের নির্মম ট্র্যাজেডিতে কিছু ঘটনা ঘটে যায়, থেকে যায় একটি স্রোত, একটি চেতনা। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তেমনই একটি স্রোত। ইতিহাসই তার প্রয়োজনে শেখ হাসিনাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কারণ শেখ হাসিনাই পারেন স্বাধীন বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাসকে রক্ষা করতে। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। অতঃপর বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ ২১ বছর ধরে ইতিহাসের পাতা উল্টে দিয়ে আবর্জনার মধ্যে জাতিকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল। ইতিহাস বিকৃতি নতুন প্রজন্মকে ক্রমশ বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিয়েছিল। আজ আবার বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই জাতি ইতিহাস বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ইতিহাস আজ সঠিক পথেই চলছে।

শেখ হাসিনার সরকারই আবার সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর প্রয়োজনে একাধিক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মূলত বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড শুধু একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ছিল না; এটি ছিল সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালি জাতি, বাঙালির

সংস্কৃতি ও স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখেছি আমরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত। '৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনের পর ২৩ জুন শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের আগে পর্যন্ত দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকাল এখানে আসবে না। মীরজাফর মোশতাক আহমদ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর টুপিকে 'ন্যাশনাল হেড গিয়া'র বানায়। আরেকটি রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার আলশামসদের নিয়ে সরকার গঠন করেছিলেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা হয়েও জেনারেল জিয়া মুক্তিযুদ্ধের সকল মূলমন্ত্রকেই ধ্বংস করেছিলেন। যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে দেশে ফেরার অনুমতি দিয়েছিলেন। জিয়ার পত্নী খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে তো গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দিয়েছেন। এসব ইতিহাস সকলেরই জানা।

আমি শুরুতে বলেছিলাম চলচ্চিত্র সংস্কৃতির উন্নতির কথা। সেই যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে জাতীয় চলচ্চিত্র কমিশন গঠনের মেমোরেন্ডাম তৈরি করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা আর কার্যকর করা হয়নি। জিয়া সস্তায় বাজিমাত করার জন্য তার সময় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও সরকারি অনুদান চালু করেন। জেনারেল জিয়া ডেপুটি চিফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর থাকাকালীন তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও তার হাতে ছিল। ১৯৭৬ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রবর্তিত হলো। যতোদূর জানা যায়, উল্লিখিত মেমোরেন্ডামটি থেকেই আইডিয়াটা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব নীতিমালা প্রধানভাবে করা হয়েছিল তা বাদ দেয়া হলো। যার ফলে নকল ছবি পুরস্কৃত হলো। শুরু থেকেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতর্কিত হলো। অন্যদিকে ফিল্ম ফাইন্যান্স করপোরেশনের বদলে 'সরকারি অনুদানের চলচ্চিত্র' নাম দিয়ে আংশিক অর্থ প্রদান করা শুরু হলো। প্রথম বছরে যদিও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অদম্য উৎসাহে সূর্যদীঘলবাড়ি, এমিলের গোয়েন্দা বাহিনীর মতো চলচ্চিত্র নির্মিত হলো। কিন্তু মূল কনসেপ্টটা যদি গ্রহণ করা হতো, অর্থাৎ শিল্পসম্মত ছবি নির্মাণের জন্য পুরো অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত এবং সরকারি বিধিনিষেধ শিথিল করা, তাহলে এ দেশে অনেক ভালো ছবি হতে পারতো।

কিন্তু বিষয়টা তো অন্যত্র। যেহেতু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই জাতীয় চলচিত্র পুরস্কার ও ফিল্ম ফাইন্যান্স করপোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল, সেহেতু তাকে পাল্টাতে হবে। জিয়াসহ তার পরবর্তী সরকারগুলোর মূল লক্ষ্যই ছিল বঙ্গবন্ধুর নাম-নিশানা মুছে ফেলা, সেখানে চলচ্চিত্র নিয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনার বাস্তবায়ন তো অনেক তুচ্ছ ব্যাপার, এদের কাছে। তাই জিয়ার আমল থেকে খালেদা জিয়া পর্যন্ত চলচ্চিত্রের কোনো সুস্থ বিকাশ দেখিনি। যা দু'একটি ব্যতিক্রম নজরে পড়ে,

তা অবশ্যই কোনো কোনো নির্মাতার ব্যক্তিগত উদ্যোগ। খালেদা জিয়ার আমলে সরকারি অনুদানকে রীতিমতো দলীয়করণ করা হলো। শুধু পোকামাকড়ের ঘরবসতি এবং অন্যজীবন সম্পর্কে ভিন্ন কথা বলা যেতে পারে। জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) নেতাকর্মীদের চলচ্চিত্র অনুদান দেয়া হয়েছে খালেদা জিয়ার আমলে। বিষয়টি অবশ্যই অনাকাঙ্ক্ষিত। শেখ হাসিনার বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে অবশ্যই আমরা ভিন্ন বিষয় আশা করি।

আমি আরো একটু পেছনে ফিরে যেতে চাই। পাকিস্তানি আমলে লাহোর করাচির উর্দু ছবির দাপটে পূর্ব বাংলায় বাংলা ছবি নির্মাণ রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। তারপরেও আব্দুল জব্বার খান 'মুখ ও মুখোশ', ফতেহ লোহানী 'আকাশ আর মাটি' নির্মাণ করলেন।

কিন্তু এসব ছবির কারিগরি কাজ সম্পন্ন করতে হতো পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে। এসব অসুবিধার কথা চিন্তাভাবনায় এনে ১৯৫৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন (এফডিসি) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং তাঁরই উদ্যোগে এফডিসি নির্মাণের বিল পাস হয়। এভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা চলচ্চিত্রের প্রসার ঘটানোর জন্য প্রধান অবদানটি রাখেন। এরপরেও পুরো ষাট দশকে সংগ্রাম ও জেল-জুলুমের মাঝেও বঙ্গবন্ধু শিল্প ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে তার চিন্তাচেতনার কথা বলেছেন। এ কারণেই তার জীবন দর্শন তুলে ধরেছিলেন কালজয়ী চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে নির্মিত 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিতে। এ ছবিটিতে প্রতীকী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর চরিত্র চিত্রিত হয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক। শিল্পীর তুলিতে, ক্যানভাসে তো বঙ্গবন্ধুই থাকবেন। কারণ তিনি শুধু মহান রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না; তিনি এ দেশের জনগণ, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছিলেন।

আমার অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট সেই সাংবাদিকের কাছেই জেনেছি–১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হলেন, তখন একটি চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা সাপ্তাহিক পূর্বাণীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধান অতিথি হিসেবে বলেছিলেন–'আমি যদি সরকার গঠন করতে পারি, তাহলে সকল শিল্পী সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী মুক্তচিন্তার প্রসার ঘটিয়ে বাংলার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাবেন। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নে আমার সরকার আন্তরিকভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।' আরও অনেক কথাই সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসকচক্র ক্ষমতায় যেতে দেয়নি। রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করে

বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ধ্বংসস্তূপের উপরে শাসনক্ষমতায় বসে বঙ্গবন্ধু কিন্তু তার দেয়া প্রতিশ্রুতি ভোলেননি।

স্বাধীনতার পরপরই একশ্রেণীর বেনিয়া চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী একটি ভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তারা বললেন, যেহেতু লাহোর করাচির উর্দু ছবি এখন আর চলবে না, সেহেতু বাংলাদেশের সিনেমা হলগুলো পুরোদমে চালু রাখতে হলে ঢাকার নির্মিত ছবি প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। তাই পুরনো ভারতীয় হিন্দি ছবি, যা ইতোপূর্বে আমদানি করা আছে, সেসব প্রদর্শনের অনুমতি দেয়া হোক। নতুন প্রশাসনের একশ্রেণীর আমলাকে প্রভাবিত করে চলচ্চিত্রের সুযোগসন্ধানী, ব্যবসায়ীরা ৫২টি পুরনো হিন্দি ছবি প্রদর্শনের অনুমতি নিয়ে নিলেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। তারা কমিটি তৈরি করে মিছিল নিয়ে গেলেন পুরনো গণভবনে (বর্তমানে 'সুগন্ধা' নামে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন)। তারা বঙ্গবন্ধুকে স্মারকলিপি দিয়ে বললেন, 'বঙ্গবন্ধু, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে আমরা নিজেদের চলচ্চিত্রের বিকাশ ঘটাতে চাই। এই মুহূর্তে পুরনো হিন্দি ছবি চালালে নতুন দেশের চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে উঠবে না। আমাদের সুযোগ দেয়া হোক। আমরা স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে বাংলা চলচ্চিত্র গড়ে তুলতে চাই।' সৈয়দ হাসান ইমাম, নায়করাজ রাজ্জাক, মোস্তফা মেহমুদ, সুচন্দা, ববিতা, রোজী, আনোয়ার হোসেনসহ অনেক প্রবীণ নির্মাতা কুশলী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আরও ছিলেন সাংবাদিকদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সেই সাংবাদিক বন্ধুটি।

বঙ্গবন্ধু পাঁচ মিনিটও সময় না নিয়ে প্রশ্ন রাখলেন–'আমি আমাদের চলচ্চিত্র বিকাশের জন্য সকল রকম নিরাপত্তা দেব। কিন্তু তোমরা আমাকে কথা দিতে পারবে, দেশে আরও বেশিসংখ্যক ছবি করবে, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও শিল্পমানসম্পন্ন ছবি করবে, যা নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে নিজেদের পরিচিত করাতে পারে।'

সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু, আমরা পারবো, কথা দিচ্ছি। আপনি ৫২টি ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী বাতিল করুন।'

বঙ্গবন্ধু সাথে সাথেই দরাজ কণ্ঠে ডাকলেন– 'রুহুল কুদ্দুস (তৎকালীন মুখ্য সচিব), আমার বাংলা চলচ্চিত্র ধ্বংস হয়ে যাবে, আমার দেশের চলচ্চিত্রকর্মীরা বেকার হয়ে যাবে, এমন সিদ্ধান্ত আমি মানি না। আমার নির্দেশ, এক্ষুনি ৫২টি ছবির প্রদর্শনী অনুমতি বাতিল কর।' বলেই চলচ্চিত্র নির্মাতা-শিল্পীদের উদ্দেশে বললেন, 'তোরা যা, আমি নির্দেশ দিয়েছি। তোরা কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবি।'

আমার সেই ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক বন্ধুটির কাছেই এসব শোনা। তার লেখাতেও পড়েছি। কিন্তু যে কারণে আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এই নিরাপত্তাটি দিয়েছিলেন, তার জন্য নির্মাতারা তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি কতোখানি রক্ষা করেছেন? মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর গুটিকয়েক চলচ্চিত্র নির্মাণের পর পরই এ দেশে

শুরু হলো বস্তাপচা ভারতীয় ছবির অশ্লীল নকলপ্রবণতা। যেসব ছবি বঙ্গবন্ধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সেসব ছবিরই নকল ছবি নির্মিত হলো। জাতির পিতাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি বেশিরভাগ নির্মাতাই রক্ষা করেননি। এ নিয়ে হা-হুতাশ করে লাভ নেই। পিতা তার সব কথাই রেখেছেন, জাতি যদি পিতাকে দেয়া কথা না রাখতে পারে এটা জাতির ব্যর্থতা। আমি সামগ্রিকভাবেই কথাটা বললাম। পিতা যে সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমরা তো সেই সমাজ নির্মাণেও ব্যর্থ হয়েছি।

কিন্তু আমাদের ব্যর্থ হলে চলবে না। সকল ব্যর্থতা ও গ্লানি মুছে দিয়ে আমাদের সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। জননন্দিত নেত্রী শেখ হাসিনার যে সরকার চলমান তার কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক। থাকাটাই স্বাভাবিক। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা, রাজনীতিতে সুযোগ্য উত্তরসূরি। জাতির পিতার আদর্শের সকল কর্মকাণ্ডকে তিনি যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন– এই প্রত্যাশাটি কিন্তু বেশি না। আমরা এটাও জানি, তার চলার পথও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তিনি সহজ সরলভাবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উদারতা ও মহানুভবতা দিয়ে দেশ চালাতে চাইলেও তাকে বাধাগ্রস্ত করার সকল ষড়যন্ত্র সরেজমিনে বিরাজমান। তারপরও তাকে ঝুঁকি নিয়েই পথ চলতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি জানি, তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন না। তথাপিও তাকে আরও কঠিন হতে হবে।

আজ ১৫ আগস্ট, ১৯৯৮। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী। ২৩ বছর আগে এই দিনে আমরা জাতির পিতাকে হারিয়েছি সপরিবারে। ২১ বছর ধরে আমরা এই কালো দিবসটি পালন করছি অতি নীরবে নিভৃতে। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। এক বছর আগে তথ্য প্রতিমন্ত্রী একটি ঘোষণায় বলেছিলেন, ঢাকার অদূরে সাভারে বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্র নগরী গড়ে তোলা হবে। সেই উদ্যোগের কী হয়েছে জানি না। তবে শুধু বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্র নগরী নয়, চলচ্চিত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যা কিছু দরকার, এমনকি জাতির পিতার নির্দেশে জাতীয় চলচ্চিত্র কমিশনের যে মেমোরেন্ডাম তৈরি করা হয়েছিল, সেই আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অন্তত একটি সেক্টরে পিতাকে যথাযথ সম্মান জানানো হবে। জাতির পিতার ২৩তম শাহাদাতবার্ষিকীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ বর্তমানের গণতান্ত্রিক সরকার ও সরকারপ্রধান শেখ হাসিনার কাছে এইটুকুই আমাদের প্রত্যাশা।

নজরুল, বঙ্গবন্ধু ও 'জয় বাংলা'

শামসুজ্জামান খান

'জয় বাংলা ' শ্লোগানটি আমাদের রাজনৈতিক ও বাংলাদেশের উদ্ভবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। গ্রামভিত্তিক, সমন্বয়বাদী ও লোকজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আধুনিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনা ঋদ্ধ সাংস্কৃতিক বোধের ভেতর থেকে এর শক্তি সমন্বয় করে প্রবলভাবে বেড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশ ভূখণ্ড ও ভারতীয় উপমহাদেশের সনাতনধর্মী স্পর্শকাতরতার কূটচক্রের আবহে এই শ্লোগান এখন অপেক্ষাকৃত ছোট স্পেসে অবস্থানকে সংহত করেছে। বলা যেতে পারে এর ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মূলধারার চেয়ে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও আরোপিত রাজনৈতিক কূটকৌশল সামরিক, ছদ্মসামরিক এবং বাংলাদেশ বিরোধী শক্তির অনুচরদের মদদে শক্তি অর্জন করে জনগণকে কিছু বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হওয়ায় এমনটি ঘটেছে। মুক্তবুদ্ধি মননজীবী, স্বচ্ছ চিন্তার সংস্কৃতিকর্মী ও সাহিত্যিকদের একটা বড় অংশ ও আলোকিত নতুন প্রজন্মের ছাত্র ও তরুণদের একটা বিশাল বাহিনী স্বাভাবিকভাবেই প্রথম ধারা বা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চিন্তার সেক্যুলার প্যাটার্নের সঙ্গে যুক্ত। এরা যুগে যুগে বিচ্ছিন্নভাবে এ ধারার ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। তবু এর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান এখন নিচু মাত্রায় রয়েছে। 'প্রজন্ম ৭১' বা 'একাত্তরের যাত্রী' সোচ্চারভাবে 'জয় বাংলা'র ব্যবহার করে এটা চোখে পড়েনি।

বাঙালির ধর্মীয় আবদ্ধতা ও গোঁড়ামী এবং চিন্তা-চেতনার নিশ্চলতার মধ্যে প্রায় এককভাবেই জাগৃতির প্রবল বেগ ব্যাপকতা এনেছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। গোটা বাঙালি জাতিকে তিনি জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ঐ চেতনার প্রোজ্জ্বল শিখায়। তাঁর চিন্তার সহযোগী ছিলেন কমবেশি মাত্রার সক্রিয় জীবনমুখী ও আধুনিক বাঙালি জাতি গঠনের সাধনায় নিয়োজিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এস. ওয়াজেদ আলী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, হুমায়ুন কবীর, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে এ. কে. ফজলুল হক, সুভাষ চন্দ্র বসু, সি.আর. দাশ প্রমুখ। এই বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার জাতীয়তাবাদীরাই নজরুলকে বাঙালি জাতির 'জাতীয় কবি' হিসেবে কলকাতার এ্যালবার্ট হলে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন।

আর রক্ষণশীল, মূঢ় ও সামাজিক চেতনাহীন তথাকথিত মুসলমানেরা তাঁকে 'কাফের' আখ্যা দিয়েও পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়নি। তাদেরই একজন নজরুলকে বলেছিলেন– "লোকটা মুসলমান না শয়তান"। সাম্প্রদায়িক মুসলমান ও হিন্দু আক্রোশ নজরুলের চিন্তার স্বচ্ছতা, প্রগতিশীলতা ও সমন্বিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের দীপ্রতাকে কিছুমাত্র ম্লান করতে পারেনি। তিনি অবৈজ্ঞানিক ও উদ্ভট দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনৈতিক প্রজনন পাকিস্তানকে 'ফাঁকিস্তান' নামেই আখ্যাত করে গেছেন। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র জীবনে পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন; কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। ১৯৪৮-এ ঢাকায় জিন্নাহর উর্দুর পক্ষে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী বক্তব্যের বিরোধিতা দিয়ে শুরু করে মুজিব ধীরে ধীরে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের অগ্রনায়কের ভূমিকায় চলে আসেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুল এবং বঙ্গবন্ধুই বাঙালি জাতীয়তাবাদ হাজার বছরের সমন্বয়বাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতা ভাববস্তুতে বিন্যস্ত করে বিপুল গণমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সাহিত্যকে ভালোবাসতেন। বক্তৃতা বিবৃতি ও আলাপচারিতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আবৃত্তি করতেন। এতে সাধারণ্যে এমন ধারণা চালু হয়ে যায় যে, শেখ মুজিব রবীন্দ্রভক্ত। এ ধারণায় বিন্দুমাত্র ভুল নেই। তবে মুজিবের উত্তরাধিকারের মধ্যে শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, নজরুলেরও অবস্থান ছিল বেশ দৃঢ়। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের চিন্তাধারার মৌলিক অন্তঃসারকে স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি করতে চেয়েছিলেন তিনি। আমার এ অনুমানের উদাহরণ খুব স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। প্রথম উদাহরণ তো এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। বিদ্রোহী কবিকে ভারত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে নিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অন্য কারো পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না। কবিকে এদেশে আনার মধ্যে শেখ সাহেবের ভেতরের চিন্তা কী ছিল তা আমরা হুবহু বলতে পারবো না। তবে অনুমান করতে পারি। আমাদের অনুমান অবশ্য নিছক অনুমান নয়। ওই অনুমানের পক্ষে কিছু তথ্য প্রমাণ হাজির করবো।

দ্বিতীয় ও মূল উদাহরণের কথাটিকে যদি এভাবে তুলি যে, প্রাজ্ঞ চেতনা ও ইতিহাসবোধ শেখ সাহেবের চিন্তার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। আর সে জন্যেই বাংলার দুই মহান কবির কাছ থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান দু'টি মৌল সত্তাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এর একটি জাতীয় সঙ্গীত। পূর্ববাংলার বাউল সুরে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানকে তিনি খুব যথার্থভাবেই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত করেছিলেন। অন্যটি বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ স্বকীয় চেতনা বা দর্শনের অংশ। সেক্যুলার বাংলাদেশের প্রতীক, 'জয় বাংলা'; নজরুলের বাংলাদেশ বন্দনা— 'নমঃ নমঃ নমঃ বাংলাদেশমম'–বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টির বাইরে ছিল না। এর পরে তো তিনি নজরুলের কাছ থেকে আরো স্বচ্ছ এবং লাগসই পঙক্তিই পেয়ে যান। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভেতর থেকে নজরুল চয়ন করেছিলেন :

"বাংলা বাঙালির হোক। বাংলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক"– এ অবিনাশী পঙক্তিমালা। এসব পঙক্তি না থাকলে আকস্মিকভাবে বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলতে পারেন না। 'বাংলার জয় হোক' আর 'জয় বাংলা'র মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে। অতএব নজরুলের কাছে বঙ্গবন্ধু বিশেষভাবে ঋণী তাঁর 'জয় বাংলা' শ্লোগানের জন্যে। আমাদের উদ্ধৃত পঙক্তিতে অর্থ ঠিক থাকলেও শব্দের কিছু ভিন্নতা আছে; ('বাংলার জয় হোক'; আর বঙ্গবন্ধু ব্যবহার করেছেন 'জয় বাংলা') কিন্তু কবি তার 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থে 'পূর্ণ-অভিনন্দন' কবিতায় হুবহু 'জয় বাংলা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ফরিদপুরের এক বিপ্লবী অধ্যক্ষের– যাঁকে কবি মাদারীপুরে 'মদ্দিবীর' বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁর কারামুক্তি উপলক্ষে ওই কবিতাটি রচিত। কবিরা দিব্যদৃষ্টির অধিকারী। নজরুলের ভাঙার গানের ওই কবিতা সে কথাকেই মনে করিয়ে দেয়। নজরুল ও তার চিন্তার অনুসারী কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেনদের ঢাকা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন ঢাকা রক্ষণশীল নবাব ও তাঁর অনুচররা। বঙ্গবন্ধু নজরুলকে যেন ঐ চেতনার প্রতীক প্রতিনিধি হিসাবে নিয়ে আসেন। এ ঘটনার তাৎপর্য অনেক।

তো, এখানেই একটা মৌলিক প্রশ্ন ওঠে। তা হলো— নজরুলকে যদি 'জাতীয় কবি' অর্থাৎ বাঙালির সমন্বিত জাতিসত্তার মূল ধারক হিসেবে গ্রহণ করে এই অভিধায় আখ্যাত করা হয়, তাহলে তা করার অধিকার ছিল বঙ্গবন্ধুর এবং যাঁরা 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' ও 'জয় বাংলা'য় বিশ্বাস করেন তাদের। 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ওয়ালাদের নজরুলকে 'জাতীয় কবি' বলার অধিকার তো সঙ্গত কারণেই থাকে না। কারণ 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র স্রষ্টা ও আধুনিক বাঙালিত্বের তাত্ত্বিক ও সাধক কবি নজরুল এমন বিষয় রাজনীতি ক্ষেত্রে অনুমোদন করেননি। অতএব এঁরা নজরুলকে 'জাতীয় কবি' বললে তার পেছনের মতলবটা স্পষ্ট হয় না। নজরুলের মতো মহান কবিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে 'জাতীয় কবি' বলা, এও ইতিহাস ও সত্যের এক ধরনের বিকৃতি।

'জয় বাংলা'-কে স্বীকার না করলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মৌলচারিত্র্যকে অস্বীকার করা হয়। যারা স্লোগান বর্জন করেছেন, তারা প্রকৃত বাঙালি নয়, বাংলাদেশের মৌল জাতীয় সত্তায় বিশ্বাসী নয়, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামেও বিশ্বাসী নয় এবং আমাদের হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জনের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তির তারা শত্রুপক্ষ। 'জয় বাংলা' শুধু একটি রাজনৈতিক জিগির-শ্লোগান নয়, এ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র বা 'ইসমে আজম'।... এ বীজমন্ত্রটি যিনি আবিষ্কার করেন তিনি হচ্ছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ সাহেবের অদ্ভুত পৌরুষব্যঞ্জক কণ্ঠে যেদিন এ 'ইসমে আজম' উচ্চারিত হলো সেদিন তড়িৎ প্রবাহের মতো দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের লাখ লাখ নয়, কোটি কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হলো সে অমোঘ

মন্ত্র। তাদের অন্তরের সুপ্তচেতনা জেগে উঠলো এবং লুপ্ত অনুভূতি পুনরুজ্জীবিত হলো। তারা ভাবলো তারা হিন্দু নয়, তারা বৌদ্ধ নয়, তারা খ্রিষ্টান নয়, তারা মুসলমান নয়– তারা এদেশেরই মানুষ, তারা বাঙালি। এ যে দেশপ্রেম, এ যে জাতীয়তাবোধ 'জয় বাংলা' তারই বীজমন্ত্র, তারই 'ইসমে আজম'।

দেশের স্বল্প সংখ্যক লোক দেশদ্রোহী 'জয় বাংলা'র বীজমন্ত্রে অনৈসলামিক ভাব ও প্রভাব বর্তমান, এ কাল্পনিক অজুহাতে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছে (ড. মুহম্মদ এনামুল হক, বাঙালি বাংলাদেশ)।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও বলেছেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি"। তাহলে সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিম, লালন ফকির, শহীদুল্লাহ্, এনামুল হক, মওলানা ভাসানী (তিনিও 'বাঙালি' বলতেন) ও শত মনীষীর চিন্তাকে অমান্য ও অশ্রদ্ধা করে আমরা কি ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্যুত হইনি? বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণতা এখানেই যে, তিনি এঁদের চিন্তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে গভীর চক্রান্তের মাধ্যমে হত্যা করে বাংলাদেশের মূল চরিত্র বদলে দেয়া হয়। এ বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ খুব যথার্থভাবে বলেছেন, "বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা লিপিবদ্ধ করার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। কিন্তু ধর্মকে ব্যবহার করে যারাই ক্ষমতায় আসে তারা সংবিধানকে বিনষ্ট করে।"

তিনি বলেন, "৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় মূলনীতি ও প্রস্তাবনার পরিবর্তন করে এমন অবস্থায় দেশকে নিয়ে আসা হয়েছে যাতে মনে হয় আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি, ধর্মযুদ্ধ করেছি। প্রস্তাবনায় রয়েছে ধর্ম নাকি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল" (ভোরের কাগজ, ১৫ জুলাই ১৯৯৫)।

এ অবস্থায় 'জয় বাংলা'কে উড়িয়ে দেয়া হবে এটা অস্বাভাবিক নয়। তবে 'জয় বাংলা' তো ইতিহাসের অনেক আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে আমাদের জাতীয় আত্মপরিচয়ের ধারার সঙ্গে ১৯৭০-এর নির্বাচন ও গণ-জাগরণ ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিপুল গণসমর্থনধন্য এ স্লোগানটি ড. মুহম্মদ এনামুল হকসহ সকল দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন। আর কবি নজরুল ইসলাম তো এ 'জয় বাংলা'র মূল উদ্ভাবক। এমনকি মওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'মোস্তাফা চরিত' গ্রন্থে হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর নামের সঙ্গে 'জয় মোহাম্মদ' ব্যবহার করেছেন। অতএব আমাদের গোটা ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক ভেবে-বুঝেই বঙ্গবন্ধু এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ মূল ভাবনার দায় তো মূল নেতার বা প্রধান চরিত্রের, দৌবারিকের নয়।

বিদ্রোহী কবির আগমন ও বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা

খালেক বিন জয়েনউদ্দীন

১৯৭২ সালের ২৫ মে থেকে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকা অবস্থান করেছেন। এই দীর্ঘ সময় তাঁকে একবারও জন্মস্থান ভারতে যেতে হয় নি। ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কবি কলকাতাতেই অবস্থান করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের এই অমর কবি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে অতি জনপ্রিয়। বাংলাদেশের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রাণের টান। বহুবার এসেছেন এদেশে, বিয়ে করেছেন এদেশে। আবার এদেশেরই এক নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। কৈশোরে স্মৃতিমাখা অনেকগুলো দিন তিনি কাটিয়েছেন ময়মনসিংহে। কিন্তু কখনো তিনি এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন নি। এদেশের মাটি, প্রকৃতি ও মানুষ ছিল তাঁর অতি প্রিয় ও ভালোবাসার ধন। তাঁর সমগ্র রচনায় এদেশের মানুষের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এবং এদেশের মানুষের কাছে তিনি শুধু একজন কবিই নন, একজন আপনজন হিসেবে শ্রদ্ধেয় ও সমাদৃত।

১৯৭১ সালে যাঁদের রচনা ছিল মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের প্রাণশক্তি, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এতো কাছের এবং স্বজন মানুষটির পাকিস্তান আমল কেটেছে অতিকষ্টে। কলকাতার ছোট্ট একটি বাসায় অনাদরে ও অবহেলায় নাতি-নাতনী এবং ছেলেদের নিয়ে কোনোরকমে জীবন কাটিয়েছেন। যে দেশের মানুষ তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো, যারা ছিল তাঁর রচনাসমূহের প্রকৃত পাঠক, তাঁদের কাছ থেকে তিনি ছিলেন দূরে, ভারতের কলকাতা শহরে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এলেন। তখন আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন মুস্তাফা সারওয়ার। ১৩৮০-এর ১১ জ্যৈষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলামের উপস্থিতিতে ঢাকায় তাঁর জন্মতিথি পালনের জন্য বঙ্গবন্ধু তখনই মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে কবিকে ঢাকায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কবিকে আনার ব্যাপারে মুস্তাফা সারওয়ার-এর একটি রচনায় বলা হয়েছে

"সেদিন বিকালেই পুরনো গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সচিবের অনুরোধে আমি উপস্থিত হয়ে সেই সভায় কবি নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে আনার ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনার বিষয়বস্তু জানতে পারি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে অফিসিয়াল চিঠিপত্রসহ তৎকালীন মন্ত্রী মতিউর রহমান এবং আমাকে নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল নজরুলকে আনার জন্য ভারতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। আমি প্রধানমন্ত্রীকে কবি নজরুলের কাছে একটি আমন্ত্রণপত্র দেয়ার বিনীত প্রস্তাব দিলে বঙ্গবন্ধু সহাস্যে একমত পোষণ করেন এবং কবি নজরুল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণপত্র স্বাক্ষর করেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আশা করি কবিকে ছাড়া খালি হাতে আসবে না। ঢাকার বেতার-টিভিতে কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার সংবাদ বারংবার প্রচারিত হতে থাকে। দমদম কলকাতা শহরে যাবার রাজপথের নাম 'কবি নজরুল এভিনিউ'। আমরা দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হই। এই রাজপথেই কতিপয় বামপন্থী রাজনৈতিক দলের ২/১টি পোস্টার চোখে পড়ে। তাতে লেখা ছিল–অসুস্থ কবি নজরুলকে নেয়া যাবে না। আমরা হোটেলে গিয়ে জানতে পারলাম, কয়েকটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করেছে, কবি অসুস্থ, বাংলাদেশে নেয়া সম্ভব হবে না। ঐ সময় কবি নজরুলকে বাংলাদেশে পাঠাবার বিরুদ্ধে কলকাতায় কয়েকটি বিক্ষোভ হয়। কলকাতায় কয়েকটি সংস্থা কবি নজরুলকে বাংলাদেশে নেয়ার পক্ষে ছিল এবং কবির শারীরিক সুস্থতার কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশে নেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে।"

পরের দিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সাথে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের রাইটার্স বিল্ডিং-এ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কবির অসুস্থতার কারণে বেশ চিন্তিত ছিলেন, কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। এদিকে ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমদ জানান যে, কবিকে ঢাকায় না নিয়ে আসতে পারলে বিক্ষোভ শুরু হবে। কারণ ইতোমধ্যে তাঁকে ঢাকায় আনার খবরটি রেডিও-টিভিতে প্রচার হয়ে গেছে। ঐদিন সন্ধ্যায় আবার মুস্তাফা সারওয়ার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর স্ত্রী ব্যারিস্টার মায়াদেবীর সহায়তায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় বৈঠক করেন। পরের দিন আবার ব্যারিস্টার বাসভবনে গিয়ে বৈঠক করেন। এই বৈঠক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় এবং অন্যান্য কর্মকর্তা কবি নজরুলকে অন্তত ১ জ্যৈষ্ঠজন্ম দিবসে ঢাকায় উপস্থিত করে কিছুদিনের জন্য হলেও বাংলাদেশে নেয়ার প্রস্তাবটি পুনরায় পেশ করি। শ্রীমতী [illegible] জাতির জনক

বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিরাট শ্রদ্ধাশীল থাকায় এতো বিরোধিতা সত্ত্বেও কবিকে ভারত সরকার ঢাকায় আনার সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অসুস্থ কবির দায়দায়িত্ব নেয়ার এবং কবিকে ভারতে ফিরিয়ে দেয়ার যৌথ মতে তাঁকে বাংলাদেশে আনার অনুমতি দেয়া হয়। প্রথম থেকেই ভারত সরকার কবিকে সুস্থ রাখার সর্বপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ঐ সময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ত্বরিত সিদ্ধান্ত না নিলে পরবর্তীকালে কবিকে ঢাকায় আনা হয়ত সম্ভবই হতো না।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পরের দিন অতি ভোরে কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ এবং অন্যান্যের সহায়তায় দমদম বিমানবন্দরে রক্ষিত বাংলাদেশ বিমানে কবিকে উঠিয়েই বিমান উড্ডয়নের ব্যবস্থা করা হয়। পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম চারু মজুমদারের সর্বহারা নামের সন্ত্রাসী অথবা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য কয়েকটি সংগঠন কবিকে বাংলাদেশে নেয়ার বিরোধিতা করে বিক্ষোভ প্রকাশসহ সম্ভবত বোমাও ফুটিয়েছিল। কলকাতার সাংবাদিকরাও ক্যামেরা নিয়ে বিমানবন্দরে ছুটে এসে আমাদের পান নি।

কবি নজরুলকে নিয়ে বিমানটি আকাশে ওড়ার সাথে সাথে কবিপুত্র সব্যসাচী ও আমি বিমানের আসনজুড়ে দাঁড়িয়ে বজ্রমুষ্ঠি হাত উঁচু করে উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি করেছিলাম— বল বীর! চির উন্নত মমশির, শির নেহারি আমারি নতশির ওই-শিখর হিমাদ্রীর।" কলকাতা থেকে ঢাকা। বিমানের একটি আসনে বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন পুরুষ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এখনো ঢাকার মাটিতে বিমান অবতরণ করেনি। সমগ্র বিমানবন্দর জুড়ে লাখো লাখো মানুষের ভিড়। বিমান মাটি ছুঁলো। কিন্তু বিমানের ভেতরে থাকতেই কবি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে বিমানের সিঁড়ি দিয়ে নামানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানুষের ভিড়ের চাপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তখন শেখ ফজলুল হক মনি, নূরে আলম সিদ্দিকী, আ.স.ম. রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন ও শাহজাহান সিরাজ কবির ভক্তদের শান্ত হওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু ভালোবাসার মানুষটাকে এক নজর দেখার জন্য সব অনুরোধ ভেস্তে যায়। অবশেষে অসুস্থ কবিকে বিমানের পেছনের দরজা দিয়ে অতি গোপনে অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে কবি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে

মুস্তাফা সারওয়ার আরো লিখেছেন—

"কবিকে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে সরকারের দেয়া ধানমন্ডিস্থ 'কবি ভবন' নামক বাড়িতে আনার পর আমরা স্বস্তি পেলাম। কিছুক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু বিরাট ফুলের ডালি দিয়ে কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমরা লক্ষ করেছি এবং সেই দৃশ্য ক্যামেরায় তোলা হয়েছিল যে কবি এবং বঙ্গবন্ধু উভয়ে উভয়ের দিকে তখন অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক ও অন্য নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা জানাতে আরম্ভ করলেন। ধানমণ্ডির

'কবি ভবন' তীর্থস্থলে পরিণত হলো। কবির ঘরে প্রতিদিন নজরুল সঙ্গীতের আসর হতো। এই আসরে প্রায় সব সময় ফিরোজা বেগমসহ অন্যান্য শিল্পী উপস্থিত থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো কবির জন্মদিনে অথবা অন্য কোনো একদিন ফুলে ফুলে সজ্জিত কবির ঘরে ফিরোজা বেগম যখন 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গানটি গাইছিলেন, কবি শিল্পীর দিকে তাকিয়ে আবেগ-উচ্ছ্বাসে গানটি শুনছিলেন, তখনই সেই ঘরে উপস্থিত কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ আমাদের সামনে আচমকা এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে কবি নজরুল মুখ খুলে 'হেই হেই' শব্দ করে ফিরোজা বেগমের দিকে তাকিয়ে মুখ নেড়ে কি যেন বলতে চাইলেন। কবি ভবনে এ মাইকে কবির কর্মকাণ্ড শোনার জন্য উদগ্রীব হাজার হাজার মানুষ কবির কণ্ঠ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আমি মাইকে কিছুটা ধারাবিবরণ দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য বলি। কবি যেন মুখ নেড়ে হাসছেন। তখন মনে হয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনও ধন্য।" এরপর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে গেলেন বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে নির্বাক কবি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক ও বিশিষ্ট কথাশিল্পী রাহাত খান একটি রচনায় লিখেছেন :

"চিরকালের দু'জন শ্রেষ্ঠ বাঙালি কাজী নজরুল ইসলাম এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপবেশনের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেটা ১৯৭৪ সালের কথা। বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে সেবার আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এটাই বোধকরি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমল মিলে বাংলাদেশে আয়োজিত হওয়া একমাত্র আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। বঙ্গবন্ধু'র আশীর্বাদ এবং পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বলেই এই সম্মেলন আয়োজন করা এবং সফল করে তোলা সম্ভব হয়েছিল। সম্মেলনের প্রথম দিন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশে সফরে আসা ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরন সিংহের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কথা ছিল সেখানে ড. মাযহারুল ইসলাম, শামসুজ্জামান খান ও আমি গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বাংলা একাডেমীতে নিয়ে আসব। যথাসময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমরা বাংলা একাডেমীতে এলাম। বঙ্গবন্ধুসহ সবাই আমরা মঞ্চে। উদ্বোধনের আগে অপেক্ষা চলছে। কাজী নজরুল ইসলামকে মঞ্চে এনে বসানো হবে, তারপর উদ্বোধন করবেন বঙ্গবন্ধু। কবি চুপচাপ বসেছিলেন দর্শক গ্যালারির একটি নির্ধারিত আসনে। তাঁর পুত্রবধূ উমা কাজী তাঁর পাশে। একটি চেয়ারে বসিয়ে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ পঙ্গু কবিকে ধরাধরি করে মঞ্চে তোলা হলো। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং এসে কবিকে তাঁর চেয়ারে বসিয়ে দিতে সাহায্য করেন। আমি মঞ্চে ছিলাম সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক

হিসেবে। চোখ ভরে দেখলাম চিরকালের শ্রেষ্ঠ দুই বাঙালি, কাজী নজরুল ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন। সেখানে আরো রয়েছেন সম্মেলনের মূল সভাপতি পল্লীকবি জসীম উদ্‌দ্‌ীন। এছাড়া বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. মাযহারুল ইসলাম এবং উদ্বোধনী অধিবেশনের বক্তা ও বিশেষ অতিথিবর্গ তো ছিলেনই। কাজী নজরুল ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু পাশাপাশি বসেছিলেন। একজন বাংলার বিদ্রোহী কবি এবং আরেকজন বাংলাদেশের জাতির জনক। লক্ষ করছিলাম, বঙ্গবন্ধু বারবার তাকাচ্ছেন কবির দিকে, কিন্তু কবির নির্বাক দৃষ্টি, বোধশক্তিহীন বসে আছেন চুপচাপ।"

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা সাহিত্যে যে তিনজন বরপুত্রকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন এবং যাঁদের রচনাবলী প্রিয় ছিল, তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন অন্যতম। অন্য দু'জন ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পল্লীকবি জসীম উদদ্‌ীন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধু বিদ্রোহী কবির খোঁজ-খবর নিয়েছেন। কবি পরিবারের সাথে বঙ্গবন্ধু পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

১৯৭১ সালের ২৫ মে কবির জন্মদিনে স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের" তৃতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয় এবং পরের বছর জন্মদিনে তাঁকে ঢাকায় আনা হয়–এটিও কবির প্রতি এদেশের মানুষের ভালোবাসার ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড। আমরা যেন এসব ভুলে না যাই, বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ না হই।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমী

সেলিনা হোসেন

১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল বাঙালির জীবনে এক অসাধারণ উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী সময়। কারণ পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে। এই বছরের নভেম্বর মাসে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জনপদ। প্রাণ হারিয়েছিল লাখ লাখ মানুষ। নির্বাচন শেষ হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে বিজয় লাভ করে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বাঙালি কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় যাবে। বাঙালির উৎসাহ-উদ্দীপনার শেষ ছিল না। আত্মমর্যাদার বোধেও প্রদীপ্ত ছিল পূর্ববঙ্গের গণমানুষ।

বঙ্গবন্ধুকে বাংলা একাডেমীতে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি সম্পর্কে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী লেখেন : 'আমরা যখন এ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করার অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে যাই তখন তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর মৃদু হাসি হেসে আমাকে বলেছিলেন, আমি কেন? আমি তো মাঠের মানুষ, পড়ালেখা জানি না, আপনারা কোনো পণ্ডিত বা সাহিত্যিককে দিয়ে উদ্বোধন করান, তাই যথার্থ হবে। কিন্তু আমরা যখন কেন তিনি সে সম্পর্কে আমাদের যুক্তির কথা বললাম তখন তিনি আবারও একই রকম মৃদু হাসি হাসলেন, তবে এবারে আমাদের প্রস্তাব মেনে নেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তার স্বভাবজ প্রেরণাদায়ক ভঙ্গিতে দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ মানুষের পাশে এসে তাদের সাথে একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলার সর্বাত্মক প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি পর্ব ছিল একাডেমী পরিচালিত বাংলা ভাষা শিক্ষা কোর্স সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ অবাঙালি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রধান অতিথি ও ২১ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধক বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সনদপত্র বিতরণ।[১]

মহান মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লিখেছেন : 'আজ বিকেল ৪টায় বাংলা একাডেমীর

শহীদ স্মরণ সপ্তাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। শেখ মুজিবর রহমান প্রধান অতিথি। উনি বাঙালি সংস্কৃতির কথা বললেন।[২]

বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বাঙালি সংস্কৃতির সাধক লেখকদের তিনি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে বলেছেন। সাহিত্যে জীবনের প্রতিফলন ঘটানোর পাশাপাশি সংস্কৃতির যে নিজস্ব শেকড় সেটা অনুধাবনের তাৎপর্যও তিনি বলতে ভোলেন নি। এখানেই তাঁর বাংলা একাডেমীর গৌরবের জায়গা দেখিয়ে দেয়ার প্রজ্ঞা। তিনি জানতেন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্বীকৃতি অর্জন জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যের একটি প্রধান দিক।

খ

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সচেতন স্বচ্ছতা ছিল নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। ষাটের দশকে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করেছিল সরকার। সে সময় দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীবৃন্দ প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়েছিল রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ আদেশ প্রত্যাহার করতে। যখন দেশে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রবল জোয়ার। ধসে পড়েছে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ভিত। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পরিচালিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। জেলখানা থেকে মুক্তি পান বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে দেয়া বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা মীর্জা গালিব, সক্রেটিস, শেক্সপীয়র, এরিস্টটল, দান্তে, লেনিন, মাও সেতুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য। আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখে যিনি বিশ্বকবি হয়েছেন। আমরা এই ব্যবস্থা মানি না–আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়বই, আমরা রবীন্দ্রসংগীত গাইবই এবং রবীন্দ্রসংগীত এই দেশে গীত হবেই।' এভাবে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিসত্তার মননে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির অনিবার্য দিকটিকে রাজনীতি ও সংস্কৃতির যোগসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন।

এই সত্যের মধ্যেই বাংলা একাডেমীর যথার্থতা নিহিত। ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমী। জাতির সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে বেশি ধ্বনিত হয় এই প্রতিষ্ঠানে। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দেশে এমন আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি, যেখানে জাতির মগ্ন-চৈতন্যে তার সাংস্কৃতিক বোধ প্রবলভাবে স্পন্দিত হয়। বঙ্গবন্ধু এই প্রতিষ্ঠানে এসে এই সত্যকে আরও দৃঢ় করেছিলেন। তাই পাকিস্তান সরকারের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল বাংলা একাডেমীর বর্ধমান ভবন। এর দ্বারা বোঝা

যায় একটি ভবন কীভাবে জাতিসত্তার প্রতীকে উত্তীর্ণ হয়। বাংলা একাডেমী শুধু ইটকাঠের দালান হয়ে থাকে না। তাই পঁচিশের কালো রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কামান দেগে ভেঙে দেয় বর্ধমান ভবনের দেয়াল। ওই রাতেই শুরু হয় বাঙালির মহান সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

গ

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমী একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সে সময়ে বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ছিলেন গবেষক, ফোকলোরবিদ শামসুজ্জামান খান। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকসহ তাঁরা কয়েকজন '৭৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। শামসুজ্জামান খান লিখেছেন : বঙ্গবন্ধু বসলেন, প্রফেসর ইসলাম এবং আমরাও বসলাম। তিনি বললেন, 'বলুন প্রফেসর কি মনে করে এসেছেন'। ড. ইসলাম বললেন, 'বঙ্গবন্ধু, আমরা বাংলা একাডেমী থেকে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছি, বিভিন্ন দেশ থেকে বিখ্যাত সাহিত্যিকরা আসবেন। আপনাকে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে পেতে চাই।' তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর প্রত্যুত্তর : 'আমি সাহিত্যের কি বুঝি? আমি কি বলবো! একজন প্রবীণ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বা পণ্ডিতকে দিয়ে এ কাজ করান–সম্মেলনের মর্যাদা বাড়বে। আগে তো তাই হতো। ছাত্রজীবনে দু' একবার সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছি। কই, রাজনৈতিক নেতারা তাঁর উদ্বোধন করেছেন বলে তো মনে পড়ে না।' এই বলে তিনি হাসলেন। পরিস্থিতিকে একটু সহজ করার জন্য বললেন, 'আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ি, ভালোবাসি তাঁকে– সাহিত্যে আমার পুঁজি তো ওইটুকুই। এই পুঁজি নিয়ে দেশ-বিদেশের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে যেতে আমি সংকোচ বোধ করছি।' তাঁকে বলা হলো, এটা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সম্মেলন। এর একটা ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। আপনি সম্মেলন উদ্বোধন করলে তা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করবে। তাছাড়া গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রশ্নে আপনার ও আপনার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিফলন ঘটবে। তিনি একটু ভাবলেন, বললেন, ঠিক আছে, যাবো। আমার বন্ধু জসীম উদ্‌দীন ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকেও বিশেষ মর্যাদায় আমন্ত্রণ জানাবেন।[৩]

আবারও দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু দেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গকে কতখানি সম্মানের সঙ্গে দেখতেন। বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে কারা অংশগ্রহণ করলে মানসম্পন্ন হবে সে ব্যাপারেও তিনি ছিলেন গভীর বিবেচনার মানুষ।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন : 'মযহারুল ইসলামের সময়ে বাংলা একাডেমীর উদ্‌যোগে বড় রকমের এক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু এটি উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক বিখ্যাত লেখক এতে যোগ দেন। আমি একটা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করি।[৪] কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন লিখেছেন : 'চুয়াত্তরের প্রথম দিন দর্শকের সংখ্যা উপচে পড়ছিল মাঠে। মঞ্চ তৈরি হয়েছে নতুন বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এসেছেন। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন পশ্চিম বাংলার লেখক ও পণ্ডিতরা।'[৫]

সাহিত্য সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এসেছিলেন কথাসাহিত্যিক আনোয়ার আলিমঝান্‌ভ ও মরিয়ম সালগানিক এবং আরও কয়েকজন। পূর্ব জার্মানি থেকে এসেছিলেন সাহিত্যিক হ্যাসো গ্রাবনার। মঙ্গোলিয়া থেকে এসেছিলেন কথাসাহিত্যিক মি. পি. হাসবাতার। ভারত থেকে এসেছিলেন হিন্দি লেখক মূলকরাজ আনন্দ, সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়, ইতিহাসবিদ ড. নীহাররঞ্জন রায়, লোকসাহিত্যবিশারদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়সহ অনেক লেখক।

বাংলা একাডেমী আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে দেশের লেখকদের বিদেশি লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ইচ্ছা থেকেই বঙ্গবন্ধু শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক প্রমুখদের সামনে এনেছিলেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশনাকেও তিনি গভীরভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন সভাপতি হিসেবে কবি জসীম উদ্‌দীন, ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। সেই সম্মেলনে বাংলাদেশের নবীন-প্রবীণ লেখকরা মুখর করে তুলেছিলেন বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণ।

ঘ

বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভাষা-শহীদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমী যেকোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয় এটা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। সে কারণে অনুষ্ঠানের বক্তব্য প্রদান করেছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

তিনি মাত্র দু'টো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। একটি স্বাধীনতার বছরের সময় একুশের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক শক্তির পরিচয়টিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন জনজীবনের রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে এক করে। লেখকদের সেই জীবনের রূপকার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার তিনি এলেন একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে। সাহিত্য জাতির জীবন-পরিচর্যার সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত করে। সাহিত্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করলে দেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে দারিদ্র্যপীড়িত ছোট দেশকে দারিদ্র্যের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় সে দেশের শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চলচ্চিত্র-খেলাধুলা ইত্যাদি। এসব মাধ্যমই দেশের সৃজনশীলতার পরিচয়কে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। বাংলা একাডেমী দেশের সাহিত্য ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে।

এভাবে সুদূরপ্রসারী জ্ঞানচিন্তায় বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমীর ভূমিকা কি হবে তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। সামগ্রিক অর্থে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা একাডেমী কীভাবে জাতিসত্তার পরিচয়ের প্রতীক হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. নাই বা হলো পারে যাওয়া : কবীর চৌধুরী, প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০০৭, পৃ: ১৫১।

২. একাত্তরের ডায়েরী– মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, প্রকাশক : আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৫, পৃ: ১৭।

৩. বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ– শামসুজ্জামান খান এবং প্রাসঙ্গিক কথকতা; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ: ৫২।

৪. 'বাংলা একাডেমী : আমার সংশ্রব'– আনিসুজ্জামান বাংলা একাডেমী স্মারক গ্রন্থ : চল্লিশ বর্ষপূর্তি নির্বাহী সম্পাদক সুব্রত বড়ুয়া, সহযোগী সম্পাদক ওবায়দুল ইসলাম, বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ: ১০২।

৫. স্মৃতির বাংলা একাডেমী– রাবেয়া খাতুন, বাংলা একাডেমী স্মারক গ্রন্থ : চল্লিশ বর্ষপূর্তি, নির্বাহী সম্পাদক সুব্রত বড়ুয়া, সহযোগী সম্পাদক ওবায়দুল ইসলাম, বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ: ১২১।